

যাঁদের হাত ও মনের ছোঁয়ায় এই সংখ্যার একাশ

বি.আর. আশ্বেদকর

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য • দেবী চ্যাটার্জী

মনোরঞ্জন ব্যাপারী • আশীষ লাহিড়ী • তুষার চক্রবর্তী

গুরুপ্রসাদ কর • দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস • সুনীলকুমার দাস • কণিষ্ক চৌধুরী

সুনীলকুমার রায় • নির্বাণ বসু • স্বপন শীল • তীর্থংকর চন্দ • মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

মনোহর মৌলি বিশ্বাস • সাইনাথ • অশীন দাসগুপ্ত • সুশান্ত কর

চন্ডালিনী (কল্যাণী ঠাকুর) • উপেন বিশ্বাস • সংযুক্তা ঘোষ • বুলবুল আহমেদ

সমুদ্র বিশ্বাস • রমেশ বাউড়ী • জগৎ হাঁসদা

অনুপম দাস অধিকারী • বাপী মণ্ডল

টুটুন মুখার্জী

CLASS CASTE RELATIONS MARXIST APPROACH

DAFODWAM PUBLICATION

For Collection :-

Mail : dafodwam.dafodwam@gmail.com
chetanalahar@rediffmail.com

or

Call : (0) 9331858854

যাঁদের রচনাবলী অবশ্যপাঠ্য

কার্ল মার্কস, জ্যোতি বা ফুলে, রামস্বামী পেরিয়ার,
বেগম রোকেয়া, আশ্বেদকর, ভগৎ সিং

যাঁদের রচনাবলী পাঠককে মুক্ত মনা হ তে সহায়তা করবে

অক্ষয়কুমার দত্ত, কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন,
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য,
আরজ আলি মাতুব্বর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহমেদ শরিফ,
আশীষ লাহিড়ী, ভবানীপ্রসাদ সাহু

যে দলিত তার সন্মানের লাশ সনাত্ত করতে ভয় পায় তাকে ঘৃণা করি

চেতনা লহরের প্রতিটি সংখ্যায় দলিত শব্দটির বারংবার ব্যবহারে কিছুসংখ্যক পাঠকের ধারণা তৈরী হয়েছে যে আমরা দলিত শব্দটি কোনও এক বিশেষ জাতের জনগণের (S.C.) পরিচয় হিসাবে জানাতে চেয়েছি। এ ধারণা সত্যের অংশমাত্র। আমরা বর্তমান ভারত রাষ্ট্রকে একটি স্বল্পজনের পরিচালিত দলনকারী উচ্চবর্ণ হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছি। এই রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিত শ্রমজীবী দেশবাসী আমাদের ভাষায় দলিত। সেই কারণে দলিত শব্দটিকে সংকীর্ণার্থে ব্যবহারের বাসনা আমাদের নেই। আমরা সংরূপের দাবীতে এখনও অটল কারণ আমাদের মতে সংরূপ কোনও মতেই সুবিধা (Privilege), অধিকার (Right), কণা (Sympathy) বা অনুগ্রহ (Favour) নয়, সমাজকাঠামোর এটিটি স্পষ্ট প্রতিনিধিত্ব (Representation) মাত্র, যা ঐতিহাসিক পর্যায়ে গণতন্ত্রের অতি সুপ্রতিফলন ছাড়া বেশী কিছুই নয়।

যারা প্রতিনিধিত্বের ধারণার বিপরীত ভাবনার ভুল অবস্থানে আছেন তাঁদের অধঃপতনের সম্ভাবনা প্রবল। সারা ভারতরাষ্ট্র এল.পি.জি.র (উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন) পথে মনুবাদী সামন্তবাদ, দেশী বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের জোট দেশের অধিকাংশ মানুষের জল, জমি, জঙ্গল, শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, নাগরিকত্ব, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সর্বোপরি মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। দেশবাসীকে বিভক্ত করার জন্য বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি নিত্যদিন যড়যন্ত্র করছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার প্রান্তে প্রান্তে প্রান্তবাসীদের হত্যার বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে। লিঙ্গবৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যসত্ত্বভোগী পরগাছা তথাকথিত “ভদ্রলোক” সুশীল সমাজ এবং দিবারাত্র সংরক্ষণ পুজারীকুল সাইনিং ইণ্ডিয়া বনাম অন্ধকার ভারতবর্ষের দ্বন্দ্ব ধরতে চাইছেন না। আসুন আমরা প্রতিদিন লড়তে লড়তে হারতে হারতে বিজয়ের পথ ধরি।

Let us build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



75% of the population



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



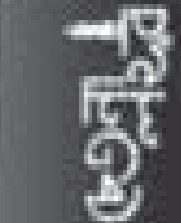
Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



75% of the population



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination



Let's build a democratic society free from discrimination

Let's build a democratic society free from discrimination

Let's build a democratic society free from discrimination

UNITE DALITS. UNITE WITH DALITS

ভোটের অধিকার

বি. আর. আশ্বেদকর

ভাষান্তর : সুশান্তকুমার সরকার

আমার সহযোগীরা এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, শহরাঞ্চলে নাগরিকদের ভোটাধিকার এখনকার মতোই থাকা উচিত এবং গ্রামাঞ্চলে বিষয়টি ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। আমি এর সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমার সহযোগীরা বিষয়টিতে অধিকার অপেক্ষা সহানুভূতিকে বেশি বড় করে দেখেছেন। আমার মতে বিষয়টি এতই বেশি বিপজ্জনক যে, তা কোনও দেশের কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ যদি প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে অপ্রাসঙ্গিক বলে বাতিল করা হয়, যদি নাগরিক অধিকারের নৈতিক দায়িত্বকে দার্শনিক বা আনুভূতিক স্তরে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছেন তাঁরা যদি ভোটাধিকারকে তাঁদের খুশিমতো সুযোগ দেওয়া বা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যান, তাহলে কিম্বদন্তি মনে করতে হবে, যাদের ভোটদানের ক্ষমতা নেই তাদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে যাঁদের সেই ক্ষমতা আছে তাঁদের ওপর। এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার অর্থই হচ্ছে দাসত্বপ্রথা কোনও দোষ নয়, একথা মেনে নেওয়া। কারণ দাসত্ব প্রথার শর্তই হচ্ছে, মানুষের কোনও অধিকার নেই— যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের দয়ার ওপর সাধারণ মানুষকে নির্ভর করতে হবে। যে মতবাদ এই ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়, তাকে অবশ্যই জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে মারাত্মক বলে গ্রহণ করতে হবে এবং এই জন্যই আমি এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করার পক্ষে।

আমার সহযোগীরা মনে করেন, ভোটের অর্থ একটি ব্যালট বক্সের মধ্যে কিছু নাম লেখা একটি কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তাঁরা ভোটাধিকারের সঙ্গে সাক্ষরতার বিষয়টিও যুক্ত করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন। ভোটাধিকারের জন্য এই ধরনের মতামত পোষণ করা নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্তিপূর্ণ এবং এতে ভোটাধিকার বিষয়টি নিয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। বেশিরভাগ মানুষের ভোটাধিকার সম্পর্কে যদি প্রকৃত ধারণা থাকে তাহলে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভোটদান শুধুমাত্র একটি কাগজে ছাপ মারাই নয়, এর আসল অর্থ হচ্ছে ‘দেশের সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং এর মধ্যে নিহিত আছে জনগণের কল্যাণ।’ ভোটাধিকার প্রয়োগের এই অর্থ যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে একমাত্র উন্মাদ ছাড়া প্রাপবয়স্ক প্রতিটি মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। কারণ, সামগ্রিক জীবন ব্যক্তি মানুষের সমষ্টি এবং যেহেতু প্রতিটি মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত, সেই হেতু প্রতিটি মানুষের তা

নির্ধারণ করার অধিকার থাকা উচিত। একইভাবে বলা যায়, দরিদ্র মানুষদের ভোট প্রয়োগের প্রয়োজন অনেক বেশি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর গঠিত সমাজে মালিক পক্ষ সবসময় শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে থাকে। মালিক পক্ষের শোষণের হাত থেকে যদি শ্রমিক কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে হয়, তাহলে সামগ্রিক জীবন-যাপনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যদি ভোটদান নির্ভর করে এবং ভোটাধিকার যদি সম্পত্তিহীন সব পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে প্রসারিত করা না যায়, তাহলে এই লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হোক না কেন, অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অপরিহার্য। আমি এই সিদ্ধান্তের অনুসারী এবং আমার সুপারিশ হল, ২১ বছর বয়সের উর্দে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচারের জন্যই যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োজন তাই নয়। রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যেমন মুসালমানগণ সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য জোর দাবি করেন, কারণ তাঁরা এই ভেবে ভীত যে, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভোটদাতারা নির্বাচনের ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, এমন কোনও লোক নির্বাচিত হতে পারেন যাকে সংখ্যালঘুরা চায় না। আমি আমার প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে উল্লেখ করেছি যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার যদি প্রবর্তন করা যায়, তাহলে এইসব যুক্তিকে নস্যং করা যেতে পারে। সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর যে বিকল্প হতে পারে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, সে ব্যাপারে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ কোনও চিন্তাভাবনা করেনি। তারা শুধু এটাই চিন্তা করেছে যে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী বিষয়টি যথেষ্ট ভাল এবং এটি গ্রহণযোগ্য এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মধ্যে ভাল কিছু নেই এবং একে বিধিনিষেধের মধ্যে রাখা উচিত। এসব সম্পর্কে আমার মতামত সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার মতে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা ক্ষতিকর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদান ব্যবস্থা ভাল। যাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদান শুধুমাত্র যে উৎকৃষ্ট, তার জন্যই প্রবর্তিত হওয়া উচিত তাই নয়, তার দ্বারা সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। কিন্তু যাঁরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মতবাদে বিশ্বাস করেন না, আমার বিশ্বাস তাঁরও এই মত মেনে নিতে অসুবিধায় পড়বেন না। কারণ এটা যে কোনও লোকের কাছেই বোধগম্য হবে, যে- বিষয়টি বেশি ক্ষতিকর তার চেয়ে কম ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত এবং

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মধ্যে যদি খারাপ কিছু থেকেও থাকে, সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোটের থেকে নিশ্চয়ই তা বেশি খারাপ নয়, অধিকাংশ জনমত-ই এই দাবির পক্ষে। ‘নেহরু কমিটি’র প্রতিবেদনে অত্রান্মাণ এবং দলিত শ্রেণী ছাড়া ভারতের সব রাজনৈতিক দলের মতামত স্থান পেয়েছে। এই কমিটি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট প্রবর্তন করার পক্ষে। দলিত শ্রেণীর মানুষেরও আগ্রহ এর প্রতি। ‘সিন্ধু মুসলমান সংস্থা’ এবং বোম্বাই সরকারের একজন মুসলমান সদস্য এবং একজন অত্রান্মাণ সদস্যও-এর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের পক্ষে অনেক মানুষ-ই রয়েছেন। আমার সহযোগীরা এইসব জনমত উপেক্ষা করার কোনও কারণ দেখাননি।

আমার সহযোগীরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে-মত প্রকাশ করেছেন তার দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হল, দেশে নিরক্ষরতার হার খুব বেশী। দেশে সাক্ষরতার গুরুত্ব কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু নিরক্ষরতার প্রাধান্যই যে ভোটাধিকারকে প্রভাবিত করবে, তা আমি কোনও মতেই মেনে নিতে পারব না। প্রথমত নিরক্ষরতার জন্য নিরক্ষর মানুষকে দায়ী করা যায় না। বোম্বাই সরকার দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। আর যখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন শিক্ষার প্রসার সব মানুষের মধ্যে বিস্তৃত না করে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।*

১৮৫৪ সালের আগে বিশেষ শ্রেণীর পরিবর্তে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারকে সরকার গুরুত্ব দেয়নি। কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের বিশেষ কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আর্থিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকার খুব কৃপণ মনোভাব নিয়েছেন। মহামতি গোখলে যখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন, সরকার নির্লজ্জভাবে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। যে সরকার সবসময় নতুন কর ধার্যের পক্ষে সেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে গোখলের ঐ প্রস্তাবে কর আরোপের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও বিরোধিতা করে। সংস্কারের প্রবর্তনাতেও অবস্থার বিশেষ কোনও হেরফের ঘটেনি। প্রেসিডেন্সিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন’ (Compulsory Primary Education Act) গ্রহণ করা ছাড়া জনশিক্ষা প্রসারে ঐ সংস্কার তেমন কার্যকর হয়নি। উপরন্তু যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ঐ শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। কারণ যাঁদের হাতে ঐ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তাঁরা এ ব্যাপারে হয় উদাসীন, না হয় অজ্ঞ ছিলেন।

দলিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক প্রবল বাধা হয়ে দেখা দেয়। এমনকী, সরকারও ঐ বাধার কাছে নতি স্বীকার করে। ভারতের সামাজিক প্রথার

পরিপ্রেক্ষিতে দলিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। মাহার সম্প্রদায়ের একটি ছেলেকে ধারওয়াড়ের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে একটি আবেদন বোম্বাই সরকার নাকচ করে দিয়ে ১৮৫৬ সালে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে বলা হয়েছে : পত্রাচারে প্রশ্নটি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তাতে বড় রকমের বাস্তব সমস্যা দেখা দিয়েছে :-

১. ‘কোনও সন্দেহ নেই যে আবেদনকারী মাহা ছেলেটির পক্ষে বিচারের যৌক্তিকতা আছে এবং সরকার বিশ্বাস করে যে, ধারওয়াড়ে প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, যে দীর্ঘদিনের কুসংস্কারের জন্য ঐ ছেলেটি তার সুযোগ পায়নি, তা অনেক আগেই দূর হয়ে গেছে।’

২. ‘কিন্তু সরকারকে অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একতরফাভাবে দীর্ঘদিনের একটি কুসংস্কারে কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য হস্তক্ষেপ করলে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট ক্ষতি হতে পারে। আবেদনকারী যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আবেদন করেছে, তা এই সরকার সৃষ্টি করেনি এবং ঐ ছেলেটির পক্ষে সরকার দেশের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত করতে পারে না।’

এই ঘটনার ছাব্বিশ বছর পরে ‘হান্টার কমিশনে’র (Hunter Commission) প্রতিবেদনে বলা হয় যে সরকারের এই ধরনের কোনও নীতি মেনে নেওয়া উচিত নয়, যাতে কোনও প্রকার জাতিপাতের ভিত্তিতে সরকারি বিদ্যালয় বা কলেজে কেউ ভর্তি হতে পারবে না। অবশ্য ঐ প্রতিবেদনে এই কথাও বলা হয়েছে, ‘বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।’ এই সতর্কতার ফল এই দাঁড়ায় যে, ঐ নীতি কখনওই কার্যকর করা হয়নি। (১৯২১ সালে অবশ্য ড. পরাঞ্জপে এ ব্যাপারে এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোনও আধিকারিকের অনুমোদন ছিল না এবং দলিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য তিনি যে পরিপত্র (Circular) দিয়েছিলেন তা এড়িয়ে যাওয়া হত। এর ফলে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা আজও শোচনীয়রূপে বিরাজ করছে।

নিরক্ষর লোকদের ভোটদানের অধিকার নিয়ে প্রায়-ই যে প্রশ্ন তোলা হয়, এ সম্পর্কে আমার উত্তর হল, কারা তাদের নিরক্ষরতার জন্য দায়ী? যদি এই নিরক্ষরতার জন্য সরকারকে দায়ী করা হয় এবং সাক্ষরতাকে ভোটদানে অধিকারের পূর্বশর্ত হিসাবে ধার্য করা হয়, তাহলে তা হবে বিনা দোষে এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কারণ শিক্ষার কোনও সুযোগ-ই ঐ সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। আর নিরক্ষরতা দূরীকরণকে যদি ভোটাধিকারের সম্প্রসারণের প্রাক-শর্ত

বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সেই নিরক্ষরতা যত শীঘ্র সম্ভব দূর করার কি কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হবে? দেশ গঠনের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গেও রয়েছে খরচের প্রশ্ন। সংস্থান কোথা থেকে হবে তার সমাধান প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে অর্থের ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে, ততদিন শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব নয়। সুতরাং এই খাতে অর্থের যোগান বর্তমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পরিষদ গঠিত হবে, তা যে সুরাহা করতে পারবে না, তা তর্কাতীত। এর সহজ কারণ হল, শিক্ষা বিস্তারের জন্য খরচ জোগাড় করতে হবে ধনীর ওপর কর বসিয়ে। কিন্তু যাঁরা বর্তমান পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁরা সবাই ধনী। সুতরাং ধনীদের যদি বাধ্য করা না হয় তাহলে তাঁরা কখনই নিজেদের ওপর কর বসানোর ব্যাপারে সম্মত হবে না।

বাধ্য না হলে নিশ্চয়-ই ধনীরা দরিদ্রদের উপকারের জন্য তাঁদের ওপর কর আরোপে রাজি হবে না। সেই বাধ্যতামূলক শর্ত একমাত্র আরোপ করা সম্ভব হবে, যদি পরিষদ গঠনের সংবিধান আমূল পরিবর্তন করা যায় যাতে পরিষদে নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ব্যবস্থা যদি করা না হয়, তাহলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না। তাদের যদি এই অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে তা হবে তাদের প্রতি চরম অবিচার। জনসাধারণকে নিরক্ষর রেখে সেই নিরক্ষরতার জন্য যদি তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া না হয়, তাহলে তা হবে তাদের ওপর কাটা ঘায়ে নুন ছোটানোর মতো। কিন্তু বিষয়টির মধ্যে আরও অতিরিক্ত কিছু রয়েছে। এতে শুধুমাত্র যে ক্ষতের উপর আঘাত করা হচ্ছে তাই নয়, জনসাধারণকে একদিকে নিরক্ষর রেখে আর নিরক্ষরতার অজুহাতে তাদের ভোটদানের অধিকার না দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের নিরক্ষরতাকে পুষে রাখা এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের ভোটাধিকার স্থগিত রাখা।

নিরক্ষরতার জন্য দায়ী কে? প্রশ্ন সেটি নয়, প্রশ্ন হল নিরক্ষর মানুষদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হবে কি না? আমার উত্তর হল, বিষয়টি সাক্ষরতা অথবা নিরক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং এটি যুক্ত হওয়া উচিত জ্ঞানবুদ্ধির ওপর। যারা সাক্ষরতাকে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে এবং ভোটাধিকারের শর্ত হিসাবে যুক্ত করার জন্য জিদ করে, আমার মতে তারা দুটি ভুল করছে। তাদের প্রথম ভুল হল, তারা ধারণা করে অশিক্ষিত নিরক্ষর লোক মানেই বুদ্ধিহীন। কিন্তু প্রত্যেকের জানা উচিত যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও অসম্ভব বুদ্ধিমান হতে পারে। সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতার ভিত্তিতে বুদ্ধি যাচাই করা এক মস্ত ধাঁধা। প্রকৃতপক্ষে আমার অভিজ্ঞতা বলে দেয়, ভারতসহ সারা বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা আছে এবং তারা নিজেদের কাজকর্ম আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়াই বেশ ভালভাবে চালাতে পারে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর প্রতিটি মানুষই তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করেই তার ভাল-মন্দের দায়িত্ব নিতে সক্ষম। নিরক্ষর মানুষ সহজেই

ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করতে পারে, যদি তাই হয়, তাহলে ‘বোম্বাই উন্নয়ন দফতর’ তাদের বিচারে ভুল করেছে। তাদের এই কাজ নিন্দনীয় এবং বিষয়টি মেনে নেওয়া না নেওয়া এক-ই ব্যাপার। আর যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, নিরক্ষর মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগে ভুল হতে পারে, তাহলেও তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। কারণ আমাদের ধারণা এই যে, অবাধ ও জনপ্রিয় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাদের ভুলের থেকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চেয়ে অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি শেখে। এটা বোঝা শক্ত যে, ব্যক্তিবিশেষের বেলায় অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা ঘটে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা কেন ঘটবে না। দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে, নিরক্ষর মানুষের চেয়ে সাক্ষর মানুষদের জ্ঞানবুদ্ধি বেশি থাকবে এটা ধরে নেওয়া। এই বিষয়ে ব্রাইসির (Bryce)র উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। ব্রাইসি তাঁর ‘আধুনিক গণতন্ত্র’ (Modern Democracies) নামক গ্রন্থের সমীক্ষায় প্রশ্ন তুলেছেন : ‘লিখতে ও পড়তে সক্ষম হলে তা কতটা নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে?’ তার উত্তর হল, ‘কারণ এটিই হল একমাত্র বাস্তব পরীক্ষা এবং আমরা ধরে নিই এটিই যথেষ্ট পর্যাপ্ত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কারণ আমাদের অনেকেরই স্মরণ আছে, যাট বছর আগে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে যেসব মানুষ বাস করত, তারা লিখতে পড়তে পারত না। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তারা খুব চালাক-চতুর ছিল। তারা তাদের প্রখর বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা দিয়ে বর্তমান যুগে তাদের লেখাপড়া জানা, খবরের কাগজ-পড়া ও সিনেমা দেখা নাতি-নাতিরীয়া যেমন ভোট দেয় ঠিক সেইরকম ভাবেই তারা ভোট দিতে পারত... বর্তমান যুগের গণতন্ত্রে যেভাবে মানুষ ভোট দিয়ে থাকে এবং তাদের যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তার থেকেও এথেনীয় যুগের মানুষদের ভোট প্রয়োগের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। গ্রিক ভোটদাতারা রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করে ছাপার অক্ষর বা বই পড়ে নয়, তারা বক্তৃতা শুনে এবং একে অন্যের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সচেতনতা অর্জন করে। পড়ার থেকে কথা বলা মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলে। পড়া নয়, চিন্তা-ভাবনাই আসল ব্যাপার এবং চিন্তার মাধ্যমে আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যে যুক্ত-বুদ্ধির অবতারণা বেশি হয়। পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বোধশক্তির আদান-প্রদান ঘটে এবং মনন-শক্তিরও বিকাশ হয়। কিন্তু আমাদের যুগে পড়াটাই চিন্তার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে লোক একমাত্র তার দলেরই সংবাদপত্র পড়ে, তার ঐ কাগজে বর্ণিত রাজনৈতিক সংবাদ, অপরাধের ঘটনা, খেলাধুলা প্রভৃতিতেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে এবং জানতেও পারবে না যে, এর অন্যান্য দিকও রয়েছে এবং জানার জন্য বিশেষ চেষ্টাও সে করবে না। তাছাড়া ঐ কাগজে যা লেখা আছে, তার সত্যতা প্রমাণেরও কোনও সুযোগ নেই। শোনা বিষয়ের থেকে কাগজের ছাপার অক্ষর অবশ্যই তার কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে। সংবাদপত্রের বিবৃতি এবং

খবর থেকে তার প্রাপ্ত জ্ঞান অনেকটা ভিত্তিহীন এবং কিছুটা বানানো। অথচ সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনায় এবং বাস্তবে ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে তার যে অভিজ্ঞতা তা আরও বাস্তব। অধিকন্তু জ্ঞানর উৎস থেকে তার যে জ্ঞান লাভ হয়, তার মধ্যে ভাল-মন্দ দুই-ই থাকতে পারে। ছাপার অক্ষরে বর্ণিত বিষয় যারা পড়ে, খুব ভালভাবে না পড়লে সত্য থেকে মিথ্যা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থেকে যায় এবং বোধশক্তির বিভ্রম ঘটান সম্ভাবনাকে। একটি দলীয় কাগজ কোনও বিষয়কে গোপন রেখে এবং কোনও বিষয় ভুলভাবে উপস্থাপিত করে পাঠকদের মধ্যে জঘন্যভাবে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কারণ ঐসব লিখিত বিষয় অনবরত অসত্য কথা পরিবেশন করে জনমানসে এমন প্রভাব ফেলতে পারে, যা কোনও ব্যক্তি বা জনসমষ্টি ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেও করতে সক্ষম হয় না। ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে তাদের এই গুরুত্ব ছিল। বর্তমান যুগের ভোটদাতাদের ওপর দলীয় সংবাদপত্রের প্রভাব এত বেশি যে, আজ থেকে আশি বছর আগে তাদের পিতামহরা তাদের ভূস্বামী অথবা কারখানার মালিক অথবা যাজকদের ভোট দেবার সময় যে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারত, এখনকার সময় তারা তা পারে না। পিতামাতা শুধুমাত্র জানতেন তিনি কার অনুগামী। কিন্তু এখন সংবাদপত্র পাঠ করে দৌহিত্র শুধু কোনও বিষয়ের বা বিতর্কিত বস্তুর একটি দিক জানতে পারে এবং সহজেই সে স্বার্থায়েষীদের শিকার হতে পারে। কারণ, লিখিত বিষয় সরলতার সঙ্গে সে গ্রহণ করে এবং মনে মনে তার বাইরে কিছুই চিন্তা করে না। সুতরাং যে গণতন্ত্র শুধুমাত্র পড়াশোনার সুযোগ দেয়, কিন্তু চিন্তা ও বিচারের অবকাশ দেয় না, তা পুঁথি পড়ার ক্ষমতা থেকে অধিকতর ভাল কিছু হতে পারে না।

ভারতীদের নিরক্ষরতার বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। একজন ইংরেজ ভোটদাতার ভোটদানের সম্পর্কে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কী দেখতে পাই? ১৯২৪ সালের ২১ অগাস্টের 'টাইমস্' পত্রিকার শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রোড়পত্রে একজন ইংরেজ ভোটদাতা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: বেশিরভাগ মানুষের এ ব্যাপারে গভীর কোনও আগ্রহ নেই। তাদের ভোটেই সব রাজনৈতিক বিষয়ের সিদ্ধা স হয়। কিন্তু রাজনীতির বিশেষ কিছুই তারা বোঝে না। বিষয়টি খুব উদ্বেগজনক হলেও অত্যন্ত বা সর্ব। যে-সময় মানুষের ভোটে দেশের শুল্ক বা কর কাঠামোর সিদ্ধা স হয় অথবা বিদেশ নীতি নির্ধারিত হয়, তারা তাদের জীবনে রাজনীতির মারপ্যাচ নিয়ে বিশেষ কিছুই পড়ে না। আট বছর আগে পূর্বতন সীমিত ভোটাধিকারের সময় অসুত তিন ভাগের দুই ভাগ ভোটের সংসদে এতদ্ভিন্নের দিন রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলি পড়ত। আর আজ ভোটদাতাদের পাঁচশতাংশও এ সম্পর্কে কোনও বিতর্ক বা ঐকমত্য পড়ে দেখে না। অবশিষ্ট রা যতই ওতপূর্ণ ব্যক্তি

হোন না কেন, সংখ্যা খুবই কম। মোটের ওপর গণতন্ত্রকে সম্ভূত থাকতে হয় বোতলে ভর্তি অীল মনোরঞ্জন নিয়ে। একইভাবে সে তার মনকে পত্রিকার ে ত্রেও এয়োগ করে, যা তার রবিবারগুলি নও করে একজন ব্যাপটি মন্তীর অধীনে যা হয় না।

এই হল পরিবেশ যার বিষাক্ত গ্যাস থেকে বিদ্যালয়গুলি তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

ব্রিটিশ গণতন্ত্র তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা যদি নিশ্চিতভাবে এই হয় এবং এইরকম ভোটদাতার মতামতের ওপর ব্রিটিশ শাসন চলে, তাহলে বিতর্ক এসেই যায়, প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়দের ভোটাধিকার না দেওয়া শুধুমাত্র যে অন্যা্য এবং কাল্পনিক তাই নয়, তাদের নিরক্ষরতাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এটা একটি অজ্ঞাত রাজনীতির কুটকচালির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ এবং এসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার মতো জ্ঞানবুদ্ধি থাকা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে রাজনৈতিক বোধের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বলতে গেলে, কপটতা। ছোটখাটো রাজনৈতিক ব্যাপারে অবশ্য কোনও দেশের কোনও ভোটদাতাকে সঠিকভাবে সবকিছু অবহিত করা সম্ভব নয়, অবশ্য তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানারও প্রয়োজন নেই। একজন ভোটদাতার কাছ থেকে বড়জোর আশা করা যেতে পারে যে, কোন বৃহত্তর বিষয় সে বুঝতে পারে এবং কোন প্রার্থী তার স্বার্থরক্ষা করতে পারবে সেই অনুযায়ী তাকে ভোট দেবে। এ ব্যাপারে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তা গড়পড়তা ভারতীয়দের ক্ষমতার বাইরে নয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার মেনে না নেওয়ার যেসব বিষয়ে আমার সহযোগীদের সঙ্গে আমার মতৈক্য হয়নি তা হল, ইংল্যান্ডের মতো দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য টেনে আনা। বলা হয় যে, ১৪২৯ সালে ৪০ শিলিং লাখেরাজ সম্পত্তিভোগী (forty shilling freehold) থেকে ১৮৩২ সালে ইংল্যান্ডে যে ভোটাধিকার বিস্তৃত হয় তাতে পাঁচ লক্ষেরও কম ভোটদাতার সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার ছিল। ঐ সময় ‘সংস্কার আইন’ গৃহীত হওয়ায় ভোটদাতার সংখ্যা বোড় দাঁড়ায় দশ লক্ষে। এ সম্পর্কে পরবর্তী আইন গৃহীত হয় ১৮৬৭ সালে। তখন ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঁচিশ লক্ষে। এর সতেরো বছর পর ১৮৮৪ সালের আইনে ভোটদাতার সংখ্যা আরও বেড়ে হয় পঞ্চাশ লক্ষ। এর চৌত্রিশ বছর পর ১৯১৮ সালে ‘জনপ্রতিনিধিত্ব আইন’ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েছে। যেসব রাজনৈতিক সামাজিক দিক থেকে রক্ষণশীল এবং রাজনৈতিক ভাবে বৈপ্লবিক তাঁরা এই ধরনের ভোটাধিকার সম্পর্কে মনে করেন যে, সংসদকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তবে তা সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক নাও হতে পারে। এর উত্তরে যেসব বিরোধী রাজনৈতিক বলে থাকেন, বিধানমণ্ডলের হাতে ক্ষমতা

দিলে তা এতই কম প্রতিনিধিত্বমূলক হবে যে মূলত দেশের শাসনক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে চলে যেতে পারে। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, ভোটাধিকারের ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করা উচিত এবং অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই দ্বিতীয় ধরনের সমালোচকদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, এ বিষয়ে কেন আমরা ইংরেজদের নীতি অনুসরণ করে চলব? ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজ জাতি নিশ্চয়ই কোনও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেনি। অন্য পক্ষে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের বিষয়টির মধ্যে যদি এত দীর্ঘদিনের ব্যবধান থাকে, তাহলে অবশ্যই মনে করতে হবে যে, তা করা হচ্ছে ইংরেজ শাসকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাছাড়া এমন কোনও কথা নেই যে, একটি দেশকে এ ব্যাপারে অন্য দেশের নীতি নিয়ে একই পর্যায়ে চলতে হবে। আর তাই যদি করা হয় তাহলে, পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের বঞ্চিত করা হবে। অন্য সমালোচকদের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, তাঁরা যে জন্য এই মতামত ব্যক্ত করে থাকেন, বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা সত্য। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী অল্পসংখ্যক লোকের প্রতিনিধিত্ব করলেও সংসদ-ই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু প্রশ্ন হল, এতে দেশের কতখানি ভুগতে হবে? লর্ড শ্যাফটসবেরি (Lord Shaftsbury) যেভাবে সংস্কারহীন সংসদের সামাজিক আইন প্রণয়নের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তা এই দেশে প্রবর্তন করতে কেউ-ই চাইবেন না। এই ব্যবস্থায় একমাত্র অবশ্যসম্ভাবী ফল হল, ইংল্যান্ডের মতো সীমিত ভোটাধিকার। আমার মতে এই সমালোচকরা মুষ্টিমেয় শাসন ক্ষমতার চেয়েও সীমিত ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলে যে তা আরও খারাপ হবে, তা সমর্থন করবেন না। যৌথ প্রতিবেদন যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা এই ধরনের ফলাফল কখনই আশা করেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁদের প্রতিবেদনের ২৬২ নম্বর অনুচ্ছেদে তাঁরা বিশদভাবে উল্লেখ করেন যে, বিধিবদ্ধ কমিশনকে ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার মতো বিষয়ের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ‘বস্তুত নির্বাচন হবে এমন ব্যাপক পদ্ধতিতে যার ওপর স্বায়ত্তশাসনের ভিত নির্ভর করবে। কারণ সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যম শাসন ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাত থেকে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে হস্তান্তরকরণের ইচ্ছা আমাদের নেই।’

মুষ্টি মেয়র শাসন মতা এতিরোধের উপায় কী? আমার মতে, এর একমাত্র সমাধান হল, ঐগুণবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। এ এসঙ্গে ১৯২৮ সালের সিলোন কমিশন (Ceylon Commission)-এর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ কমিশনের সদস্যরা যৌথ প্রতিবেদনের রূপকারদের মতোই সচেতন ছিলেন যে, অসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা সরকার গঠিত হলে মতাসীনরা ভাবিত হবেন। তাঁরা

মনে করেন, সম্রাটের শাসন ব্যবস্থা য় শুধুমাত্র সিংহলের উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিঁ তদের স্বার্থ সংরতি থাকবে। শুধু তাই নয়, যাঁরা সাম্রাজ্যের বৃহত্তর জনগোঁী সেই কৃষক, মজুর এবং অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থও সুরতি থাকবে, এবং যাঁরা মনে করেন, মুক্তি মেয়র হাতে শাসন মতা হ স্প নরিত হলে বৃহত্তর অংশের মানুষের ংতি বি াসঘাতকতা করা হবে তাঁরা এই সিদ্ধান্তই আসবেন যে, রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য ভোটদাতাদের যোগ্যতা শুধুমাত্র সা রতাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাঁরা বলেন, আমাদের মতে, দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হলে, সরকারের ংভাব সমাজের সর্ব স্রের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে এবং ভোটদানের অধিকার কোনও অবস্থা তেই শুধুমাত্র শিঁ ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সিংহলের ে ত্রে যদি ংপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অনুমোদন করা যায়, তাহলে ভারতের ে ত্রে তা হবে না কেন? দুটি দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাদৃশ্য এতটাই যে ভোটদানের অধিকারের ে ত্রে দুটি দেশের মধ্যে যদি সীমারেখা টানা হয় তাহলে মনে করতে হবে পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা করা হয়েছে এবং তা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। সাদৃশ্য ছাড়াও গুণাগুণেরও যদি বিচার করা হয়, তাহলে দুই দেশের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে ভারতের মানুষ সিংহলের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য ংপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ংয়োগের ে ত্রে। বিশেষ করে বর্তমান বোম্বাই ংসিডেলির ে ত্রে যেখানে গ্রামে পঞ্চায়েত স্রের ংপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার চালু আছে।

প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদ : গোড়ার কথা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চার্বাক বলে একজন দার্শনিক ভারতে ছিলেন, তাঁর কথাবার্তা চালচলন আর কারোর সঙ্গে মিলত না—এইরকম একটি ধারণা নিয়ে বিস্তর লোক, এমনকি ছাত্র-অধ্যাপকও, জীবন কাটিয়ে দেন। পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যবইগুলিতে এই ধরনের কথাই লেখা থাকে। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে গবেষণা কত এগিয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক কেন, এদেশের পেশাদার দর্শন-ব্যবসায়ীরাও তার খবর রাখেন বলে মনে হয় না।

চার্বাকমত নিয়ে আলোচনার সময় তিনটি বিষয় বিশেষ করে বোঝার আছে।

১. এটি শুধু বেদপ্রামাণ্যের বিরোধী নয়, যে কোনো ধর্মমতের বিরোধী দর্শন। শুধু বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সব ধর্মের বিরুদ্ধেই তার লড়াই। সুতরাং তার বিরুদ্ধে সব ধর্মমতই এককাটা। মূল বিরোধিতার জায়গা হলো : অবিনশ্বর আত্মা আর তার পুনর্জন্ম অস্বীকার।

২. ধর্মমত ছাড়াও জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে বিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় : প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন (বা কোন্ কোন) প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের উপায়) মানা হবে। চার্বাক-বিরোধীরা চার্বাকদের প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী বলে শনাক্ত করেছেন। অর্থাৎ চার্বাকরা নাকি একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণ মানেন না। অথচ ঘটনা এই যে, লৌকিক ক্ষেত্রে চার্বাকরা অনুমানকে মানতে গররাজি ছিলেন না—যদি সে অনুমান প্রত্যক্ষপূর্বক হয়। কিন্তু যে সব অলৌকিক বিষয়—ঈশ্বর, পরলোক, সর্বজ্ঞ পুরুষ ইত্যাদি, অনুমানের সাহায্যে বা আপ্তবাক্যের দোহাই পেড়ে লোকের কাছে হাজির করা হয়, তেমন অপ্রত্যক্ষ বিষয় মানতে তাঁদের আপত্তি ছিল। পুরন্দর নামে এক চার্বাকপন্থী দার্শনিক খুব স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলেছেন; ‘সর্বমতসংগ্রহ’ নামে একটি বইতে চার্বাক-দর্শন প্রসঙ্গে এই ধারণাটি পরিষ্কার করে বলা আছে; নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট নিজেও সে কথা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। চার্বাকরা যে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণ স্বীকার করতেন না — এই ধারণা প্রচার করার সময় চার্বাক বিরোধীরা কোনো প্রামাণ্য চার্বাকসূত্র উদ্ধৃত করেন নি; বরং ভর্তৃহরি-র বাক্যপদীয় থেকে এক বা একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ভর্তৃহরি এমনকি প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ বলে স্বীকার

করতেন না: ‘শব্দ’ অর্থাৎ বেদবাক্যই তার কাছে একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। এমন এক দার্শনিকের ধারণাকে চার্বাক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করাকে দূরভিসন্ধি ছাড়া আর কী বলা যায়?

৩. নীতিবিদ্যার একটি দিকও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। প্রথমে জৈনদের রচনায়, পরে ব্রাহ্মণ্য রচনাতেও (মূলত কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীহর্ষ প্রমুখ বৈদাস্তিকদের নাটকে ও কাব্যে) চার্বাকদের লাগামছাড়া ইহসুখবাদী (হেডনিস্ট) বলে দেখানো হয়। শাস্তুরক্ষিত, কমল শীল প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকরা কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি; শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের লেখাতেও চার্বাকখণ্ডন প্রসঙ্গে যৌন শিথিলতার কথা আসে না। এমনকি জৈন আচার্য প্রভাচন্দ্রও এ বিষয়ে নীরব।

যে কোনো দর্শনকে হেয় করার জন্য শঙ্করাচার্য একটিমাত্র তোপ দাগেন — আলোচ্য দর্শনটি অবৈদিক, অস্মার্ত, অর্থাৎ মনু, পরাশর প্রমুখের ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তার মিল নেই। বৌদ্ধ-জৈনরা তো এর ফলে বাতিল হয়ে যানই, সাংখ্যকেও এই একই অস্ত্রে ঘায়েল করা হয়। তেমনি ঈশ্বর না মানলেও, দেহ ছাড়া আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম ইত্যাদি না মানার দায়ে চার্বাকদের একঘরে করেছেন সবাই মিলে। এ ব্যাপারে বেদপন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ-জৈনরাও সামিল।

ওপরে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হলো, তার মধ্যে একমাত্র প্রথমটিই সত্যি, বাকি দুটি অপপ্রচার মাত্র। বিশেষ করে তৃতীয়টির ক্ষেত্রে এও বলা যায় যে, শুধু চার্বাক নয়, সাংখ্য প্রসঙ্গেও এই ইন্দ্রিয়সুখভোগের অভিযোগ তোলা হয়েছিল— যদিও তার পক্ষে কোনো সাক্ষ্য হাজির করা হয় নি। অপপ্রচার করতে গেলে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়-ই। তাই ‘যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ’-এর পরে মূল শ্লোকে ছিল ‘নাস্তি মৃত্যোর অগোচরঃ’—সেটিকে পালটে সায়ন-মাধব লিখে দিলেন, ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ’। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়।

চার্বাকমত তথা বস্তুবাদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। এই দর্শনটিকে যতদূর পর্যন্ত নিঃসংশয়ে পুনর্গঠন করা যায় তার থেকে আমরা বলতে পারি : এটি খুবই প্রাচীন দর্শন। অজিত কেশকম্বলীকে ভারতের প্রথম বস্তুবাদী বলে ধরা যায়। তিনি ছিলেন বুদ্ধের-ই সমসাময়িক। তারপরে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিস্টীয় দশ শতকের মধ্যে আর পাঁচজন মাত্র বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম পাওয়া গেছে : অবিন্দকর্ণ উদ্ভটভট্ট (ভট্টোদ্ভট), কম্বলাশ্বতর, পুরন্দর ও ভাবিবিন্দু।^১ এই পনেরশ বছর জুড়ে ভারতের দর্শন জগতে অনেক টালমাটাল ঘটে যায়। অতি সূক্ষ্ম তর্ক, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ — এ সবই চলতে থাকে। একদিকে বৌদ্ধ ভাববাদী (যোগাচার ও

বিজ্ঞানে অগ্রগতির সঙ্গে কোনো যোগ না রেখে চলতে পারেন ভাববাদীরা। এই মুহূর্তে কেউ যদি নিজেকে শূন্যবাদী বা মধ্যবাদী বলেন, তাতে কেউ বাধা দেবেন না।

ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে কোনো নতুন ধারণাই তাঁর ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। কোনো বস্তুবাদীর পক্ষে কিন্তু এমন অবস্থান নেওয়া অসম্ভব। সচেতন বা অচেতন বস্তুবাদই প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত, আর বিজ্ঞানই পারে বস্তুবাদকে যথার্থ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে।

তবে একটি কথা কখনোই ভোলা যায় না। ভারতের মতো সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশে চার্বাকদর্শনের মতো একটি আপসহীন অধর্মীয় ইহলোকসর্বস্ব দর্শন যে গড়ে উঠেছিল এটাই এক বিরাট ঘটনা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, চার্বাকরা হয়তো একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি আর ন্যায়দর্শনের স্বভাব-এর ধারণায় একই বক্তব্যের রেশ রয়ে গেছে।^১ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐ দুটি দর্শনই বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে ধর্মশাস্ত্রীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এমন হতে পারে এ ছিল তাঁদের মুক্তিপণ। মুখে বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে কাজে তাঁরা নিজেদের মতই বলেছিলেন।

চার্বাকদর্শনের সবচেয়ে বড় মহিমা এই যে, কোথাও কোনোভাবে দর্শনচর্চার অনুমোদিত দিকটি মানা হয় নি। দর্শন পড়লে মোক্ষলাভ হবে—এমন কথা তাঁরা মানতে রাজি হন নি, বরং মোক্ষের ধারণাটিকে নস্যাত্ন করে দিয়েছেন। এর মধ্যে এক অসমসাহসিক বীরত্ব আছে যা বুঝতে বিপ্লবী মনোভাব লাগে। সে মনোভাব যাঁদের নেই চার্বাকদর্শন তাঁদের কাছে একটি অবাঞ্ছিত উৎপাত মাত্র। প্রতিটি বিপ্লবীরই মনে রাখা উচিত, সত্যিকারের বিপ্লবী কখনও নিজের মতবিরুদ্ধ কথা বলে পিঠ বাঁচান না; সমস্ত সনাতনী ধ্যানধারণা, ধর্মীয় প্রথা ও লোকাচারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েও নির্দিধায়, অকপটে নিজের বক্তব্য জানান; কোণঠাসা বা একঘরে হয়ে পড়ার ভয়ে নীতিবিরোধী কোনো আপসে যান না। দর্শনের ইতিহাসে চার্বাকমত সেই বীরত্বের অধিকারী।

১. কমলশীল, চক্রধর, বাদিবেদ সুরি ও শান্তরক্ষিত-এর রচনায় এঁদের নাম পাওয়া যায়। বিশদ বিবরণের জন্য এই বই-এর অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য।
২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩), বারো।
৩. ঐ, ১০৮-৩০ দ্রষ্টব্য।

চয়ন :- চার্বাকচর্চা, প্রকাশক : সদেশ

পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেবী চ্যাটার্জী

ভারতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেন তাঁদের মধ্যে পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামীর নাম একটি উজ্জ্বল তারার মত দীপ্যমান। বর্ণব্যবস্থা সুবিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ও নারীদের উপর যে নিপীড়ন ও অপমান চাপিয়ে দিয়েছিল, পেরিয়ার শুধু তার বিরুদ্ধে জেহাদই ঘোষণা করেন নি, এই সংগ্রামকে তিনি বিজয় অর্জনের পথে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। তামিল ভূমিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা এখনো উচ্ছেদ হয়নি বটে, কিন্তু তাকে বড় রকমের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে তামিলনাড়ুতে যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁরা যাই করুন না কেন, তাঁদের পেরিয়ারের নাম করে রাজত্ব চালাতে হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিতে হচ্ছে এবং তামিল জাতীয়তার পক্ষে দাঁড়াতে হচ্ছে। তামিলনাড়ুর অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির (OBC) আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার শিক্ষায় অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির জন্য ৬৭ শতাংশ সংরক্ষণ মেনে নিয়ে সংসদে আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছে — এই ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি। পশ্চিম বাঙলায় ও.বি.সি.দের শিক্ষাক্ষেত্রে এক শতাংশ সংরক্ষণ না দিয়েও বামপন্থীরা এক নাগাড়ে বিশ বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারেন কিন্তু তামিলনাড়ুতে ও.বি.সি.দের সংরক্ষণ না দিয়ে কোন সরকারের পক্ষে একদিনও রাজত্ব চালানো সম্ভব নয়। এটা অনস্বীকার্য যে অন্তত তামিলনাড়ুতে শূদ্ররা নিজেদের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে। এটার পেছনে পেরিয়ারের অবদান অনস্বীকার্য।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পেরিয়ার ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বাঙলায় বা পূর্বাঞ্চলে খুব কম লোকই জানে। এমন কি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও পেরিয়ার সম্পর্কে অজ্ঞতা চোখে পড়ে। পেরিয়ারকে বাঙলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে রেনবো পাবলিশার্স নারীদের সম্পর্কে পেরিয়ারের কয়েকটি বক্তৃতা ছাপা দিয়ে শুরু করেছে। এটা খুবই ভাল কাজ। বিশেষতঃ উত্তর ভারতে দলিত-আন্দোলনের মধ্যে নারী-সমস্যাটি বিশেষ স্থান পায় না। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদী দলিত নারী সহ সব নারীই চরম বঞ্চনা, অপমান ও নিপীড়নের শিকার হন। এটাও সত্য যে এই নারীরা যতক্ষণ লড়াই-এর ময়দানে না নামছেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী সব শ্লোগানই নিষ্ফল হুঙ্কার থেকে যেতে বাধ্য।

‘পেরিয়ার’ শব্দটির অর্থ মহামানব বা মহাপুরুষ। পেরিয়ারের আসল নাম ই.ভি. রামস্বামী নাইকার। নাইকার হচ্ছে জাতি-পরিচয়ে প্রাপ্ত নাম। পরবর্তীকালে রামস্বামী নাইকার পদবী বর্জন করেন এবং এখন পেরিয়ারপন্থীরা পেরিয়ার ই.ভি.রামস্বামী বলেই তাঁর নাম উল্লেখ করেন। কেউ তাঁর নামের সঙ্গে নাইকার যুক্ত করলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন।

১৮৭৯ সালে ইরোড-এ এক দক্ষিণভারতীয় নাইকার পরিবারে রামস্বামীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভেঙ্কটাপ্পা নাইকার প্রথমে পাথর খোদাই করার রাজমিস্ত্রী ছিলেন কিন্তু পরে এক ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। এই নাইকার পরিবার ছিলেন কান্নাড়া বালিজা নাইডু জাতির অন্তর্ভুক্ত। এটি ছিল শূদ্রদের মধ্যে একটি উঁচু জাতি। ভেঙ্কটাপ্পা ব্যবসা করে অনেক অর্থোপার্জন করেছিলেন এবং সেই অর্থ তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণ উঁচু শূদ্র জাতির লোকদের মত দান-ধ্যান ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে ব্যয় করতেন। রামস্বামীর বাবা তাঁকে স্কুলে পাঠান কিন্তু স্কুলে তাঁর বেশিদিন পড়াশোনা হয়নি। ২০ বছর বয়সে তাঁকে বাবার ব্যবসা ও মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। তাঁর বাড়ীতে যে সব ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম হত তিনি সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করতেন ও তর্ক করতেন। কিন্তু ২০ বছর বয়সে ইরোড সার্কল-এর দেবস্থানম কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মন্দির পরিচালনার কাজ(মন্দিরের অর্থব্যবস্থা ঠিক করা, অনেক মন্দির পুনর্নির্মাণ করা, উৎসব অনুষ্ঠিত করা ইত্যাদি) অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। ঐ সময় তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, তালুক বোর্ড, নাইডু সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ, কৃষক সংঘ ও আরো বহু সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

তাঁর রাজনীতিতে যোগদান ১৯০৭ সালে, কংগ্রেস যোগদানের মধ্য দিয়ে। ১৯০৮ সালের পর তিনি নিয়মিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে থাকেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পর তিনি শূদ্র জাতিগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন। শীঘ্রই তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে কংগ্রেস তার উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হবে না। ১৯২৪ সালে তিনি ভাইক্কম সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন এবং ভাইক্কমের ‘নায়ক’ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। কেরালার ভাইক্কম শহরের রাস্তায় এরাওরা ও আদি দ্রাবিড় জাতিগুলির হাঁটার অধিকারের দাবীতে এই আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল কেরালার কংগ্রেস দল। সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার পর সামনের সারির নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং পেরিয়ারের কাঁধে এর নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে। এইভাবেই তিনি দলিত আন্দোলনের নেতা হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত হন।

কিন্তু তাঁর পক্ষে বেশীদিন কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সালেই কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করেছিল। ঐ বছর তামিলনাড়ু কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি জাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী তোলেন। কিন্তু এই দাবী মানলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেবে এই যুক্তিতে তা খারিজ করা হয়। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই চেষ্টা চালিয়ে যান কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হন। এরপর তিনি কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি বলেন, “কংগ্রেস অ-ব্রাহ্মণদের ভালো করতে পারে না। অতঃপর আমার প্রধান কাজ হবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করা।”

কংগ্রেস ছেড়ে দেবার পর পেরিয়ার এক সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন যা ‘আত্মমর্যাদা আন্দোলন’ (self respect movement) নামে পরিচিত। আন্দোলনের গ্রন্থকার এস. সরস্বতী এই আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো নিম্নলিখিতভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেনঃ

১. সমাজের জনগণের মধ্যে কোনরূপ অসাম্য থাকবে না।

২. সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে ধনী ও দরিদ্রের মধ্য কোন পার্থক্য থাকবে না। সম স্ত্র জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর মালিকানা হবে সাধারণের।

৩. সমাজের নারী ও পুষ্ণ সবদিক থেকে সমান বলে গণ্য হবে এবং কোনরকম বৈষম্য হবে না।

৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ ও ভগবানের ঐতি মানুষের সব ধরনের বন্ধন ছিন্ন করা হবে এবং বিব্রাণী বন্ধুত্ব ও একতার ভিত্তিতে মানবসমাজ গড়ে উঠবে।

৫. মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন ঐভেদ থাকবে না। সামাজিক ঐয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য সবাইকেই শ্রম করতে হবে এবং সামাজিক উৎপন্ন সবাই সমানভাবে ভোগ করবে।

৬. ঐত্বেক মানুষের তার নিজস্ব যুক্তি, উপলব্ধি, ইচ্ছা ও বিচারধারা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে এবং সে কোনভাবে কোন ঐকার দাসত্বের অধীন হবে না।

ঐই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে জাতিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা ও তার মৌলিক সংস্কারসাধন; ঐই আন্দোলন ছিল ভগবান ও সব রকমের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঐক যুক্তিবাদী যুদ্ধ ঘোষণা। কালক্রমে আত্মমর্যাদা আন্দোলন দক্ষিণভারতের

সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মূল মুখপত্র হিসাবে ১৯২৫ সালে তামিল সাপ্তাহিক পত্রিকা “কুড়ি আরাসুর”র প্রকাশনা শুরু হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদকে আক্রমণ করা হয় এবং জাত-বিরোধী, অস্পৃশ্যতা-বিরোধী এবং কংগ্রেসের বিরোধী প্রচার চলে। প্রকাশনা শুরু করার পর কয়েক বছর ধরে কুড়ি আরাসুর প্রথম পাতায় বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মনিয়ম ভারতীর এই বাণী ছাপা হত :

“সব মানুষই এক জাতির এবং

এক বর্ণের,

জাতি বিচার ভুল,

পার্থক্য করা পাপ।”

প্রথম আত্মমর্যাদা সম্মেলন (১৯২৯)

১৯২৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে চেন্নালপাট্টুতে প্রথম প্রাদেশিক আত্মমর্যাদা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সহযোগিতা করে সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন (যা জাস্টিস পার্টি নামে পরিচিত)। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মুখ্যমন্ত্রী ড. পি. সুব্বারাও। এই সম্মেলনে পেরিয়ার আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি উপস্থিত করেন এবং পরবর্তী তিন-চার বছরের কর্মসূচী গৃহীত হয়।

সম্মেলন একটি প্রস্তাবে “বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ন্যাকারজনক নীতি”কে নিন্দা করে এবং মানবসকলকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং পঞ্চমা— এইভাবে বিভক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করে। সম্মেলন ঘোষণা করে যে যেসব শাস্ত্র এইভাবে মানব সমাজকে বিভক্ত করার পক্ষে দাঁড়ায় তাদের সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। সমস্ত সরকারী রাস্তা, পুকুর, স্কুল ও মন্দিরে যাতে সব মানুষ অবাধ প্রবেশাধিকার ও চলাচলের অধিকার পায় সেইজন্য সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সম্মেলনে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের রূপকার ইরোড ভেঙ্কটাপ্পা রামস্বামী নাইকার তাঁর জাতিগত নাম ‘নাইকার’ বর্জন করেন এবং অতঃপর তিনি ই.ভি.রামস্বামী বলে নিজের পরিচয় দেন।

সম্মেলন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে দেবতাদের পূজো করার জন্য কোন অর্থব্যয় করা হবে না, কোন কাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হবে না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেদ, সংস্কৃত বা হিন্দী পড়ানোর জন্য কোন অর্থব্যয় করা হবে না।

সম্মেলনে বলা হয় যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ লেখা বাদ দিতে হবে এবং যুক্তিবাদের প্রচার চালাতে হবে। মন্দিরে পূজার্চনার জন্য এক পয়সাও খরচ করা চলবে না, নতুন কোন মন্দির তৈরী করা চলবে না এবং মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি টেকনিকেল স্কুল ইত্যাদি স্থাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। সম্মেলনের প্রস্তাবের মধ্যে আরো ছিল সব বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব।

সম্মেলনের এক প্রস্তাবে বলা হয় যে সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠা পূর্বশর্ত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে; মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছরে বাঁধতে হবে; বাল্য বিবাহ বে-আইনী করতে হবে; যে কোন পক্ষের ইচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিতে হবে; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পাত্র-পাত্রীর নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিবাহের অধিকার দিতে হবে এবং নারীদের যে কোন পেশায় যোগদানের অধিকার দিতে হবে।

১৯২৯ সালে প্রথম সম্মেলনের পর আরো কতকগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলির মাধ্যমে বর্ণাশ্রম ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা হয়।

পেরিয়ার ১৯২৫ সালেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন কিন্তু গান্ধী সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট মোহ ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে গান্ধী তাঁর বর্ণাশ্রম-বিরোধী মতবাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু ১৯২৭ সালে তাঁদের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত পার্থক্য দেখা দেয়। ১৯২৭ সালে মহীশূরে পেরিয়ার ও গান্ধীর মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। সেখানে উভয়ে বর্ণাশ্রম সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। গান্ধী বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পক্ষে বলেন। পেরিয়ার বলেন যে জাতিবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকেই (অর্থাৎ জন্ম অনুযায়ী মানুষের পেশা নির্ধারণ) উচ্ছেদ করতে হবে। এই সাক্ষাৎকারের পর জাতিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পেরিয়ার স্পষ্টতই গান্ধী-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন।

পেরিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ২০-এর দশকের শেষ দিক থেকে তিনি ভারতে এবং বিদেশে বহু সালে যান। পশ্চিমী দেশগুলি ছাড়াও তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। সম্ভবত এই ভ্রমণের পর তিনি সমাজতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকেন। ১৯৩০ সালে ইরোডে অনুষ্ঠিত আত্মমর্যাদা সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ১৯৩২ সালে তিনি আত্মমর্যাদা সম্মেলনে সমধর্ম পার্টি নামে এক রাজনৈতিক পার্টি গঠনের ংশব রাখেন। তামিল ভাষায় সমধর্ম কথাটি সমাজতন্ত্রের খুব কাছাকাছি অর্থ বহন করে। সমধর্ম পার্টির ংশবনায় বলা হয়

গত আট বছর ধরে আত্মমর্যাদা আন্দোলন জনগণকে কুসংস্কার, অভ্যাস, ধর্মীয় রীতিনীতি ও জাতিবাদের বি দ্বে জাগিয়ে তুলতে স ম হয়েছে এবং জনগণ তাঁদের অধঃপতিত আর্থিক অবস্থা সন্মুখেও সচেতন হয়েছেন

এটাও স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রীয় হস্তে প ছাড়া এইসব অযৌক্তিক কুসংস্কার ও জাতিবাদ থেকে জনগণকে মুক্ত করা যাবে না কিংবা তাঁদের আর্থিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটানা যাবে না

বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো জনগণকে সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বেঁধে রাখতে চায়।

সে কারণে নতুন রাজনৈতিক পার্টি গঠন করা প্রয়োজন। এই পার্টির জন্য দশ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সেই কর্মসূচীর মধ্যে সরকারী সম্পত্তির ব্যক্তিগত উপভোগ বাতিল করা, সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ করা, সরকার পরিচালনার সর্বস্তরে সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু করা, সমস্ত কল-কারখানার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেওয়া, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের জন্য কৃষিজ উৎপন্নের একটা ন্যায্য ভাগ সুনিশ্চিত করা, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি জনশিক্ষা ও টেকনিকেল শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা, জাতিগত পদবী লেখা নিষিদ্ধ করা ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে বাসস্থান, পরিবহন, দুধ ও চিকিৎসা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি প্রস্তাব ছিল।

এই সময়ে পেরিয়ারের সঙ্গে সিঙ্গারাভেলুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সিঙ্গারাভেলু ছিলেন মৎস্যজীবী জাতি থেকে আসা এক ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা। তাঁকে দক্ষিণভারতের ‘প্রথম কমিউনিস্ট’ বলে গণ্য করা হয়। ১৯৩১ সাল থেকে কুড়ি আরাসু-তে সিঙ্গারাভেলুর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের মধ্যে কুড়ি আরাসু বলশেভিকবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, কমিউনিজম এবং রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বহু লেখা ছাপে।

পেরিয়ার আন্দোলনকে অবশ্য পরে তার বামপন্থী বোঁক কিছুটা হ্রাস করতে হয়। তার কারণ একদিকে ব্রিটিশ সরকারের চাপ ও অপরদিকে অব্রাহাম আন্দোলনে সংরক্ষণশীলদের চাপ। তখন পেরিয়ার জাস্টিস পার্টির মধ্যে কিছু প্রগতিশীল ভাবধারা আনার চেষ্টা করেন। তিনি যখন আত্মমর্যাদা আন্দোলনে মনোনিবেশ করেছিলেন তখনো জাস্টিস পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। ঐ সময়ে তামিলনাড়ুতে জাস্টিস পার্টিই ছিল একমাত্র অব্রাহাম পার্টি।

জাতিবাদের বিপক্ষে আপোষহীন সংগ্রাম চালানোর চেত্রে পেরিয়ার রামস্বামীরা এখান হাতিয়ার ছিল যুক্তি বাদ। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে তিনি সমাজকে বিশেষ করেন ও তার সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের প্রধান রোগগুলি হল ভগবান, ধর্ম ও জাতি। সারাজীবন জুড়ে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি যুক্তির সাহায্যে এই ত্রিভুজগুলিকে আক্রমণ করেছেন এবং এগুলি যে ভারতীয় সমাজের তিক্ত করে ছেঁতে দেখিয়েছেন। এগুলিকে একটি শ্রেণী তার নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করেছে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ছিল এইরকম

ধর্ম আমাদের মস্তিষ্কে নষ্ট করে দেয় একত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিনাশ ঘটায়। এটা আমাদের সমৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং এগতির অসুবিধা। যে সব লোক অলস, যারা কোন পরিশ্রম না করে সবকিছু ভোগ করতে চায় ধর্ম তাদের কাছে খুব ভালো হাতিয়ার।

সামাজিক চেত্রে পেরিয়ার এক বহুমুখী সচেতনতা কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম চালান। পুরোহিতদের বর্জন করা, হিন্দু শাস্ত্রকে নিন্দা করা, আত্মমর্যাদা বিবাহ অনুষ্ঠিত করা, জাতিগত এখা না মানা এগুলি ছিল সেই বহুমুখী কর্মসূচীর কয়েকটি দিক। ১৯১৭ সালের পর থেকে তিনি লাগাতার এতিনিধিত্বের ধারণা সমর্থন করতে থাকেন। এর মাধ্যমে চিরাচরিতভাবে দৈহিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত শূদ্র জাতিগুলি অন্য ধরনের পেশায় ঢোকার সুযোগ পাবে এবং জাতিভিত্তিক শ্রমবিভাজনের কাঠামো ভাঙবে।

পেরিয়ার মনে করতেন যে নারীদের দাসত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া এবং পুরুষদের সঙ্গে তাদের সমানাধিকার ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। আত্মমর্যাদা আন্দোলন শুরু করার সময় থেকেই তিনি নারীদের সমানাধিকারের পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে এটা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। নারী মুক্তি সম্পর্কে তাঁর মতামত তিনি কুড়ি আরাশু ও বিধুতালাই পত্রিকায় লিখতেন। এ ছাড়া “নারীরা কি করে দাসত্বের বন্ধনে পড়লো” শিরোনামায় একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেন। নারী প্রশ্নে তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি সবচেয়ে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার এতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর শুরু করা আত্মমর্যাদা বিবাহ ছিল পুরোহিত তন্ত্র থেকে জনগণকে মুক্ত করার এক প্রয়াস। এই বিবাহে কোন পুরোহিত ডাকা হয় না। আত্মমর্যাদা আন্দোলনের নেতারা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পাত্র-পাত্রী ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনেরা একটি সভায় মিলিত হন। পাত্র-পাত্রী সকলের সামনে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন ও মালাবদল

করেন। এই অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর। পেরিয়ার নিজে এই ধরনের বহু আত্মমর্যাদা বিবাহের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন। তাঁর বহু বিখ্যাত বক্তৃতা এই ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত। এই অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি নারী মুক্তির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। এখন তামিলনাড়ু সরকার এই ধরনের বিবাহকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে। মনে হয়, তামিল সমাজের পাঁচ শতাংশ বিবাহ এই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটা খুব বড় না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্যে বামপন্থার ছড়াছড়ি কিন্তু বামপন্থী নেতারাও বিবাহ, শ্রাধ ও উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকেন। পশ্চিমবাংলার দলিত আন্দোলনের নেতারাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত না ডেকে চলতে পারেন না। তার সঙ্গে তুলনা করলে মানতেই হবে যে পেরিয়ার তামিল সমাজে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

নারী মুক্তি সম্পর্কে পেরিয়ারের প্রস্তাব ছিল:

১. নারীদের প্রকৃতি স্বাধীনতা দিতে হলে বিবাহ বাতিল করতে হবে।

২. নারীরা সম্মানধারণে অসম্মত হবেন।

৩. জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রসার ঘটাতে হবে।

৪. নারীদের কাজ দিতে হবে এবং সমস্ত চাকুরীর পঞ্চাশ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে।

৫. বিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার দিতে হবে।

৬. নারীদের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দিতে হবে।

৭. আত্মমর্যাদা বিবাহের প্রসার ঘটাতে হবে কারণ এই ধরনের বিবাহ হচ্ছে মর্যাদায় সমান নারী-পুরুষের মধ্যে একটা চুক্তি।

স্পষ্টতই পেরিয়ার নারীমুক্তি সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী মতামত পোষণ করতেন। রেনবো পাবলিশার্স তাঁর যে বইটি প্রকাশ করেছে সেটি আসলে নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা। চেন্নাই-এর এমারেন্ড পাবলিশার্স এটি ইংরাজীতে "Periyar on Women's Rights" শিরোনামে প্রকাশ করেছে। সেই ইংরাজী থেকেই বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। আশাকরি এই পুস্তিকার প্রকাশ বাংলাভাষী পাঠকদের মধ্যে পেরিয়ার সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করবে এবং এখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন দক্ষিণভারতের এই মহান চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীর চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।

শিরোনামটি শহিদ ভগৎ সিংয়ের একটি লেখা থেকে নেওয়া। মৃত্যুদণ্ডের সাজা নিয়ে যে মানুষ প্রায়াক্ষকার এক নির্জন কুঠুরিতে কাল কাটাচ্ছে, যাকে যে কোন মুহূর্তে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে ফাঁসির দড়িতে, এইরকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রায় সব মানুষই মানসিক দিক থেকে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। কামনা করে যেন মৃত্যুদণ্ডটি মকুব হয়ে যায়, কোন অলৌকিক ঘটনায় রক্ষা পেয়ে যায় প্রাণটা। আর এই কারণে সে যার উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে সে হচ্ছে ভগবান-ঈশ্বর-গড-আল্লা। মানুষ যা পারেনি - মানুষের সব চেষ্টা যেখানে এসে বিফল-ব্যর্থ হয়ে গেছে সেখানে চমৎকার করতে পারে একমাত্র সে। না-কে হ্যাঁ, হ্যাঁ-কে না বানিয়ে দিতে পারে সেই মহা শক্তিধর।

না - সেই চরম মুহূর্ত সন্নিহিত জেনেও ভগৎ সিং যুক্তি-বুদ্ধির অতীত - কোন অস্তিত্বের কাছে নতজানু হয়নি। বরং কেন সে এইসব গালগল্প-বুজবুজির বিরুদ্ধে অকুতোভয় তা লিখে রেখে গেছে।

কিছু ভগবান বিশ্বাসী নিজেদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে একটা যুক্তির অবতারণা করে থাকে— বয়স কম, শরীরের রক্ত গরম, একটু বয়স বাড়লে, রক্ত ঠাণ্ডা হলে তখন আর এত তেজ থাকবে না। সব ব্যাটাকে তখন ভগবান বাঁচাও বলতেই হবে।

কথাটা যে সর্বাংশে মিথ্যা সেটা বোধহয় বলা যাবে না। সেই যে এক আগুনখোর বীর বিপ্লবী ডু আর ডাই বলে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়েছিল, যুব বয়স কেটে গেলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চুল-দাড়ি রেখে ঋষি হয়ে গিয়েছিল। মানব-মুক্তির মার্গ বাতলাতে শুরু করেছিল সংস্কৃত শ্লোক আর আধ্যাত্মবাদের টিকাভাষ্যে।

সে কাল পার হয়ে একালে এসেও সেই পরম্পরা বহমান। একালেও অনেক বীর বিপ্লবীর মুখে মার্কস আর মনে ভগবত বিশ্বাস এবং বর্ণবাদের এক অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের জীবনচর্যার প্রতি পদক্ষেপে আমার সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এমন বৈপরীত্য।

এক মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবক যে বিপ্লবী তাড়নায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে

এসে বেছে নিয়েছিল কষ্টকর পলাতক জীবন। একদিন দেখি তার গলায় রূপোর চেনে
বুলছে বেশ বড় একটা মাদুলি। এটা কেন? বিপদজনক পথের যাত্রী। পুত্রের মঙ্গল
কামনায় বিঘ্ন-বিপদ নাশের জন্য মা এনে দিয়েছে কামাখ্যার মন্ত্রসিদ্ধ রক্ষাকবচ। বিপ্লবী
পুত্র মায়ের মনে কষ্ট দেবে না বলে অথবা মনের গোপন কোণে কোথাও একটা আস্থা
জীবিত থাকায় জামার নিচে ধুকধুক করা বুকের কাছে বুলিয়ে রেখেছিল সেই মাদুলি।

অবশ্য সেই শেষের সেদিন ওই মাদুলি কোন কাজে আসেনি। কাজে এসেছিল
বডি বহনকারী ডোমের। মদ-মাংসের খরচা উঠে গিয়েছিল।

কিছু মানুষ যুব বয়সে নাস্তিক থাকে আর বৃদ্ধ বয়সে আস্তিক হয়। এটাকে যদি
প্রশংসা করা, বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্বতা, জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বা জ্ঞানের বিকাশ
বলা হয়, তাহলে যে মানুষ যুব বয়সে আস্তিক এবং বেশি বয়সে যখন রক্তের তেজ
কমে এসেছে, অস্তিম সময় হাতছানি দিচ্ছে ঠিক সে সময় যদি নিজেকে নাস্তিক বলে
প্রমাণিত করে সেটাকে কী চোখে দেখা হবে? সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সুতীত্র অনুসন্ধানের
পর যে ব্যক্তি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ঈশ্বর আসলে কিছু ধাক্কাবাজ দুষ্ট লোকের
কল্পনা আর অশিক্ষিত দুর্বল চিন্তের মানুষের একটা অবলম্বন— তার সেই বক্তব্য,
যুক্তি-প্রমাণ মানা হবে কি হবে না? যখন সে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে তখন
তো সে চঞ্চলমতি বালক নয়, বিশাল বিদ্বান হিসাবে সমাজে স্বীকৃত।

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। রাহুল সাংকৃত্যায়ন। পারিবারিক ধর্মীয় পরিমণ্ডলে
তার বড় হয়ে ওঠা। ফলে, সে হিন্দু তথা বৈদিক ধর্মের যত পুঁথি-পুস্তক-শাস্ত্রগ্রন্থ গভীর
এবং নিবিড়ভাবে পঠনপাঠন-অধ্যয়ন করেছিল। অনুসন্ধান করেছিল সেই সত্য-যাকে
জানবার পরে সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘটে যায়, মনের দু'পাড় জুড়ে নামে গভীর
প্রশান্তি, জীবনধারণ সফল আর সার্থক বলে মনে হয়।

বহু বহু বছর নিরলস অধ্যাবসায়ে অধ্যয়নের পরেও তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান
পেল না এইসব পুঁথি-পুস্তক-ধর্মগ্রন্থের পাতায় — ধর্মগুরুদের বাণী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
টিকাভাষ্যে। মনে হল, সবই যেন সত্য থেকে দূর - এক নিরর্থক নির্বোধ কপোল কল্পনার
আশ্রয়ের আঁধারে শুধু কথার কচকচানি। এই জ্ঞান জীবনকে পরিণত করে না, আবদ্ধ
করে রাখে অজ্ঞান অন্ধকূপে।

তাই সে হিন্দু ধর্মকে পরিত্যাগ করল আর গ্রহণ করল বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধধর্মকে
বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যাকার নাস্তিকতার সমপর্যায়ের বলেই মনে করে কারণ এই ধর্ম
ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। পূর্বজন্ম-পরজন্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। পঞ্চশীল

আর অষ্টমার্গ এই মূলকথা, যা শুধু এই জীবন আর মানবসমাজ সমুদয় প্রাণীজগতের সব কিছুর সঙ্গে নির্ভয়-হিংসামুক্ত আনন্দময় হয়ে থাকতে পারে।

এরপর সে পাহাড়-পর্বত-দুর্গম পথ পার হয়ে হেঁটে তিব্বত যায়। বহু বৌদ্ধ মঠ পরিদর্শন করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। বহু অঞ্চল নগর পরিক্রম করে সংগ্রহ করে শত-সহস্র দুস্ত্রাপ্য পুস্তক। শোনা যায়, সেই পুস্তক বহন করে ভারতে নিয়ে আসতে চল্লিশটা গাধা লেগেছিল। অনেক বছরের অক্লান্ত অধ্যয়নের পরও এইসব পুঁথি-পুস্তক থেকে পোঁছতে পারল না সেই সিদ্ধঅন্তে অথবা সেই সত্যে যা অধিগত হলে সব সন্ধান শান্ত হয়ে যায়। এরই ফলে একদিন বৌদ্ধধর্ম থেকেও নিজেকে বিযুক্ত করে নিল সে। তারপর মনোনিবেশ করল মার্কসবাদ চর্চায়। এই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে, একেবারে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তার যে পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হল তা হচ্ছে — একজন বস্তুবাদী, বিদ্বন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনাস্থা জ্ঞাপনকারী, স্পষ্টবাদী সাহসী মানুষ।

ভক্তিবাদের সাথে যুক্তিবাদের বিরোধ আবহমান কাল ধরে চলছে। যুক্তিবাদের হাতুড়ির সামনে ভক্তিবাদ কোনদিনই মাথা তুলতে পারেনি। ভেঙে চোঁচির হয়ে গেছে। তাই ভক্তিবাদীরা আত্মরক্ষার দেওয়াল তুলেছে, একটা আত্ম-প্রবঞ্চনার আড়াল দিয়ে পরিত্রাণ খুঁজছে। যেভাবে মরু-ঝড়ের সময় বালির মধ্যে উঁট মুখ গুঁজে দিয়ে ঝড়কে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। পারে কী? হ্যাঁ, একটা-দুটো নিশ্চয় পারে। তবে বেশিরভাগই মরে দম বন্ধ হয়ে বালি চাপা পড়ে।

কী সেই আড়াল? বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস যে অন্ধ কে তাদের বোঝাবে? অন্ধত্ব কোনদিনই কোন সঠিক দিশা দিতে পারে না, কে বলবে তাদের? সঠিক পথ সঠিক দিশা দিতে পারে যুক্তিবাদ-বিজ্ঞানভিত্তিক প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সিদ্ধান্ত। যাহা না দেখিবে নিজ নয়নে, বিশ্বাস করিবে না গুরুর বচনে। চার্বাক দর্শন- বেদ আত্মা পরলোক প্রভৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। ওই প্রত্যক্ষ গোচরীভূত প্রমাণসাপেক্ষ মতবাদকে স্থান দিয়েছে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

বুদ্ধ, চার্বাক, ভগৎ সিং বা রাহুল সাংকৃত্যায়ন, এদের নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ অনেক জানা বোঝা পড়াশোনার সর্বশেষ পরিণতি। বহু পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা অন্বেষণ অধ্যয়নের পরে অন্তিম নির্ণয়। আমার ব্যাপারটা অত জটিল নয়। একদম স্পষ্ট। অধ্যয়নের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ তখন আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নিরক্ষর। বেদ-বেদান্তের বিচার-বিশ্লেষণ, শাস্ত্রসমূহের কুট ভাষ্যাদির বোধগম্যতা এখনই নেই, আর তখন! সেটা ঠিক কৈশোর আর যুবাবয়সের সন্ধিক্ষণ। হ্যাঁ, সেই বয়সে রক্ত

গরম, বুদ্ধি তরল থাকে সেটা ঠিক। তবে সেই তরল-চঞ্চল মনে-মস্তিষ্কে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, যে কারণে এক ঈশ্বরবিশ্বাসী মাতা-পিতার সন্তান হয়েও ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং অসীম ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে নাস্তিক হয়েছিলাম – আজও সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলেনি। তাই মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবার পরেও মন্দিরে প্রণাম, পুরোহিতকে প্রণামী দেওয়া হয়ে উঠল না। বিঘ্ন-বিপদে ভ্রাণকর্তা ভেবে ভগবানকে ডেকে ওঠা হয়ে উঠল না।

আমার বাবা ছিলেন নিতান্ত নিরীহ ধর্মপ্রাণ সরল সোজা মানুষ। তাঁর কানে মন্ত্র দিয়ে কেউ তাঁকে শিষ্য বানিয়েছিল কিনা আমার সেটা জানা নেই। তবে তিনি নিজেকে মতুয়া বলে ভাবতে ভালোবাসতেন। তাঁর বা আমাদের কারও কোন অসুখ হলে মতুয়া ধর্মগুরু নির্দেশিত পান্ডাভাত তেঁতুল গোলা জল আর কাঁচালক্ষা গুলে খাওয়াতেন এবং বিশ্বাস করে বসে থাকতেন— রোগ সেরে যাবে।

শিখদের যেমন স্বর্ণমন্দির, মুসলমানদের কাছে যেমন কাবা মসজিদ, মতুয়াদের কাছে তেমনই সবচেয়ে বড় তীর্থ ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়ি। মতুয়া মতবাদের প্রচারকরা বলে থাকেন যে স্বয়ং বিষ্ণু নাকি নরদেহ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নমো তথা মতুয়াদের দুঃখ-কষ্ট-অপমান-অত্যাচার-অন্যায় এইসব থেকে উদ্ধার করার জন্য।

ভগবান সেই বিরাট বিশাল শক্তিমান পুরুষের নাম, যিনি নাকি চোখের পলক পড়বার আগেই এই পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্র-অরণ্য-মরুভূমি-মানুষ-পশুপাখি-কীটপতঙ্গ সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন। আবার ইচ্ছা করলে চোখের পলক ফেলার আগেই একে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তা তিনি যখন এতবড় পারনেবালা, তখন তার অবতার হয়ে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসার দরকারটা কী ছিল? তিনি তো সেই মহাশূন্যে যেখানে থাকেন সেখানে বসেই মুহূর্তের ইচ্ছায় সব করে ফেলতে পারতেন। করলেন না কেন?

বলা হয়ে থাকে—তিনি নাকি লীলা করতে আসেন। কেন আসেন? না আসলে বা কী হয়? মানুষ হয়ে মানব সমাজে এলেন, মানুষের যা কিছু দোষগুণ-জীবনযাপন, আহার-নিদ্রা-মৈথুন সব কিছু করে পঞ্চাশ একশো বছর বেঁচে থেকে লীলা-টীলা করে শেষে মরে গেলেন? তাতে মানব সমাজের কোন মঙ্গলটা হল? তিনি তো এসেছিলেন মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য।

একজন করে অবতার আসেন, পৃথিবীর অবস্থা আরও খারাপ হয়। বুড়ো

লোকেদের মুখের প্রায়শঃ আক্ষেপ— আগের দিনকাল এখনকার চেয়ে ভালো ছিল। এই বুড়ো যখন বাচ্চা ছিল তার ঠাকুরদাদা, সে যখন বাচ্চা ছিল তার ঠাকুরদাদাও এই আক্ষেপ করে মরেছে। এবং এটাও শোনা যায়, আগেকার মানুষ বড় ধার্মিক ছিল। সৎ, নিলোভ, পুণ্যবান ছিল। তাই যদি হয়, তাহলে সেই অবতার আসার পরেও এমন অধোগতি হল কেন ধর্মকর্মের? তিনি (অবতার) যা করতে চেয়েছিলেন উল্টো ফল ফলল কেন? মানুষের অসৎ অভিপ্রায়ের সামনে ঈশ্বরের শুভ কামনা নিষ্ফল হল কেন? এর তো সোজা-সাপ্টা অর্থ যে, তিনি অবতার-টবতার নন। আর যদি তা হয়েও থাকে, তবে ঈশ্বর অতি দুর্বল অক্ষম অপদার্থ প্রাণী— এর বেশি কিছু নয়।

আমি আমার বাবাকে কোনদিন এমন কোন কিছু করতে দেখিনি যাকে শাস্ত্রসমূহ পাপাচার বলে ঘোষণা করেছে। চুরি-জুয়াখেলা-মদ্যপান-পরদ্বার গমন-হত্যা — কোন পাপেও তিনি পাপী ছিলেন না। সারাদিন মোষের মত খাটতেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতে বসে বসে হরিমান জপতেন। দরজা কোন দীন-দুঃখী-ক্ষুধার্ত এসে দাঁড়ালে নিজের খাবার থেকে ভাগ করে তাকে দিতেন। হরিভক্ত সেই মানুষটি সারাজীবন কোনদিন পায়ে চপ্পল, গায়ে জামা, মাথায় একটু তেল, পেটভরা ডাল-ভাত পেলেন না কেন? কেন তার সন্তান না খেতে পেয়ে চোখের সামনে শুকিয়ে তিলে তিলে মরে যায়? সেই কিশোর বয়সে আমাকে এইসব প্রশ্ন বড় উদ্বেল করে তুলত। যে ভগবান তার ভক্তকেই রক্ষা করতে চান না, তিনি তাহলে কিসের পরম দয়াল? তার কাছে কাঁদা মানে তো অরণ্যে রোদন!

বাবা বলতেন— দেশ-ভাগই নাকি তার ওই দুরবস্থার জন্য দায়ী। তাই যদি হয়, সেটাও তো ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে! তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নাকি গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না। যে বিষুৎ অবতার হয়ে হরিচাঁদ রূপে ওড়াকান্দিতে অবতীর্ণ, তিনি কী জানতেন না যে দেশভাগ হলে নমোজাতির মানুষ-মতুয়া ধর্মকে অবলম্বন করা মানুষ, সবার জীবন নরকতুল্য হয়ে যাবে! কোথায় আন্দামান, কোথায় দণ্ডকারণ্য, নৈনীতাল আর খালপাড় রেল-লাইনের ধারে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। যদি তিনি সব জেনে শুনেও তার ভক্তদের এমন অসহ্য কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকেন, তাহলে কিসের তিনি নমোজাতির ত্রাণকর্তা? তিনি কেমন দয়াময় হরি?

এটা অবশ্য নাস্তিকের ভাবনা নয়, পরম বিশ্বাসীর অভিমান ভরা অভিযোগ। তা না হয় কিছু সময়ের জন্য নাস্তিকতাকে বর্জন করা গেল। বিচ্যুত হওয়া গেল স্বধর্ম থেকে। সেই পরম ভক্তের অভিযোগের কী জবাব দেবেন ভগবান বা তাঁর প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে থাকা লোকজন?

বিষ্ণু-রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-অনুকূল-বালক ব্রহ্মচারী-লোকনাথ এঁদের দেবতা/অবতার না বলে যদি মানুষ বলা হয় তাহলে তাঁদের ক্ষমতার একটা নিজস্ব সীমা নির্ধারিত হয়ে যায়। তখন মেনে নিতে অসুবিধা থাকে না যে, মানুষ অনেক কিছু পারে, সবকিছু পারে না। আর যদি অবতার, যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তাঁর অংশ বলা হয়, দাবি করা হয়, তাহলে সব অন্যায় অপরাধের দায়ভার তাঁরই কাঁধে চেপে যায়। তখন নিজেকে নির্দোষ-নিরপরাধ প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁরই।

বলা হয়ে থাকে, ভক্তকে এইসব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে ভগবান নাকি তার পরীক্ষা নেন। কী ভয়ঙ্কর কথা! তাহলে তো তার নাম ভগবান না হয়ে হিটলার হওয়া উচিত ছিল। শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নির্দেশে এক ডাক্তার যুদ্ধবন্দি সৈন্যদের উপর এক মারাত্মক পরীক্ষা চালিয়েছিল। বন্দিকে চৌবাচ্চায় বরফ জলে ফেলে ঘড়ি ধরে পরীক্ষা করা হত কতক্ষণ সেই শীতল জলে বেঁচে থাকতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই পরীক্ষা করে দেখা যে, যদি তার সৈন্যদের শীতলতম সেই সাইবেরিয়ার বরফভূমিতে যুদ্ধ করতে হয় - কতক্ষণ প্রাণে বাঁচতে পারবে। দয়াময় নাম প্রচারিত ভগবান তো তাহলে সেই নৃশংস নর-পিশাচের চেয়েও বড় হিটলার, যিনি মানুষকে রোগ-শোক-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত-রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ঝঞ্ঝা-দেশভাগ-দাঙ্গা কতরকম যন্ত্রণা দেন এবং তাঁর ধর্মকাম মনোবৃত্তি পরিতৃপ্ত করেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘোলা দোলতলার যে রিফিউজি ক্যাম্প আমার শৈশব কেটেছে সেখানকার পরিবেশটা ছিল বড়ই হরিময়। নমো-পোদ সব মানুষই ছিল হরি-অস্ত্রপ্রাণ। আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠা সব তাই। আমার এক কাকা ক্ষীরোদ ব্যাপারী—তিনি তো সব ছেড়েছুড়ে সাধু হয়ে পলাশির এক ধর্মগুরু মহানন্দ হালদারের আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন। আর এক কাকা শশী ব্যাপারীর নিজস্ব একটা পালাগানের দল ছিল। খোল বাজিয়ে, চামর দুলিয়ে তিনি এখানে-ওখানে রামায়ণ গান গেয়ে বেড়াতেন। এছাড়া মাঝে মাঝে পলাশির মহানন্দ হালদার, ঘুটিয়ারি শরিফের মণীন্দ্র গৌসাই যেখানে যেত হরি সংকীর্তনের আসর বসাতেন। অঞ্চলের মানুষ মাঝে মাঝে হরিনামে গানে মাতোয়ারা হয়ে থাকত।

সেখানকার ডোল বন্ধ ক্যাম্পের রিফিউজিরা বড় গরিব ছিল। কোনদিন ভালোমত পেটে ভরে খেতে পেত না। তবু গুরু গৌসাই দেব-দেবতার প্রতি ছিল অচল-অটল-অসীম ভক্তি। নিজেরা শুকিয়ে থেকে গুরু গৌসাই ভগবান সেবায় ত্রুটি রাখত না।

সেই কিশোরকালেই আমার মনে প্রশ্ন জাগত, ভগবান বিশ্বাসী ধর্মভীরু এই যে

মানুষ, এদের জীবন জুড়ে এত দুঃখ-কষ্ট-অনাহার কেন? ভগবান তো চাইলেই এদের পেটে ভাত, পরিধানের একটুকরো কাপড়, বাসযোগ্য ছোট একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যিনি মুহূর্তের ইচ্ছায় কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবীর সৃষ্টি করতে পারেন এই সামান্য কাজটা তো তাঁর কাছে নসি। তবু কেন করেন না?

বলা হয়ে থাকে, এসব নাকি পাপের ফল। আমার একটি বোন যার বয়স মাত্র ছয় বছর, সে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে আমাদের চোখের সামনে মরে যায়। বুঝতে পারতাম না, ওইটুকু বয়সে সে ভগবানের কোন পাকা ধানে মই দিয়েছিল, যে এমন যম-যন্ত্রণা পেয়ে মরতে হল!

যখন আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি— এক ভগবান ভক্ত বোঝাল, এই জন্ম নয়, এটা তার পূর্বজন্মের কৃত অপরাধের সাজা। কোন শাস্ত্রে নাকি এমনই লেখা আছে। মানুষ যে সুখ ভোগ করে, অপঘাতে মরে, রোগে-শোকে ভোগে, অনাহাকে থাকে, সবই সেই গত জন্মের পাপ বা পুণ্যের ফল।

তাই যদি হয়, তবে অপরাধীকে বলা হোক সে কী পাপ করেছে। সিনেমার ফ্ল্যাসব্যাকের মতো ভগবান তাকে তার পূর্ব-জন্মটা দেখিয়ে দিল। তবে তো সে পাপ পথ কে দূরে থাকতে পারবে। মনুষ্য সৃষ্টি যে বিচার ব্যবস্থা সেখানেও তো অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিচারক বিচার করে অপরাধীকে জানায় কোন কোন অপরাধে তাকে কী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। মেয়াদ শেষ হবার পর সে আবার স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে। মানুষের সমাজে যে বিচার আছে ন্যায়ের প্রতিমূর্তি ভগবানের রাজ্যে সেটুকুও নেই কেন?

বলা হয় চুরি করা মহাপাপ। আমি আমার জীবন আতিপাঁতি করে খুঁজেও ষোল বছর পর্যন্ত এমন কোন কর্ম করিনি যাকে পাপ বলে। বাবার পেটে আলসার হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে শুয়ে পেটের ব্যথায় কাতরাতেন-কাঁদতেন। কোন কাজেকর্মে যেতে পারতেন না। তখন দিনের পর দিন আমরা না খেয়ে থাকতাম।

সেই ভয়ঙ্কর দিনে খিদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন এক দোকান থেকে একটা পাঁউরুটি এক ডেলা ভেলিগুড় চুরি করে নিয়েছিলাম। তবে পাকা চোর তো নই, তাই ধরা পড়ে গেলাম। দোকানদার তো এক-দুটো চড় মেরে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লোক মারফৎ সেই খবর যখন বাবার কানে পৌঁছিল-আচ্ছামত খেঁতো করলেন আমাকে।

সেই যে পাপ, যা করতে আমি বাধ্য হয়েছি, এর জন্য তো ভগবানই দায়ী।

তিনি যদি পেটে এক মরুভূমি খিদে না দিতেন আমি কী সেই মহাপাপ করতাম? তার দোষের সাজা আমার শরীরে বহন করতে হল কেন? বলা হয়ে থাকে তিনি নাকি চান কেউ পাপ না করুক, সৎ পথে থাকুক। তিনি তো সবজান্তা। হাজার হাজার বছর পরে কী হবে, কোন মানুষের জীবন কেমন কাটবে সব তাঁর জানা। তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানতেন যে আমি খিদে সহ্য করতে পারি না। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি পোড়া অজগরের মত মোচড় মারলে সব ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, আইন-কানূনের সীমা ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারি। আমাকে পাপ পথ থেকে বিরত রাখতে হলে আর কিছু না হোক দুবেলা দুমুঠোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা না হলে দেবালয়ও আমার হাত থেকে সম্মান রক্ষা করতে পারবে না। ভগবানের ক্ষমতার দাপট মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে। নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে, তিনি বুঝলেন না!

এটাই ছিল জীবনের সেই চরম বিন্দু যেখান থেকে ধীরে ধীরে মন সন্দিহান হতে থাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে। এই মহাবিশ্বের কোথাও কিছু ছিল না। তিনি একা ছিলেন, একেবারে একা। যাঁর বাপ নেই, মা নেই, জন্ম হয়নি, মৃত্যুও হবে না— কেমন যেন ভাবনাটার মধ্যে অতি-মহা অতিরঞ্জনের গন্ধ টের পাই। বিশ্বাস শব্দটার মধ্যে নির্বুদ্ধিতার ছবি দৃষ্টিগোচর হয়।

ছোটবেলায় গল্প শুনেছি এক কালী সাধকের। যার নাম রামপ্রসাদ। তিনি এতবড় সাধক ছিলেন যে তাঁর ঘরের বেড়া বানাতে কালী নিজে এসে হাত লাগিয়েছিলেন। বেড়া বাঁধতে হলে একজন এপার থেকে দড়ি ঢোকায়, ওপার থেকে আর একজনকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। এতক্ষণ সেই ঘোরানো কাজটা রামপ্রসাদের মেয়ে করছিল। সে হঠাৎ কিছু না বলে পুকুর থেকে জল আনতে বা ক্ষেতে ছাগল তাড়াতে চলে যায়। এদিকে রামপ্রসাদ তা না জেনে মেয়ের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। কালী তার শ্যামা এইরকমই কিছু একটা হয়তো নাম ছিল মেয়ের। —কোথায় গেলি রে মা! একটু রশিটা ঘুরিয়ে দিয়ে যা। সেই ডাকে কালী মেয়ে সেজে এসে যান।

রামপ্রসাদের অনেক গান আছে তাঁর নিজের লেখা। এইরকম একটা গানের বুলি— আমি চাই না মাগো রাজা হতে, রাজা হবার সাধ নাই মাগো, দুবেলা যেন পাই মা খেতে। আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা, পাই যেন তায় খড় যোগাতে। এই গানটাকে গদ্যে বদল করলে প্রথম লাইনটা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে — আমি আঙুর ফল খেতে চাই না, বড্ড টক। পরের লাইনের মানে দাঁড়াচ্ছে— এত বড় কালীভক্তের বিরিয়ানি পোলাও তো দূর, দুবেলা দুমুঠো ভাত খাবার মত সঙ্গতি নেই। আর শেষ লাইন থেকে বোঝা যাচ্ছে—তাঁর একটা কুঁড়ে ঘর আছে যাতে বছরে এক কাহন খড়

ছাওয়ার মত আর্থিক সক্ষমতা তার নেই। তাহলে এত সাধনার পর কালী তাঁকে কী দিলেন? ওই খালি ভাঙা বেড়ার ঘোরানো সুতলি!

বলা হয় সাধক ভক্তরা তাদের পুণ্যের ফল পায় মৃত্যুর পর। তাই যদি হয় তাহলে মৃত্যুর পরে রামপ্রসাদ কী সুখে আছে তার একটা ভিডিও করে ভগবান মর্ত্যের মানুষদের জন্য যদি পাঠিয়ে দেন তার আর কষ্ট করে বার বার ধর্মের সংস্থাপনায় অবতার হয়ে আসতে হবে না। ভিডিও তো সেই বাতাই দেবে মানুষকে। দেখাবে সেই দৃশ্য যাতে মর্ত্যের মানুষ বুঝবে যদি জীবৎকালের গোটাকয়েক বছর পেটে কিল মেরে, কষ্টেস্টে, সৎপথে ধর্মকর্মচর্চায় কাটিয়ে দিতে পারি, অনন্ত জীবন কাটবে মহাসুখে কিম্বারী-অঙ্গরাদের সান্নিধ্যে। ভগবান তো চান মানুষ সৎপথে ধর্মপথে আসুক। তবে সেই পথ-পদ্ধতি নিচ্ছেন না কেন? এমন বোকা কেউ নেই যে এক পয়সা লাভের লোভে কোটি টাকার মায়া ছেড়ে দেবে। তবে?

ভগবান নিজে কেন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। তিনি কিছু গুরু-গোসাঁইয়ের উপর মানুষকে ধর্মপথে আনবার ভার দিয়ে কোথায় কোন ক্ষীরসাগরে দুপাশে দুখানা হিরোইন নিয়ে আধশোয়া- আধবসা আধোঘুম-আধো জাগরণে আছেন। তাঁর যে ধর্মপ্রচারকগণ, মানুষ তো তাদের কথা কানে নিচ্ছে না। যে লোকটা দিনে লক্ষগুণা মিথ্যে বলে, সে যখন প্রবচন দেয় ভগবান আছেন, তিনি সব দেখছেন, সে যে মিথ্যা বলছে না মানুষ কী করে বুঝবে, বিশ্বাস করবে?

এই তো এক বড় ধর্মপ্রচারক - ধর্মসভায় বচন দেনবালা পুতির বয়সী একাটি মেয়েকে যৌন শোষণ করে দিয়েজেল খাটিছে। এ ধরা পড়েছে, অন্যগুলো এখনও ধরা পড়েনি। এদের কথা মানুষ মানবে কেন? ভগবান যদি সত্যিই থেকে থাকেন, যদি সত্যিই তিনি পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনা চান, চেনা-চামচাদের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে নির্বোধের মত কাজ করবেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দেব — যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ সহ একবার ধরাধামে আসতে। আসবেন কী? ভগবানের রাজ্যে একটা অভ্যুত্থান নিয়ম — মানুষ তার সব সুকর্মের ফল পাবে মৃত্যুর পরে। আগে নয় কেন? সে যে পেল বা পেল না তার কোন প্রমাণ কে দেবে? এটাই একটা মস্ত চালাকি।

এক গুরুঠাকুরের একটা বাণী আছে—রনে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব। মানতেই হবে এই বাণীর পিছনে একাট তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। ধরা যাক, একটা লোক পা পিছলে প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে পড়ে গেল। ট্রেন আসছে, সে ভয়ে ডেকে উঠল—অমুক বাবা, বাঁচাও। ট্রেন তার একটি হাত বা পা কেটে দিয়ে চলে গেল। কী বলা হবে তখন? বাবার নাম নিয়েছিল

বলে চাকা গলার উপর দিয়ে যায়নি। প্রাণটা বেঁচে গেছে। বাবার নামের এমন মহিমা। অর্থাৎ, একটা অঙ্গহানির পরেও সেই বাবাজির নাম ফাটবে।

আর যদি চাকা গলার উপর দিয়ে চলে যায়? অপরাধ জগতে একটা কথা আছে, মৃত মানুষ কথা বলে না। তখন তো সেই বেচারী বলতেই পারবে না বাবাকে ডেকেছিলাম, তবু বাঁচিনি। এবং কেউ যদি সেই ডাক শুনেও থাকে, কোন বাবার চালা এমন ব্যাখ্যাও দিতে পারে— ডেকেছে, তবে ডাকার মত ডাকেনি, তাই ...।

ডাকার মত ডাকা — এই আর একটা বজ্জাতি। এই কথাটা প্রায় সব ধর্মগুরু বলে থাকেন—ডাকার মত একবার ডাকতে পারলে ভগবানকে পাওয়া যায়। যে এতবড় পণ্ডিত কথা বলছে, মহাজ্ঞানী সাজছে, তাহলে সে নিশ্চয়ই জানে ডাকার মত ডাকা কাকে বলে? আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সাধারণ জ্ঞান তাতে জানি রবীন্দ্রসঙ্গীত কাকে বলে। কাকে বলে শ্যামাসঙ্গীত, বাউল গান, লোকগীতি, কীর্তন বা আধুনিক গান। সব গানের সুর-স্বর আলাদা আলাদা। যদি কেউ সঠিক সুরে সঠিক গানটি গায়, তবেই সেটি সেই গানের পদবাচ্য হয়। নচেৎ নয়। ঠিকঠাক কোনভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলে সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে। তার একটা স্বরলিপি আছে। যে কেউ সেই স্বরলিপি ধরে চর্চা করলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী হতে পারবে।

সেই ডাকার মত ডাকতে পারা মহাসাধক তার একটা স্বরলিপি তৈরী করে দিন। ‘হরি হে দেখা দাও’ বলার সময় গলাটা কোন খাদে রাখতে হবে, ক-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হবে, কোন শব্দ কঠোর, কোন শব্দ কোমল হবে। কটা দীর্ঘশ্বাস পড়বে, নিপুণভাবে লিখে দিন। পারবেন? যদি পারেন, এই আমরা যারা ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান, পরখ করে নিতে পারি। প্রহ্লাদ ডেকেছিল, ভগবান এসেছিলেন। কুন্তী মন্ত্র পড়েছিল, ধর্ম এসে বাচ্চা বানিয়েছিল—এইসব গালগল্প পুরনো হয়ে গেছে, এখন তাজা কিছু উদাহরণ চাই।

বলা হয় ভগবান নাকি তাঁর বিপন্ন ভক্তকে রক্ষা করেন তাই তাঁর নাম বিপদভঞ্জন। অতীতে তো দেশে কটা বড় বড় দাঙ্গা হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কালে হল গুজরাট আর উত্তরপ্রদেশ। একদল এদিক থেকে হর হর মহাদেব বলে বাঁপিয়েছিল, আর একদল ওদিক থেকে বাঁপিয়েছিল আল্লা হো আকবর বলে। মহাদেবের ভক্তদের গলা আল্লার দল কেটেছে, আল্লার দলের গলা মহাদেবের দল। দুদিকে লাশের পাহাড় জমেছে। কোন ভগবানই কাউকে বাঁচাতে ছুটে আসেননি।

ওরা তো— কী বলা হবে! ধরা যাক ধর্মহীন দুষ্কৃতকারী। কিন্তু একদল আসল

গেরুয়া পরা ভক্ত, চুলদাড়ি রাখা ভক্ত, যারা ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার একটা আনন্দদায়ক মার্গ বানিয়েছে, এই তো বছর ত্রিশ-বত্রিশ আগে তাদের দেড় ডজনকে দিনের বেলা দুর্বৃত্তরা ধরে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়েছে। গেরুয়া পরা সাধু যখন, নিশ্চয় সেই সময় প্রাণভয়ে ভগবানকেই ডেকেছিল। কই, এলেন না তো ভগবান! ওই মাগের অন্য সাধুরা এখন ভগবানের বিচারের উপর ভরসা না রাখতে পেরে রাজ্য সরকার-কেন্দ্রীয় সরকার-সি.বি.আই. এদের কাছে বিচার চাইছে। কারণ সবার চেয়ে তারা বেশি জানে ভগবান জিনিসটা কি! যে ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসার নামে শিশির জল দেয় নিজের রোগে, সে কী তা খাবে? খাবে না। তাই তারা বিচার চাইছে মানুষের বিচারালয়ে।

মানুষ, একমাত্র মানুষই বড় বিচারক। কিন্তু কোন মানুষ? যে শিক্ষিত, সচেতন, কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক। যে জানে তার এই অনাহার অভাব অনটন অপমান অত্যাচার এসব কোন পূর্বজন্মের পাপের ফল নয়। এই জন্মের শোষণ-বঞ্চনার পরিণাম। গুটিকয়েক লোক কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফুলে ফেঁপে হিমালয় হয়ে উঠেছে। সেই কুক্ষিগত সম্পদ কেড়ে নিয়ে যদি সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়, কেউ কোথাও গৃহহীন-অনাহারী থাকবে না। কিন্তু সেই কাজটা কঠিন - খুবই কঠিন। কারণ, সেই শোষণ আর শাসন ব্যবস্থার সামনে শিখড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাগ্য, ভগবান, পূর্বজন্ম, পরজন্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, অনেকগুলো কাল্পনিক বাধা। যদি মানুষ এই বাধাকে অতিক্রম করতে না পারে, দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি অসম্ভব।

মানুষের বুকে এখন চাই সেই যৌবনের তেজস্পর্ধা, যাতে সে বলতে পারে আমি বিদ্রোহী ... ভগবান বুকে ঐকে দেই পদচিহ্ন। আর যদি সে বুড়ো মানুষের মতো জপ করে মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, তো একশোজন মার্কস-আম্বেদকরও ফেল হয়ে যাবে। এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।

রবীন্দ্রনাথের চীন-চর্চা ও চীনের রবীন্দ্র-চর্চা

আশীষ লাহিড়ী

বিজ্ঞানী জে ডি বার্নাল বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হলেন আধুনিক ভারত থেকে উঠে আসা প্রথম সত্যিকারের আন্তর্জাতিক মানুষ। তিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের আপসহীন বিরোধী — স্বদেশে ও বিদেশে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ, যা অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আশীর্বাদপুষ্ট, ফ্যাশিজমের রূপ ধরে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। আবার একথাও ঠিক, উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অনুগ্রহ জাতীয়তাবাদের একটা ইতিবাচক ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। চীনের ইতিহাস তার সাক্ষী। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের এই দ্বিমুখী চরিত্রের দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করেছিলেন? চীনের ১৯১৯ সালের ‘৪ঠা মে আন্দোলন’ের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওঠাপড়া বিশ্লেষণ করলে তার একটি ছবি ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মানবতাবাদ, যাকে তিনি ‘মানুষের ধর্ম’ নামে অভিহিত করতেন, তার শক্তি ও দুর্বলতা শুধু নয়, চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের শক্তি ও দুর্বলতার ছবিটাও সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। ছবিটা আমাদের কাছে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, এই বিবেচনায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে পেশ করা হল।

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন চীনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মোড়-ফেরানো ঘটনা, যাকে চীনের রেনেসাঁস বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। সেই প্রেক্ষাপটে সেখানকার অগ্রণী শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদদের মনের ওপর এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল-বিজয়ী (১৯১৩) উপনিবেশিক কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রভাব পড়েছিল। অল্পকালের জন্য চীনের মুক্তচিন্তকরা রবীন্দ্রনাথকে বিনা সমালোচনায় অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। তরুণ হবু-কমিউনিস্ট নেতা ছু ছিউ-পাই (Qu Qiubai) ১৯২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে র‍্যাডিকাল সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ তাঁর কাকা ছু জুনং (Qu Junong) একটি কবিতায় বেগ্রসাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার যৌথ উদ্বোধন ঘটান; দেখাতে চান, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন একটা পরিব্যাপ্ত সুষমা আছে যা নিছক শারীরিক বিচ্ছেদকে অতিক্রম করে যায়।^১ বিশেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ কুয়ো মো-জো (Guo Moruo)) সমুদ্রতটে বসে দ্য ক্রেসেন্ট মুন থেকে ‘জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা

করে খেলা’ কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিজের বালক পুত্রকে আবৃত্তি করে শোনান। নিজের কবিতার মধ্যেও উদ্ধৃত করেন রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার স্তবক।^{১৭} রবীন্দ্রনাথের ঐ বইয়ের নামের অনুসরণে চীনে গড়ে ওঠে ক্রেসেন্ট সোসাইটি নামে তরুণ কবি-সঙ ঘ, চলে নিবিড় রবীন্দ্র-পাঠ।

রাজনৈতিক স্তরে তখন সুন ইয়াং-সেনের গণতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সদ্যোজাত কমিউনিস্ট পার্টির নিবিড় সহযোগিতার যুগ। ‘১৯২৪ সালে মাও ও লী তা-চাও কুওমিনতাঙের নীতি পরিবর্তনের কাজে সুন ইয়াং-সেনকে সাহায্য করেন। সেই সুবাদে সুন সোভিয়েৎ রুশের সাথে ও চীনা কম্যুনিষ্টদের সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য করবার নীতি প্রণয়ন করেন।’

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ যত দানা বাঁধতে থাকে, শাসক-শাসিত দ্বন্দ্ব যত তীব্র হতে থাকে, ততই চীনের ছাত্র এবং শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানাত্মক সাহিত্য-আদর্শ ও জীবনদর্শন নিয়ে বিতর্ক বাড়ে। ছু ছিউ-পাই, মাও দন, কুয়ো মো-জো’র মত তরুণ ভাবুক ও কবিগণ ক্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা ও স্বপ্নকল্পনার ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন। এশিয়ার এক ঔপনিবেশিক দেশের মহাকবির কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতা নয়, উপনিবেশ-মুক্তির সংগ্রামী মানবতার বার্তা শুনতে চাইছিলেন তাঁরা। অপরদিকে, কেন্সিজ-ফেরৎ কবি সু শি-মো (Xu Zhimo) হয়ে উঠলেন চৈনিক সাহিত্যের অন্তর্মুখী আত্মকেন্দ্রিক শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ। ১৯২৫-এ তখনকার হতদরিদ্র লাঞ্চিত চীনের আটশ বছর বয়সী কবি সু শি-মো সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোয় গিয়ে দেখেছিলেন শুধু শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়-পরা হতশ্রী মানুষ, তাদের বিষণ্ণ মুখ, মলিন ভারগ্রস্ত আকাশ, তুষারাচ্ছন্ন শীতল মৃত্তিকা, পণ্যহীন দোকান আর সার্বিক নৈরাশ্য। ‘মদমন্ত’ লেনিন তাঁর কাছে শুধুই ধ্বংসের প্রতীক। অথচ ১৯৩০ সালে প্রায় সত্তর বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ ঐ সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখেই মন্তব্য করেন, ওখানে না গেলে তাঁর ‘এ জন্মের তীর্থদর্শন’ অসমাপ্ত থেকে যেত। আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন বিপরীত মানসিকতার কবি সু শি-মো চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

১৯২৪ সালে ‘নবজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাসভা’র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে চীনে আনবার ব্যবস্থা করেন সু শি-মো। ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারী একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে আশ্বস্ত করেন, ‘আজকাল অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করিতেছে। সংবাদপত্রে চীনের রাজনৈতিক ব্যাপারের যে বিবরণ বাহির হয়, উহার প্রায়ই কোনো ভিত্তি থাকে না; ইহার অনেকই মিথ্যা ও অত্যাশ্রিত দোষ-দুষ্ট।’^{১৮} চীন সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা নিয়ে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ শাংহাই পৌঁছিলেন। পরের মাসে একের পর এক বক্তৃতা দিলেন।

১৯১৬ সালে জাপানে যা বলেছিলেন, এখানেও মোটের ওপর তাই বললেন : পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সভ্যতা জড়বাদী এবং ধ্বংসপ্রবণ; ঐ সভ্যতার মোহে পড়ে আধ্যাত্মিক গুণে সমৃদ্ধ, সৃজনশীল চেতনায় ভরপুর এশীয় সংস্কৃতির মূল সদগুণগুলোকে বিসর্জন দেওয়াটা বোকামি। কিন্তু চীনের মতো ‘আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক’ দেশের সংগ্রামী মানুষের ওপর একথার অভিঘাত যে ঐ মুহূর্তে কত অন্যরকম হতে পারে, তা তিনি ভাবতে পারেননি। জাপানে তাঁর উগ্র-জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তৃতিঘোষণা ক্ষুব্ধ করেছিল খোদ জাপানি সাম্রাজ্যবাদকেই; কিন্তু এখানে ধ্যানাত্মক মার্গের ওপর জোর দিতে গিয়ে তিনি অজান্তেই সরাসরি চীনের নবজাগ্রত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনালহরের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। ফলত চোঁঠা মে আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের বিরাট এক অংশের কাছে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আপত্তিকর রূপে নেতিবাচক বলে মনে হল। য তাঁদের মনে হল, অনশনবন্দী ক্রীতদাসকে যেন অতিভোজনের বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করছেন রবীন্দ্রনাথ। শাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছু ছিউ পাইয়ের সহকর্মী, সাহিত্য-সমালোচক ও ঔপন্যাসিক মাও দুন (Mao Dun) কবির ঐ সাবধানী মূল্যায়ন করলেন। নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, দেশপ্রেমের জন্য, কাব্য-ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করলেন; কিন্তু একই সঙ্গে চীনের রবীন্দ্রভক্তদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচ্য সভ্যতা’ আর ‘আত্মার অমরাবতী’র বার্তায় অভিভূত না হন—

ঠিক ঐ মুহূর্তে আমরা দেশের মধ্যে যুদ্ধবাজদের দ্বারা নিপীড়িত, দেশের বাইরে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা। স্বপ্ন দেখবার সময় এটা নয়। বহুকাল আগে আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা কনফুশীয় চিরায়ত সাহিত্যবচন আউড়ে ডাকাত-নিধনের চেষ্টা করতেন। সেদিনের সে-কৌশল যতখানি কাজ দিয়েছিল, আজকের দিনে আলোকোজ্জ্বল অভাগতদের ধ্যানে নিজেদের মগ্ন রাখাটা ঠিক ততখানিই কাজ দেবে। আমি বলব, এর থেকে অনেক ভালো স্লোগান দিয়েছেন উ বিউ হুই: ‘শত্রুদের মেশিন গানের জবাব আমরা চীনের মেশিন-গান দিয়েই দেব; তাদের কামানের উত্তর দেবে আমাদের কামান।’^৫

চীনের তরুণ কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব ছেন তু শিয়ু (Chen Duxiu) যিনি কনফুশিয়াসের বদলে ‘শ্রীযুক্ত বিজ্ঞান’ ও ‘শ্রীযুক্ত গণতন্ত্রে’র সাধনা করবার আহ্বান রেখেছিলেন ছাত্রদের কাছে, তিনি চীনের রবীন্দ্রভক্তদের বিদ্রূপ করে বললেন এরা চায় ‘আমাদের রেলপথগুলো, আমাদের বাষ্পীয় জাহাজগুলো, ধ্বংস হোক, আমাদের

ছাপার প্রেসগুলো উঠে গিয়ে আবার সেই কাঠের ব্লকের ছাপাই যুগ ফিরে আসুক, গাছের বাকল কঁুদে বানানো হোক ক্যানো নৌকো, ফিরে আসুক ঠেলা গাড়ি’। এ এক স্পষ্ট মেরু-বিভাজন।

রবীন্দ্রনাথের চীন আগমনের মাস ছয়েক আগে থেকেই ছু ছিউ পাই প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সংগ্রাম-ভোলানো পশ্চাদমুখী ধোঁয়াটে সংস্কৃতির প্রতিনিধি, আপন দেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিপরীত মেরুতে যাঁর অবস্থান :

ভারত ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের শিল্প-অর্থনীতির এক অঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস করেন এক অতীত যুগে, তাই তিনি এখনো স্বপ্ন দেখেন যে, ‘প্রেম আর আলোকে’র বার্তা ইংরেজ পুঁজিপতি শ্রেণীর হৃদয় জয় করতে পারবে। তাই তিনি সর্বপ্রযত্নে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী। ভারত ইতিমধ্যে আধুনিক ভারতে পরিণত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন এখনো চান ব্রহ্মনিকতনে ফিরে যেতে। রবীন্দ্রনাথ আর ভারতের চলার পথ যে পরস্পর-বিপরীত তাতে আর আশ্চর্যের কী। এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েকশ বছর পিছিয়ে গেছেন।

এমনকি কুয়ো মো-জো, যিনি অল্প কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আশ্রয় পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন, তিনিও লিখলেন, ‘প্রাচ্যের ওই অবক্ষয় একটা অসুখ, যার মূলে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাসত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা ‘মরফিন আর নারকেল-চোলাই মদ’ ছাড়া আর কিছুই না। তা কেবল ‘সম্পত্তি-মালিক আর অবকাশ-উপভোগীদেরই ভোগ্য’। তাঁর শান্তিবাণী একটা বিপজ্জনক ভেক: ‘শান্তির সপক্ষে প্রচার সম্পত্তিবান শ্রেণীকে রক্ষা করার জাদুমন্ত্র; সম্পত্তিহীনদের পায়ে ডাডা-বেড়ি পরিয়ে রাখে ঐ মন্ত্র।’^৬

বিদ্রোহী ছাত্ররা এইসব ভাবনা দ্বারা উগ্রভাবে প্রভাবিত হল। রবীন্দ্রনাথ এক শহর থেকে অন্য শহরে তাঁর শান্তিময় সংস্কৃতি-বার্তা প্রচার করতে লাগলেন, ছাত্ররাও তাঁকে অনুসরণ করে তাদের পুস্তিকা বিলি করতে লাগল, বক্তৃতার মাঝে মাঝে তিব্বত বৈরিতামূলক প্রশ্ন তুলে তাঁকে বিরত করতে লাগল, স্লোগান দিল: ‘হস্তী দূর হঠো! হস্তী! ছেন তুশিয়ু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাতির (সাদা?) তুলনা করে বিদ্রূপভরে বলেছিলেন, এটি হল সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে আত্মগর্বী, সবচেয়ে বশংবদ এবং সবচেয়ে “অসাড়” প্রাণী। ছাত্র-প্রতিবাদ তুঙ্গে উঠল বেইজিংয়ে। পুস্তিকা বিলি করে বলা হল, প্রাচীন চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন চীনের যুবসমাজ তা প্রত্যাখ্যান করছে।

ঐ সভ্যতা মেয়েদের অবমানিত করত, অকারণে যুদ্ধ করত, অদ্ভুত সব পারিবারিক ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করত আর সকল বিষয়ে নির্বিকার এক চির-সহিষ্ণু জনগণকে লালন করত :

আমাদের কৃষি আমাদের কৃষকদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে না, আমাদের শিল্প প্রকৃত অর্থে গৃহশিল্প, আমাদের ঠেলাগাড়ি আর নৌকোগুলো সারা দিনে মাত্র কয়েক মাইল চলে, আমাদের ভাষা এক-সিলেবল-যুক্ত, আমাদের লিখন ভাবলিপিময়, আমাদের মুদ্রণশিল্প পড়ে আছে সেই কাঠের ব্লক-খোদাইয়ের স্তরে, আমাদের রাস্তাগুলো শৌচাগার, আমাদের নোংরা রান্নাঘরগুলো সারা দুনিয়াতে আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। আর এসবের পরে ঠাকুরমশাই এসে আমাদের নিন্দে করছেন এই বলে যে আমাদের সভ্যতা নাকি বড় বেশি জড়বাদী। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আমরা কী-ই বা করতে পারি?*

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এর চেয়ে ভুল মূল্যায়ন আর হতে পারে না। অন্যসব কিছু ছেড়েই দিলাম, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর চরকা-বিতর্কই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রচারিত ‘মিস্টিক’ কবির তকমা, সুশি-মোর মতো চৈনিক রবীন্দ্র-ভক্তদের ‘মিস্টিক’ ভাবোচ্ছাস এবং চীনে রবীন্দ্রনাথের নিজের কিছু কিছু মন্তব্য এরকম ভুল বোঝাকে প্রায় অবধারিত করে তুলেছিল। একটা উদাহরণ দিলে ছাত্রদের ক্ষোভের পটভূমিটা বোঝা যাবে। ঠেলাগাড়ি-আকীর্ণ, শৌচাগারে পরিণত রাস্তা আর অসুস্থ জীবনযাত্রার পরিচয়বাহী নোংরা রান্নাঘরের অবমাননিক জীবনযাত্রা (এগুলো সবই কলকাতা শহরের চিৎপুর রোডের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথের নিত্যন্ত চেনা বাস্তবতা!) থেকে যারা মুক্তি পেতে চাইছে, তাদের কাছে বেইজিংয়ের রাজপ্রাসাদের জীর্ণতা দেখে মর্মাহত কবি আধুনিক চীনের সমালোচনা করেন এই ভাষায়:

যখন দেখি চীনের মানুষ নিজেই চীনের একান্ত নিজস্ব গুণপনার সর্বনাশে সাহায্য করছে, যখন দেখি তারা প্রতিদিন এমন সব জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যেগুলো নিছক কাজের প্রয়োজন মেটায়, যখন দেখি তাদের হাতের আঙুল একদা কী অবিশ্বাস্য সৃজনশীলতা অর্জন করেছিল সেটা তারা নিজেরাই ভুলে গেছে, তখন মন বিষাদে পূর্ণ হয়। এর মধ্যে দিয়ে যে অনীহাজনিত আলস্য প্রকাশ পায় তা সভ্যতাহীনতার পরিচায়ক। কেননা প্রকৃত সভ্যতা সেইসব জিনিসের মূল্য বোঝে যার আসন পাতা মানুষের উচ্চতর প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃত

সভ্যতা সেইসব জিনিস উৎপাদন করবার জন্য, সেগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য, তাদের উৎকর্ষ বজায় রাখবার জন্য, পরিশ্রম করতে সদা-প্রস্তুত। ... চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন সুরুচির বিচার বর্জন করেছে। এই পরাজয় তাদের বর্ণহীন একঘেয়েমির এক মরুভূমিতে ঠেলে দেওয়ার বিপদের সম্মুখীন করেছে, যা শুধে নেয় সব বর্ণ আর সভ্যতার সব বৈশিষ্ট্য।^৮

মানতে হবে, এ মন্তব্য বিদ্রোহী ছাত্রদের এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখকদের মনে সাড়া জাগানার মতো ছিল না। অথচ ভেবে দেখতে গেলে, মেলবার মতো অভিন্ন ভূমিযে একেবারে ছিল না তা কিম্বদন্ত নয়। ছাত্ররা যাকে বলছিল ‘সকল বিষয়ে নির্বিকার এক চির-সহিষ্ণুতা, তারই পরিণতি তো রবীন্দ্রনাথ-কথিত ‘অনীহাজনিত আলস্য’। বস্তুত সেই অনীহাজনিত আলস্য দূর করবার প্রয়াসেই তো চৌঠা মে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চীনের এক নতুন যুগে পা-ফেলা। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে তার ভালোমন্দের, সুরুচি-কুরুচির, কোনটা সম্পদ আর কোনটা বোঝা তার হিসেবনিকেশগুলো অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রয়াস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন কি? থাকলে চীনকে সেই চিরাচরিত ‘পরিবর্তনহীন প্রাচ্য’-ভাবকল্পের কাঠামোয় রেখে বিচার করতেন না। এই ভ্রান্তির মূলে সু শি-মোর মতো রবীন্দ্র-ভক্তদের এবং ভারতে রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরদের ভূমিকা বড়ো কম নয়। চীনে আসবার প্রস্তুতিপর্বে সু শি-মো কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে চীন সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়ে বিপথগামী করেছিলেন, তার নমুনা তো আমরা ওপরে পেয়েছি।

এই কবিনিন্দা স্বভাবতই বিনা প্রতিবাদে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে তোপ দাগেন সু শি-মো। কিন্তু তিনি যা বললেন, তা রবীন্দ্রনাথকে ঐ নতুন যুগের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোকিত করার বদলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্রোহী ছাত্র-যুব শক্তির ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের দূরত্বটা বাড়িয়েই দিল :

তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সৃজনশীল জীবনের, আত্মিক স্বাধীনতার, আন্তর্জাতিক শান্তির, শিক্ষায় উন্নতির প্রবক্তা, তিনি বিশ্বজনীন প্রেমের বাস্তবায়নের প্রবক্তা। অথচ ওরা বলছে, উনি নাকি সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর, পুঁজিতন্ত্রের প্রতিভু, উনি নাকি পরপদানত এক দেশের দাসত্ব-শৃঙ্খলবদ্ধ জনগণের কাছ থেকে পলাতক দেশান্তরী, উনি নাকি এমনই এক পাগল যিনি চীনা মেয়েদের পা বেঁধে-রাখার প্রথার সমর্থক! আমাদের রাজনীতিবিদ আর ডাকাতদের হৃদয় কলুষে পূর্ণ

হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কবির কী সম্পর্ক? আমাদের হবু-পণ্ডিত আর হবু সাহিত্যিকদের মাথা বিভ্রান্তিতে ঠাসা হতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের কবির কী সম্পর্ক?

ভক্তের উচ্ছ্বাস হিসেবে যতই উল্লেখযোগ্য হোক, এই প্রশস্তি নবজাগ্রত চৈনিক জাতীয়তাবাদীদের তোলা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জাতীয়তাবাদীরা চাইছিলেন একটা আশ্বাস: বিদেশি কামানবন্দুক চীনের শরীর ও মনের ওপর যে অন্ধকারের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তা থেকে বেরনোর চৈনিক পথটা কী? রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা সে উত্তর পাননি। তার চেয়েও বড়ো কথা, তাঁরা যে সে উত্তর চাইছিলেন, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন না। তাই চীনের বর্তমানের চেয়ে চীনের শাস্ত্র অতীতের ওপর জোর দিয়েছিলেন বেশি। ফলত চীনের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা নিয়েও চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপুল জনজাগরণের অন্তর সেদিন তিনি স্পর্শ করতে পারলেন না। অপরদিকে, সেই আন্দোলকারীরাও তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে তুলল। তার ধরে নিল, তিনি ‘ওদের’ লোক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৈরী হল অকারণ এক দূরত্ব।

রবীন্দ্রনাথ চীন থেকে ফিরে আসার অল্পকালের মধ্যে চীনের অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে। ১৯২৬ সালের ১৮ মার্চ সরকারি নির্দেশে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর চলল গুলি। শতশত ছাত্র প্রাণ দিল। তাদের অপরাধ, তারা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করবার জন্য জড়ো হয়েছিল। লু শুন লিখেছেন, “আর, এদের ‘দাঙ্গাবাজ’ নাম দিয়ে সরকারি নির্দেশনামা জারি হল। এধরনের অত্যাচার জন্মেরা তো কখনো করেই না, এমনকি মানুষও বড়ো একটা করে না। এর সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায় এমন একমাত্র ঘটনা হল রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের হুকুমে কসাকদের হত্যাকাণ্ড।” ১৯২৬ সালের ১৮ মার্চ দিনটিকে লু শুন চৈনিক ‘প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পরবর্তীকালের অন্ধকারতম দিন’ বলে চিহ্নিত করেন।^৯

এতদিন পর্যন্ত চীনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাম-কুওমিনটাং গোষ্ঠীর ‘সহযোগিতা’ চলছিল সুষ্ঠুভাবে, কিন্তু... ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে চিয়াং কাই-শেক নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী সেনা শাংহাই শহরে দলে দলে হত্যা করে বাম-ভাবাপন্ন শ্রমিকদের। ... ১৯২৭ সালের ৭ আগস্ট মাও সে-তুঙ কমিউনিস্ট পার্টির এক বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন —“বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস”।^{১০} চীন পরিষ্কার দুটি পথে বিভক্ত হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ সালে অধ্যাপক তান য়ুন-সান শান্তিনিকেতনে আসেন — চীন থেকে নয়, সিঙ্গাপুর থেকে। দ্বিধাবিভক্ত চীনের কোন্ পথের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি চান? ১৯৩১ সালে তান ফিরে যান চীনে, যে-দেশ তখন গৃহযুদ্ধে বিদীর্ণ। ‘১৯৩৩ সালে প্রধানত [অধ্যাপক তান য়ুন-সানের] উদ্যোগে নানকিং শহরে “ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ” গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগেই কুয়োমিন্‌টাং সরকার’ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। তান য়ুন-সান শান্তিনিকেতনে এলেন। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চীন-দেশীয় বুদ্ধিজীবী-বন্ধুদের উদ্দেশে’ যুগপৎ ‘তাঁদের সহানুভূতি ও তাঁদের অর্থানুকূল্য’ চেয়ে আবেদন করেন।^{১১} এরই মধ্য সু শি-মো, যিনি ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তিনি ১৯৩১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত। বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই উদ্যোগে আহ্বাদিত হতেন। কিন্তু চিয়াং-বিরোধী সৃজনকর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা এই ভারত-চীন সংস্কৃতি-চর্চার যৌথ উদ্যোগকে কীভাবে দেখেছিলেন, সে বিষয়ে তেমন তথ্য হাতে নেই। এটুকু জানি, যক্ষ্মারোগে ভুগে লু শুন ১৯৩৬-এ প্রয়াত; ছু ছিউ পাই ১৯৩৫ সালে চীনের কুওমিন্‌টাং সরকারের ফ্যারিং স্কোয়াডের গুলিতে নিহত। অপরদিকে, রানী চন্দর স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি: ‘তার পর (১৯৪৯) “রেড চায়না” হল—প্রফেসরের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল ...’^{১২} যার অর্থ, তান য়ুন-সান এবং তাঁর রবীন্দ্র-সংযোগের প্রতি চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির বিরূপতা রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরেও কিছুদিন টিকে ছিল। “ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ” স্থাপনার প্রয়াসে মাও দুন, কুয়ো মো-জো প্রমুখ দীর্ঘায়ু বুদ্ধিজীবীদের কোনও ভূমিকা ছিল কি? যদি না থাকে, তাহলে কি বলব, রবীন্দ্রনাথের চীন-সংস্কৃতি চর্চার এবং চীনের রবীন্দ্র চর্চার উদ্যোগ একপেশে ছিল? যে নতুন দুনিয়ার প্রতি উন্মুখ ছিলেন চৌঠা মে আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ চীনের ছাত্র-যুব-লেখক-শিল্পীরা, যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির অভাব থাকার কোনো কারণ ছিল না, তার সঙ্গে বিশ্বভারতীর এই একপেশে চীন-চর্চা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলে মনে হয় না। অপরদিকে চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখক-শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথেষ্ট না-জেনেই একপেশেভাবে তাঁর প্রতি অকারণ বিরূপতা লালন করতে থাকেন।

জাপানের চীন আত্র মণ ও রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৭ সালের ১৪ এপ্রিল চিয়াং কাই-শেকের পাঠানো পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ও শুভেচ্ছা নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় চীনা ভবন। তার ঠিক তিন মাস পর আবার বদলে যায় চীনের রাজনৈতিক চালচিত্র। ফ্যাশিস্ট জাপান চীনের ওপর ভয়াবহ পৈশাচিক আক্রমণ শুরু করে। নানকিং ধ্বংসকাণ্ডে অন্তত তিন লাখ লোক

মারা যায়। সদ্য-রোগমুক্ত রবীন্দ্রনাথ সে-আক্রমণের নিন্দা করেন কঠোরতম ভাষায়। ১৯১৬'য় সাম্রাজ্যবাদী জাপানি জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে যে-ধিকার জানিয়েছিলেন তারই তীব্রতর রূপ ফুটে ওঠে। সেই সময় রাসবিহারী বসু জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে জাপানি সমরবাদের সমর্থকদের খাতায় নাম লেখাতে অনুরোধ করেন। ‘রাসবিহারীর ঐ ধৃষ্টতাপূর্ণ তার পাইয়া তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন’। চিঠির উত্তরে সরাসরি লেখেন :

তোমার তারটি পেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা অস্থিরচিন্তে কাটিয়েছি। কেননা তোমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে আমার বড়ো কষ্ট হয়। খুব ভালো হত যদি তুমি এমন কোনো উদ্দেশ্যে আমার সহযোগ চাইতে যাতে আমার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে ওঠে না। [জাপান] ... নিজেই আজ প্রাচ্যের অসহায় দেশগুলোর মানুষের কাছে এক জঘন্যতর আপদ হয়ে উঠেছে।’ (১০ অক্টোবর ১৯৩৭) ^{১০}

নাছোড়বান্দা রাসবিহারী ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ টোকিয়ো থেকে আবার লেখেন,

প্রিয় গুরুদেব,

আমার এক জাপানি বন্ধু - আপনার পরম ভক্ত - আমাকে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছেন আপনার পক্ষে আর একবার জাপানে আসা সম্ভব হরে কি না। খরচপত্র যা লাগবে, আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে একরকম করে মিটিয়ে নিতে পারব। অন্তত বিশ হাজার ইয়েন আমরা তুলতে পারব যা নিশ্চয়ই আপনার যাওয়া-আসার খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া আমরা আপনার হাতে অন্ততপক্ষে দশহাজার ইয়েনের একটি তোড়া তুলে দিতে পারব। অঙ্কটা বেড়ে বিশ হাজারেও পৌঁছতে পারে। ^{১১}

ফ্যাশিস্ট জাপানের হয়ে এই অবিশ্বাস্য রকমের নির্লজ্জ দালালির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সংযত কিন্তু সংহত ক্রোধে অভিসম্পাত জানান জাপানি সভ্যতার এই মমাস্তিক বিকৃতিকে :

জাপানকে আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি। তাই সেখানে গিয়ে যদি দেখতে হয় যে সেদেশের শাসকরা একটি প্রতিবেশী দেশে গিয়ে এমন সব অমানুষিক কাজ করবার জন্য কাতারে কাতারে লোক

পাঠাচ্ছে যা মানবজাতির ইতিহাসে তাদের নামকে অনপনেয় কলঙ্কে
লিপ্ত করবে, তাহলে সেটা আমার পক্ষে বড়ো বেশি বেদনাদায়ক
হবে।^{১৫}

এখানেও অবশেষে বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম। কিন্তু বিশের দশকের
চীনের রবীন্দ্র-বিরোধী ছাত্ররা, যারা ততদিনে পরিণত যুবক; বিশের দশকের চীনের
তরুণ লেখকরা, যারা ততদিনে প্রৌঢ়; যারা চীনকে পালটে ফেলার জন্য মরণপণ
লড়াইয়ে লিপ্ত, তাঁর সে-খবর রাখতেন কি?

সূত্রনির্দেশ

১. Jonathan D. Spence, The Gate of Heavenly Peace: The Chinese and Their Revolution, 1895-1980, Faber and Faber, London, Boston, 1982, p. 137
২. Spence, p. 169
৩. প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়, মাও তুং-তুং কবিতা সমগ্র ও কাব্য বিশ্লেষণ, শ্রেয়া পাবলিকেশন্স, কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা ৮
৪. সমীর সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০১১, পৃষ্ঠা ৯১৭
৫. Spence, p. 176
৬. Spence, p. 176. প্রায় ঐ কথাই বলবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আরো বছর বারো পরে: নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। / শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। / বিদায় নেবার আগে তাই/ডাক দিয়ে যাই/দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।
৭. Spence, p. 177
৮. Sisir Kumar Das (ed.), The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol.3, Sahitya Akademi, New Delhi 1996, p. 556
৯. Lu Xun, Selected Works (1957), Vol.II, Foreign Languages

Press, Beijing, 1980, p. 259

১০. প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯
১১. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, চতুষ্কোণ, কলকাতা ১৯৬৭, ৩-৫২৩
১২. দ্রষ্টব্য সমীর সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৪৬৫
১৩. নেপাল মজুমদার, ৪-২৩৮-৯
১৪. নেপাল মজুমদার, ৫:৪৮৪-৪৮৫
১৫. নেপাল মজুমদার, ৫:৪৮৫



Tagore at China

জাতপাতের বিজ্ঞান গবেষণা : ভূত তাড়ানো না ভয় বাড়ানো?

তুষার চক্রবর্তী

সমাজ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের যে জটিলতা ও গভীরতা তাকে অসামান্য বললেও বোধহয় সবটা বলা হয় না। তাই সে নিয়ে অনেক কথা যদিও বলা হয়েছে - তবু কিছুই হয়তো বলা হয়নি। মানবসভ্যতা যদি আজ তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়া বড় বড় সংকট কোনোমতে কাটিয়ে উঠে অন্ততঃ আরো কয়েক দশক টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তাহলে এই বিষয়টি সম্ভবত আগামী দিনে জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে। বর্গীকরণ, বিশেষীকরণ, খন্ডজ্ঞান, চাপিয়ে দেয়া মতাদর্শ, এই জাতীয় বাস্তবতায় শাসকের মতই সতত শশব্যস্ত বর্তমানের বুদ্ধিমার্গ জীবনের সত্যিকারের জটিলতা ও গভীরতার মধ্য প্রবেশ করতে বিমুখ। আর কতকটা সেই বিমুখতার কারণেই সামাজিক বিষয়কে চটজলদি কোন না কোন বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার যেসব প্রয়াস চলে - তাদের মধ্যে অতিসরলীকরণের উপদ্রব চোখে পড়ার মতো। এই ধরনের কাজে তাই সত্যিকারের সৎ ও কৌতুহলী বিজ্ঞানীরা অনেকেই সাড়া দেন না। আর, সেই সুযোগে, যাঁরা এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের সবার না হলেও অনেকের মধ্যেই উঁকি মারে হয় বিতর্কের আঁচে মোতাত জমাবার ইচ্ছে, নয়ত আরো নেতিবাচক কোনো মতলব বা কর্মসূচী।

জাত এবং ভূত— সমস্যা হিসেবে দুটোই যেন অনেকখানি একজাতের। ভূতের ওঝা যেমন ভূত তাড়ানোর নামে ভূতের ভয় বাড়ানোর কাজ আসর জমিয়ে করে থাকে, জাতপাতের ওপর বিজ্ঞানের আলো ফেলার কাজ তেমনি প্রকারান্তরে জাত-কে বাস্তব বলে প্রমাণ দাখিল করার কাজেই লাগে। অনেকেরই হয়ত মনে নেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ জাতিবাদী গবেষণাকে প্রায় নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অতঃপর সবদিক খতিয়ে দেখে ১৯৫১ সালে ঘোষণা করা হল যে মানুষ একটিই প্রজাতিভুক্ত। জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি — সেটা কবিত্ব নয়, সমাজ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যে হক কথা তাকে মান্যতা দেওয়া হল। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের মানবগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণায় জাতি কথাটা ব্যবহার করা গেলেও এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সর্বজনীন ভাঙ্গারে জমা রাখতে হবে - যাতে অন্যরা তা যাচাই করতে পারে। অর্থাৎ, বিদ্যাচর্চার ফাঁক দিয়ে জাতপাত সমাজে প্রতিষ্ঠার সুযোগ না পায়

তাও নিশ্চিত করার প্রয়াস নেওয়া হল। তার পরেও ১৯৭৮ সালে মানবাধিকারের আলোয় জাতি ও জাতের নামে বজ্জাতি করার অপচেষ্টাকে নিশ্চিহ্ন করার ডাক দেওয়া হয়েছে, এবং ১৯৯৫ সালে মানবিক বহুত্ববাদকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেখার দাবী জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের তরফে। এর কারণ দেশে দেশে এইসব কুপ্রথা এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এসবে উস্কানি দেবার মত পন্ডিত ও ক্ষমতাবানের অভাব যে হয়নি, সেটা দুঃখজনক হলেও সত্যি কথা।

তবু এসব উপেক্ষা করে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জিনচর্চার নামে থেকেই ইতিউতি এই নিষেধের গাণ্ডি পেরনো শুরু হয়। আর, এখন এই কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতের মত দেশের বেশ কিছু জিনবিজ্ঞানীকে। যাদের আড়াল থেকে চালনা করেছেন হাতে গোনা কয়েকজন মার্কিনি গবেষক। এদের আসল ইচ্ছে— রাষ্ট্রসংঘের ঐ বিধিনিষেধ একটু একটু করে তুলে দেওয়া।

বিজ্ঞানের এ বিষয়ে গবেষণায় বিধিনিষেধ কেন থাকবে — এমন প্রশ্ন কারো মনে উঠতেই পারে। আসলে, এর উত্তরটাও খুব সহজ ও যুক্তিনির্ভর। বিজ্ঞানের ওপর প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন এতে একেবারেই ওঠে না। কেননা জাতের মত একটা সমাজনির্মিত বিষয় নিয়ে বিশুদ্ধ বংশগতি ও জিন-গবেষণা চালানোই হল গাছের আগাটাকে গোড়া বলে দেখাবার ধোঁকাবাজী। কার্যকারণ সম্পর্কটা উল্টে দিয়ে সামাজিক আরোপিত বিধিকে তা প্রকৃতিদত্ত বলে দাড় করাতে সাহায্য করে। যার ফলাফল, নিছক কোলাহল নয়, শেষতক কতটা হলাহলে পরিণত হতে পারে সেটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন হিটলার, মুসোলিনী, তোজো। সেই মহাযুদ্ধের মত মহাপাপের শতবর্ষের শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আমরা কি আবার নতুন করে সেই কু-পথে পা বাড়াব? রাজনৈতিক বিচক্ষণতা না থাকলে বিজ্ঞান গবেষণা ও পাণ্ডিত্য সমাজের মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই ডেকে আনে।

এদের এইসব গবেষণা কি সিদ্ধান্ত টানে সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ঠিক সেই কারণেই, গবেষণার প্রামাণ্য বিষয় নিয়ে বা ফলাফল নিয়ে তর্ক তোলা এসব ক্ষেত্রে আদ্যন্ত বৃথা— যেখানে গবেষণার ভিতটাই ভুল সিদ্ধান্তের ওপর গাঁথা হয়েছে। যে নামজাদা প্রতিষ্ঠান বা যে দেশের বিজ্ঞানীরাই এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকুন না কেন— তাতে তেমন কিছু যায়-আসেনা। অনেকেই মনে করেন যে, একজাতীয় শীর্ষ গবেষকরা এসব অবৈজ্ঞানিক কাজ কিন্তু সুযোগ বুঝে ও জেনেশুনেই করেন। পাঠকরা, ছাত্ররা, অনেকসময় না জেনে যা বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেন। যাতে জাতিভেদ বিজ্ঞান আশ্রয়ী এমন ধারণা বিদ্যায়তনিক মহলে প্রশ্রয় পায়। এরকম গবেষণার একটা উদাহরণ এখানে

উপস্থাপিত করতে চাই।

জাতপাতের লড়াই না শ্রেণীসংগ্রাম?

তবে তার আগে, রাজনীতির কথা যখন উঠে এল, তখন আরো দু-একটা বিষয় আলোচনা করে নেওয়া এয়োজনীয়। এথমেই আসব ভারতে জনপ্রিয় যান্ত্রিক সাম্যবাদী রাজনীতি এসঙ্গে। গোটা ভারতেই সামাজিক সমাজজীবনের অন্যতম এখান ল গ চিহ্ন জাতি এবং বর্ণ। এই ধরনের মোটা ও সু হরেকরকম ভেদাভেদ সামাজিক বৈষম্য বজায় রাখা ও বাড়িতে তোলার ে ত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যকেও বহু ে ত্রে ছাপিয়ে গেছে। আসলে ভারতে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি জাতিবর্ণ স্রবিন্যাসকে যেখানে লঙ ঘন করেছে তা গৌণ ও যেখানে তাকে আশ্রয় করেছে তাই মুখ্য। এবং আজ অবধি আমরা এই ছকটা ভাঙতে পারিনি। আমাদের যাবতীয় গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক, সাংবিধানিক বিধিবিধান এই বেলা কাণ্ডজে বাঘ হয়ে রয়ে গেছে। এ ে ত্রে শি ত ? বাঙালী ভাবের ঘরে চুরি করতে বেড়ে ও শাদ। জাতপাত যে টিকে আছে তা মানা হয় না। তর্ক তুলতে গেলে তা ব্যতিক্রমী বলে দাবী করা হয় বা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যাঁরা এই সব দাবী করছেন তাঁদের মূল্যবোধ ও আচরণে জাতবর্ণ বিভাজন যেন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। বরং, ভারতের অন্যান্য এদেশে এই বিষয়টি অধিকাংশ ে ত্রে সরাসরি স্বীকার করা হয়।

সুতরাং ভারতে জাতপাতের পরিচয় কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হয়ে বহাল তবিয়ে টিকে রয়েছে। নিছক অর্থনৈতিক সাম্য এই বৈষম্য মিলিয়ে দেবে, গুড়িয়ে দেবে এমন নয়, আবার তার বদলে নিছক জাতপাতের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যে সমাজ-অর্থনীতি বদলানো যাবে সেটাও মনে হয় না। জাতপাতের বাস্তব বৈষম্যকে স্বীকার করে ভারতে সমাজ পরিবর্তন আনায় যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন — সেই আশ্বেদকর, লোহিয়ারা ভারতীয় রাজনীতি থেকে যে ক্রমশঃ প্রত্য হয়ে গেছেন সেটা একদিকে যেমন ভারতীয় রাজনীতিতে মনুবাদী প্রভাবের নিদর্শন, অন্যদিকে ছকবাঁধা ফর্মুলানির্ভর বামপন্থী ও মার্কসীয় রাজনীতির কর্মফল, যাঁরা সমাজকে সৃজনশীলভাবে ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেনি ও বন্ধুশক্তি বাছতে ভুল করেছে।

একদিকে যেমন আন্তর্জাতিকতার নামে সাম্যবাদী তাত্ত্বিক নেতারা অনেকেই ঐ মহতি তত্ত্বের প্রয়োগমুখী ভারতীয়করণের প্রয়োজনটাকেই অতীতে নাকচ করেছেন আবার অন্যদিকে এসব বিষয়ে যেটুকু কাজ আজকাল হচ্ছে তা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের মারফৎ। সেখানে প্রশ্ন এবং তত্ত্ব দুই-ই খাড়া করেন বিদেশি পন্ডিতের

দল। যাদের উদ্দেশ্য, বিধেয় সন্দেহজনক এবং অগভীর। অবশ্য সেটা মন্দের ভালো। এইসব তত্ত্বের ওপর ভর করে ভারতের ওপর যেসব সামাজিক গড়াপেটোর কর্মসূচী বিগত শতাব্দীতে ঠান্ডায়ুদ্ধের পর্বে নেওয়া হয়েছে - তার কোনটাই এসব মদতদাতাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি। যদিও দ্বিতীয় দলের প্রয়াস এখনো চলছে।

কিন্তু, চালাকি দিয়ে যে শুধু মহৎ কাজ করা যায়না তা নয়— বড়সড় দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজই ফাঁকি দিয়ে সফল করা যায় না। ভারতে জাতপাতের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে শ্রেণীসংঘাত তীব্র করা ও সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য সমাজকে জানতে ও বুঝতে হবে। মার্কস, লেনিন, মাও-এর কোটেশন ভুলভাল আউড়ে বা পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের শলাপরামর্শ মেনে চললেই যে সে সব বিদ্যা ভারতে কার্যকরী হবে এমন নয়। ভারতে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাম এবং ডান এই দুই ধরনের অপপ্রয়োগ এখন প্রায় পাশাপাশি চলছে।

জিনছক

ইউনেস্কো জাতিবাদী গবেষণা নিষিদ্ধকরণের ডাক দিলেও তা কার্যত রাষ্ট্রসংঘের নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জিন গবেষণা, বিশ্বব্যবস্থার উচ্চবর্গের এলিট সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন-জাতিবাদী চিরাচরিত যে কর্মসূচী, অতি দ্রুত তার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠল। আণবিক বস্তুসত্তা বা ডি-এন-এ তাকে বৈধতা দিল। এককথায় তাদের এই ঝোঁককে আমরা বলতে পারি আণবিক বা মলিক্যুলার জাতিবাদ। এর চরম ও খোলামেলা বহিঃপ্রকাশ যেখানে যেখানে দেখা গেছে তা ভর্তসিত হয়েছে। ফলে, মৃদু বা মোলায়েম মলিক্যুলার জাতিবাদ তুলনায় ছড়িয়েছে বেশি। সেটাই হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানে জাতিবাদের প্রধান কর্মভূমি। জিনচর্চা ও জিনপ্রযুক্তি যে সমাজে বৈষম্য তাড়াবার বদলে বরং বাড়াবে সেটা এই প্রযুক্তির কর্মকর্তারাও অনেকেই স্বীকার করে নেন। অবশেষে, মানব জিনোমের মানচিত্র আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতা বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা অর্জন করল। জিনছককে বলা হল আত্মোপলব্ধির মহত্তম সোপান। এই ভাবেই একুশ শতকের জিনবিজ্ঞান জাতিবাদের নয়কে হয় করে ফেলল। চারপাশে দেয়াল তোলা একনিষ্ঠ রিডাকশনিস্ট বিজ্ঞানের মধ্য সমাজপ্রভুদের ইচ্ছা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করানো হয় তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত-স্থল এই জিনছক ও জিনোম ম্যাপ, জিন ছাপিয়ে যা এখন প্রোটিনছক ও প্রোটিন মানচিত্র তৈরীর দিকেও এগোচ্ছে।

মানুষে মানুষে জিন ও প্রোটিনের বৈচিত্র খোঁজার পথে হাঁটতে হাঁটতে জীব বিজ্ঞানীদের একাংশ - নৃতত্ত্বদের মধ্যে যে জাতিবাদী মতাদর্শগত প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদ রোপণ করেছিল, হয়ত অজান্তেই তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু, তার ফল কোথায়

গিয়ে ঠেকছে? জিনের বস্তুবাদী ঘরানার কল্যাণে জাত, জিন, নৃতত্ত্ব এখন বিদ্যায়তন ও গবেষণায় অতি ঘনিষ্ঠ - ঠিক যেমনটা ঘটছিল একশো বছর আগে, দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রাকমুহুর্তে। মানুষে মানুষে যে জিনগত তফাৎ তাই দিয়ে জাত-জাতির ভেদাভেদ যুক্তিসিদ্ধ করা হচ্ছে। তা নাক গলাচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে। অথচ, যে কোনো তথাকথিত জাতি বা জাতের ব্যক্তিমানুষদের মধ্যে যে জিনগত তফাৎ বিরাজ করে তা যে সবক্ষেত্রেই দুটি জাত বা বর্ণের মধ্যে সামান্যিকৃত কোনো জিনগত পার্থক্যের চাইতে বেশি - এই বিজ্ঞান-প্রমাণিত মূল সত্যটাকে উহ্য রাখা হচ্ছে। ঠিক, এই কারণেই জিনবিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষে বা জনগোষ্ঠীতে জিনগত পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করা যায় - কিন্তু জাতি, জাত বা বর্ণকে প্রামাণ্য মেনে নিয়ে কোনো জীববিজ্ঞান বা জিনবিজ্ঞানের গবেষণাই করা যায় না। যায়না, কেননা, জিনবিজ্ঞানের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোনো উপপ্রজাতি রয়েছে বা তা হয়ে উঠছে এমন নয়। যদিও জাতি, জাত বা বর্ণ ঠিক সেই দাবীই করতে চায়। জীব বিজ্ঞানকে এই কাজেই তারা পাশে পেতে একান্ত ইচ্ছুক। যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাকে জৈবিক বলে প্রমাণ করাটাই এই জাতীয় প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই, যে জিন ও জিনোম কেন্দ্রিক বহু অতিকথা ও কষ্টকল্পনাকে প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে দিনরাত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে থাকে প্রতিহত করা মানে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা নয়, বরং সেটাই বিজ্ঞানীদের যথার্থ কাজ। জিন বিজ্ঞানীদের একটা বিরাট অংশও যদিও বিভ্রান্তির খপ্পরে পড়ে গেছেন। আর তা বজায় রাখতে প্রায় নিয়ম করে জিনের সীমা ছাড়ানো অতিকথা ও অপপ্রয়োগকে চাগিয়ে রাখা হচ্ছে।

জিন আর্থ এবং অনার্থ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রেরণায় নৃতত্ত্ব, সাংখ্যায়ণ ও জিনতত্ত্ব মিলিয়ে জাত, বর্ণ এদের নিয়ে গবেষণায় খানিকটা উৎসাহ এ দেশে দেখা দিল। সেই চর্চা সাম্প্রদায়িকতার মত জাতিভেদকেও উস্কাই দিল। জার্মান, জাপান, ইতালির পণ্ডিত গবেষকরাও এতে ইন্ধন যোগালেন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নিয়ে যতটা আলোকপাত হয়েছে, এই দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে তা হয়নি। যুদ্ধান্তে রাষ্ট্রসংঘের জাতি বিষয়ক ঘোষণায় খানিক পরিমাণে এই পাপ মুক্তির লক্ষ্যে ভারত থেকে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন হুমায়ুন কবির। সে সব কথা আমরা ভুলে গেছি।

কিন্তু ভারতে জাতপাত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহ কমেনি। ১৯৫০ থেকে অন্যান্য আরো কিছু দেশের পাশাপাশি মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা ভারতের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে নানা জাতপাত ও

সামাজিক (ন্যাক্কারজনক) পরীক্ষানিরীক্ষা চালান — যদিও তাতে জিনতত্ত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগ তেমন ছিল না ভারতে জিনবিজ্ঞানীদের জাতপাতের গবেষণায় টেনে আনার প্রয়াস তাই প্রায় নতুন করে শুরু হল হিউম্যান জিনোম প্রকল্পের পরবর্তী অধ্যায়ে। এই পর্বে মানুষের ক্রমবিকাশ বা ইভলিউশন বিষয়ে গবেষণার নামে মানুষের জিনের নমুনা সংগ্রহের হিড়িক যখন ছড়িয়ে পড়ল, সেই ডেউ এসে আছড়ে পড়ল ভারতে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল আদিবাসী ও মূলবাসী মানুষজন। জিনের নমুনা পাবার জন্য রক্ত সংগ্রহের এই ব্যাপক অভিযানকে সে সময় আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা নাম দেন রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার প্রজেক্ট। এই জিন নমুনা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর প্রফাইলিং ও গোপন গোয়েন্দাগিরির জন্যও জরুরী ছিল। আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক নমুনা সংগ্রহের মধ্যও সেই উদ্দেশ্য লুকনো আছে। কিন্তু সরাসরি জাতপাত বিষয়ক গবেষণাও এই পর্বে আর অচ্ছুৎ রইল না।

অবশেষে, নেচার পত্রিকায় ২০০৯ সালে একটি গবেষণাপত্র বেশ ফলাও করে একাশিত হল। ভারতের নামজাদা জিন-গবেষক এবং একটি শীর্ষ গবেষণা সংস্থা 'র অধিকর্তা লালজি সিং দুজন মার্কিন গবেষকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজটি করলেন। নমুনা যোগাবার কাজটা করলেন লালজি সিং, কিন্তু বিশেষণের কাজটা মূলত ডেভিড রিখের। রিখ হার্ভার্ড এবং এম আই টি-র সঙ্গে যুক্ত ব্রড ইন্সটিটিউটের একজন শীর্ষ বিজ্ঞানী। ভারতের জিন ও জাতি গবেষণা তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয়। ডেভিড রিখ, অ কিছু জিনের নমুনা থেকে এটা দাঁড় করাতে চান যে, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের আড়ালে রয়েছে দুটি মাত্র প্রধান বংশানুক্রম। এদের একটিকে এরা বলেন আদি উত্তর-ভারতীয় রূপ (ANI- Ancient North Indian) এবং অপরটি আদি দক্ষিণ ভারতীয় (ASI - Ancient South Indian)। বস্তুত, যা ভারতে জাতিবাদের আদিরূপ, আর্য ও অনার্য তত্ত্ব নতুনভাবে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা।

উত্তর বনাম দক্ষিণ

বিজ্ঞানের নামে চালানো হলেও আসলে এইসব গবেষণা হল রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পাথের। ভারতীয় রাজনীতির একটি প্রধান অক্ষ যে আঞ্চলিকতার দ্বন্দ্ব তা গত কয়েক দশকে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও হিন্দুস্থানে আঞ্চলিকতার সঙ্গে জাত-পাতের সংমিশ্রণ আপামর ভারতবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলার একটি উপকরণ হতে পারে। বিশ্বায়নের যুগে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তি যত দুর্বল হচ্ছে তত এইসব প্রয়াস পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ভারতে বৈচিত্র্যকে কয়েকটি মূল দ্বন্দ্ব ভাগ করে, তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সৃষ্টির ছক কষা

হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এইরকমের বিভাজন স্বৈরতন্ত্রের আগমনের পথ তৈরী করে।

ভারতে যেখানে ১২০ কোটির বেশি মানুষের বাস, কয়েক হাজার ভাষা ও উপভাষা বিরাজ করে রয়েছে ৭০০টির বেশি ঐতীহ্যিক জনগোষ্ঠী, যাদের ইতিহাস ঐয় দশ হাজার বছরের পুরনো, সেখানে মাত্র ৫৭১টি ব্যক্তি র জিন নমুনা সংগ্রহ করে যারা নাকি ৭৩টি ভাষা ও জাতের ঐতিনিধিত্ব করছে, ডেভিড রিখ ও লালজি সিং এই ধরনের পল্লবগ্রাহী গবেষণা কি করে ঐকাশ করেন সেটাই ঐকটা রহস্য। ঐই ৭৩টি ভাষার মধ্যে ৭১টি ভারতের থেকে ও দুটি পাকি স্তান থেকে নেওয়া। তাতেই গোটা উপমহাদেশের মানবির জিনবৈচিত্র্য ঐরা নাকি ধরে ফেলেছেন।

আমেরিকান জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকসে ২০১৩ সালে সদ্য প্রকাশিত ঐদের গবেষণাপত্রে ঐরাই দাবি করেছেন যে ভারতে ১৯০০ বছর আগে, অন্তত দুহাজার বছর ধরে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ঐবাধ মেলামেশা ও বিবাহ সম্পর্ক নাকি চালু ছিল। তার পরের বছরগুলিতে যা বন্ধ হয় ঐবং জাতিভেদ চালু হবার ফলে ঐজকে জাতপাতের জিনগত ভেদাভেদ গড়ে উঠেছে, যেখানে কোন গোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক বরদাস্ত করে না। ঐটাই পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় বিবাহ নিষ্পন্ন করার যুক্তি।

ঐই গবেষকরা পাকিস্তানের পাঠানদের মধ্যে উত্তরের ৭১ শতাংশ বিশুদ্ধতা খুঁজে পান, ঐবং দক্ষিণের পানিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে যা নেমে ঐসেছে মাত্র ১৭ শতাংশে, যা নগণ্য বললেই চলে। তবে, বেশিরভাগ জাত নাকি রয়েছে ঐর মাঝামাঝি।

আসলে, ঐই গবেষকরা বেশ কিছু প্রচলিত ধারণার সপক্ষে দাঁড়িয়ে ঐইসব সংখ্যাতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যা ঐাভা মাথায় অনেকটা খেটেখুটে সাজানো, পূর্বপরিকল্পিত। অন্য অনেক জিনতাত্ত্বিক ঐই মত ব্যক্ত করেছেন।

ঐই গবেষণার ফলাফল ঐ ভাবে পেশ করা হয়েছে যেন গবেষকরা জাতিভেদ যে সাম্প্রতিক ও চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্য নয় ঐমন প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত প্রচার করছেন যাতে আসল দুরভিসন্ধি ঢাকা দেওয়া যায়। ঐকেই বলা চলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। জাত নামক ঐক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনকে ঐভাবে জীববিজ্ঞানের বৈধতা দেওয়া হচ্ছে।

জাত-নির্মাণ ও জাত নির্ণয়

আর ঐকটি-দুটি কথা বলেই ঐই আলোচনার উপসংহার টানতে চাই।

১। মৌমাছিদের, পিপড়েদের মধ্যে জাত জিনগত নির্মাণ যা তাদের সামাজিক বা যৌথ আচরণের ভিত্তি। ওদের যে অর্থে সামাজিক প্রাণী বলা হয়, মানুষ সেইভাবে সামাজিক নয়। মানুষের সামাজিকতা জিনগত নয়, তা সমাজনির্মিত। এই সোজা কথাটা এখন জিনচর্চার নামে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

২। শুধু বিভেদ জাগ্রত রাখা নয়, আজকের জিনকেন্দ্রিক আপাত উৎকেন্দ্রীকতার আরেক কারণ জিন-প্রযুক্তির প্রসার সুনিশ্চিত করা এবং সেই প্রযুক্তির বলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো।

৩। জিনপ্রযুক্তি, অভাবনীয় অদৃশ্য শক্তির উৎস হিসেবে উঠে আসছে। পারমাণবিক অস্ত্রে চেয়েও উন্নততর মারক-অস্ত্র আজ জিনপ্রযুক্তি দিয়ে তৈরী করা সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ এগিয়ে আসছে। পরমাণু অস্ত্র তামাদি হয়ে আসছে। তার চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠছে হরেক রকমের জিন-অস্ত্র, জৈব অস্ত্র।

৪। ক্ষমতা ও সম্পদের অভাবনীয় কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি জাতি, জাত এসব নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত বিশ্বায়নের যুগে ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

সুতরাং জিন ও জাতের মতাদর্শের নবজাগরণ ঘটাবার যে কোন অপকৌশলের বিষয়ে আমাদের আজ অতীতের চেয়েও আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. Unesco Documet, The Race Question, 18th July, 1950, Revised on 1951, 1967, 1978. Declarations
২. জিন : ভাবনা, দুর্ভাবনা, তুষার চক্রবর্তী(অবভাস), ২য় সংস্করণ, ২০১০
৩. জিন, বুদ্ধি, জাতি, প্রগতি, চেতনা লহর, ২০১১
৪. D Reich, et al, Reconstructing Indian Population History, Nature, Vol.461, P.489-94 (2009)
৫. P Moorjani et al, Genetic evidence for recent population mixture in India, American Jr of Human Genetics, Vol. 93, P. 1-17 (2013)

জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা, আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির ভূমিকা

গুরুপ্রসাদ কর

একথা আজ প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে ভারতীয় অঞ্চলের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা এই অঞ্চলেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশ্বের অন্য কোথাও এমন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু অপরদিকে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে অনেকে আবার ভাবেন যে এই ব্যবস্থা কেবল এই উপমহাদেশের বিশেষ ব্যবস্থাই নয়, এই ব্যবস্থাকে শ্রেণি ব্যবস্থা হিসাবেও গণ্য করা যায় না।

বিষয়টি নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে সেটা বুঝতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ডক্টর ভারত পট্টনার সংহতি-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেছেন, “জাতি-বর্ণ বিভাজন ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই উপমহাদেশের বইরে অন্য কোন উপমহাদেশে বা দেশে এই ধরনের শোষণ ব্যবস্থা দেখা যায় নি। যেহেতু জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শোষণ প্রায় ১৫০০-২০০০ বছরের প্রাচীন একটি ব্যবস্থা, তাই কেবল শ্রেণি বিভাজনই শোষণের ভিত্তি হতে পারে এরকম বিশ্বাস নাড়া খেয়ে যায়।” এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে লেখক শ্রেণি সংজ্ঞাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করেন নি। মার্কসবাদী সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রেণি বলতে বোঝায় একই সমাজের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে নিধারিত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত। যে বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে এই পার্থক্য বোঝা যেতে পারে তা হল; উৎপাদন উপকরণের সাথে তাদের সম্পর্ক, সামাজিক উৎপাদনে তাদের ভাগ ও যে পদ্ধতিতে তারা সেটা অর্জন করে। এই সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার যে কোন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণ থাকার অর্থই হল সেখানে শ্রেণি বিভাজন থাকা, এটি একটি সার্বজনীন সত্য। প্রশ্ন হল যে, এই ধরনের শ্রেণিগুলির পরিচয়ের সাথে তাদের অন্যান্য সামাজিক পরিচয়ের কোন সম্পর্ক থাকে কিনা। বিশেষত প্রাক পুঁজিবাদী অনেক সমাজেই শ্রেণিগুলির অন্যান্য সামাজিক পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে অতীতে এই ধরনের শ্রেণি বিভাজন জাতি-বর্ণ বিভাজনের সাথে খাপ খেয়ে যাবে। এটি নিশ্চয়ই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু তা কখনই শ্রেণি বিভাজনের বাইরের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয় বা অন্যভাবে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাই অন্তর্ভুক্ততে শ্রেণি ব্যবস্থা।

আমরা আগেই বলেছি যে প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণি বিভাজন অনেক জটিল আকার ধারণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই শোষণ ও শোষিতদের মধ্যে অন্যান্য সামাজিক পরিচয়ের (ধর্মীয়, জাতিসত্তাগত, রেস) ভিত্তিতেও পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে একটি অঞ্চল জুড়ে ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গড়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে এক একটি জাতি গড়ে উঠতে থাকে এবং অন্যান্য পরিচয়গুলি ক্রমাগত অর্থনীতিতে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

আমরা সবাই জানি যে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন কারণে এই ধরনের বিকাশ ঘটতে পারে নি। এখন প্রশ্ন হল যে ভারতের শ্রেণি ব্যবস্থাটি কিরকম এবং তার সাথে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সম্পর্কটি বা কিরকম। যে কোন শ্রেণি ব্যবস্থার মতোই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একগুচ্ছ গোষ্ঠী থাকে যারা হয় উদ্বৃত্ত তৈরী করে বা কেবল বেঁচে থাকার বিনিময়ে সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে শ্রমদান করে থাকে এবং এর বিপরীতে এমন কিছু গোষ্ঠী থাকে যারা মূলগতভাবে উৎপাদনে তৈরী হওয়া উদ্বৃত্ত করায়ত্ত করে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চই একটি শ্রেণি ব্যবস্থা কিন্তু এর পাশাপাশি জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা শ্রেণি ব্যবস্থার জন্য আবশ্যিক নয়।

জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় একটি স্তর হল যারা মূলতঃ শাসন পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা, জ্ঞানার্জন ও উৎপাদন পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বে থাকে। এরা হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এর বিপরীতে যে গোষ্ঠীগুলি থাকে তারা মূলতঃ কৃষিকাজ, নানা কারিগরী ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক পরিষেবা ও হস্তশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রম দেয়। এরাই হল মূলতঃ শূদ্রজাতি। জাতি-বর্ণ বিভাজনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শূদ্রদের আবার পেশার ভিত্তিতে নানারকম জাতিতে (caste) ভাগ করা হয়েছে। যেমন— জেলে, তাঁতী, কামার, কুমোর, নাপিত, গোয়ালী ইত্যাদি যাদের পেশা নির্দিষ্ট ছিল। এরও নীচে থাকে এক বিরাট জনসমষ্টি যাদের অতিশূদ্র আখ্যা দেওয়া হয়। সমাজে এদের স্থান থাকে প্রায় দাসের স্তরে, ধর্মীয় আইনে এরা কোন ধরনের সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, এদের দায়িত্ব হল গোটা গ্রামের সেবায় সবচেয়ে কষ্টকর কাজগুলি করা এবং একইসাথে অস্পৃশ্য বলে গ্রামের বাইরে থাকা।

১। প্রতিটি জাতির জন্য পেশা নির্দিষ্ট।

২। জাতির বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ।

৩। জাতি পরিচয় ঠিক হবে জন্ম দিয়ে।

তাই যে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে বোঝা দরকার তা হল যে, এই সমাজে একজন কাপড় বোনে সেই কারণে তার পরিচয় তাঁতী নয়, সে তাঁতী এই কারণে যে সে তাঁতী জাতির ঘরে জন্ম নিয়েছে এবং সেই কারণে জন্মের মধ্যে দিয়ে তার পেশাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

তবে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা সমাজের উৎপাদন শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে গতি আনতে পারে না। এই ধরনের রীতি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চল জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা দৃঢ় হবার পর এই উপমহাদেশে স্বনির্ভর গ্রামসমাজ গড়ে ওঠে যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একই অবস্থান থাকা অন্যান্য সমাজের তুলনায় একটি স্থবিরতা অর্জন করে।

তবে এমনটা ভাবা ঠিক নয় যে, এই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে কোন ধরনের গতিই ছিল না। এটা ঠিক যে এই ধরনের সমাজের সদস্যদের ব্যক্তি উদ্যোগ বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু জাতি-বর্ণগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, লড়াই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে জাতিগুলির সামাজিক অবস্থানের হেরফের ঘটায়। যেমন বাংলায় কায়স্থ ও বৈদ্যরা আগে শূদ্র বলে গণ্য হলেও একটি পর্যায়ে তারা বর্ণ বিভাজনের উঁচু স্তরে উঠে আসে। তবে এই ধরনের গতি জাতি-বর্ণের দুই মেরুতে থাকা উচ্চবর্ণ ও দলিতদের সামাজিক অবস্থানের বিশেষ কোন হেরফের ঘটায়নি, যা পরিবর্তন হয়েছে তা মূলতঃ মধ্যবর্তী জাতিগুলি তথা বৈশ্য ও শূদ্রজাতির ওপরের অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

আশা-সাম স্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা † ও জাতি-বর্ণ এখা

ভারতীয় অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় বড়সড় আঘাত লাগার আগেই এই অঞ্চল এমন একটি শক্তির আধিপত্যে আসে যারা এই অঞ্চলের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নি, শাসক হিসেবেই তারা কাজ চালিয়ে গেছে। ব্রিটিশ শাসকরা ছিল একটি উন্নত সামাজিক সম্পর্কের ফসল আর তাই তার লক্ষ্য ছিল এখান থেকে উদ্ধৃত আহরণ করে নিজের দেশের পুঁজির বিকাশ ঘটানো। তাই ব্রিটিশ শাসকদের কাজকর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে জাতি-বর্ণগত বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখা ও প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এতে ব্রিটিশের অধীনের একদিকে উচ্চবর্ণের মধ্যে নতুন ধরনের জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চবর্ণের মানুষকে যুক্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রভাবশালী উচ্চবর্ণীয় গোষ্ঠীগুলি ব্রিটিশ শাসকদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কৃষি সহ বিভিন্ন শ্রম প্রক্রিয়ায় যুক্ত নিম্নবর্ণের মানুষের উপর শোষণ ও শাসন চালানোর জন্য এরাই মধ্যবর্তী স্তরের ভূমিকা পালন করে।

২। ব্রিটিশ শাসকেরা বেশি মাত্রায় উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনের জন্য এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা পুরনো জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটায়। প্রথমতঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নজাতির মধ্যে যে কারিগর শ্রেণি গড়ে উঠেছিল ও তার উপর ভিত্তি করে যে ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে উঠেছিল এরাই বিভিন্ন সময়ে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে আঘাত করে। বৈষম্য আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল এরাই। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতের বিশেষতঃ উন্নত সূতি বস্ত্রের ব্যবসাকে কজা করে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানী করে মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটেনে যন্ত্রচালিত বৃহদাকার বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পর বাজার দখলের লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা এই কারিগর শ্রেণিকে বলপূর্বক ধ্বংস করে। এর ফলে নিম্নজাতির এই কারিগররা শহর ছেড়ে আবার কৃষিতে ফিরতে বাধ্য হয়। এতে জাতি ও পেশার মধ্যে যে কঠিন আন্তঃসম্পর্ক ছিল তা কিছু পরিমাণে দুর্বল হয়।

অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের সামনে একটি অন্য সমস্যা উপস্থিত হয়। এখন কোন ধরনের বস্ত্রসামগ্রী লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে সে তার ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন জারি রাখবে? লুণ্ঠন জারি রাখতে তারা নীল, তুলো, পাট ও আফিং ইত্যাদির মত রপ্তানীযোগ্য চাষের প্রবর্তন ঘটায়। মুদ্রায় রাজস্বমেটানোর জন্য কৃষকেরা এইসব বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে ও কিছু মাত্রায় বাজারের কেনাবেচাতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে গ্রামীণ স্তরে মহাজনশ্রেণি, ফসল ব্যবসায়ী সহ এমন কিছু শ্রেণির জন্ম হয় আগে যাদের অস্তিত্ব ছিল না। এর ফলে যেসব পরিবর্তন আসে সেগুলিও জাতি ও পেশার কঠিন আন্তঃসম্পর্ককে কিছু পরিমাণে দুর্বল করে এবং জমিদার ও প্রজা কৃষকদের মধ্যবর্তী নানা মধ্যস্থত্বভোগী স্তরের জন্মের মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতির মানুষও মধ্যবর্তী শোষকের পর্যায়ে উঠে আসে।

এই ধরনের বিকাশের ফলে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ভাঙন ধরে ও ধীরে ধীরে তা আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু একইসাথে মনে রাখা দরকার যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে কৃষির ক্ষেত্রে এমন কোন পদক্ষেপই গৃহীত হয় নি যা কৃষিকে ক্রমাগত পুঁজিবাদী সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে, উণ্টে জমিদারতন্ত্র উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত সমস্ত কৃষক সংগ্রামকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তাই ব্রিটিশ ভারতের কৃষিব্যবস্থা যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ছিল সে বিষয়ে বিশেষ কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি আইন ও পরবর্তী সবুজ বিপ্লবের ফলে যে সংস্কার সাধিত হয় তার ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন যে ভারতীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। প্রসঙ্গত আমূল ভূমি সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি আইন প্রায় কোন ভূমিকা

পালন করেনি। এতে জমিদারেরা নিম্ন জাতি-বর্ণের প্রজা, কৃষক ও ভাগচাষীদের ব্যাপক মাত্রায় উচ্ছেদ করেছে এবং বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ জমি নিজেদের অধিকারে রেখে দিয়েছে। তবে এই সময়ে উচ্চবর্ণীয় জমিদারদের অধীনস্থ নিম্নবর্ণের বিভিন্ন মধ্যস্তভোগীদের একটি অংশও কিছু পরিমাণে জমির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বিচার ব্যবস্থার সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের এই গভীর সম্পর্ক উন্মোচন করে পি.এস. আশু বলেছেন, ‘ভারতবর্ষই হল একমাত্র দেশ যেখানে ভূমি সংস্কারের আইনকে অকার্যকরী ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ করতে বিচার বিভাগই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।’

ভারতবর্ষের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার প্রতি যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে যা পরিলক্ষিত হয় তা হল:

১. এখনও পর্যন্ত ভারতে উপরের দিকের ৯.৫ শতাংশ পরিবারের হাতে মোট কৃষিজমির ৫৬.৬ শতাংশের মালিকানা রয়েছে আর বাকী ৯০.৫ শতাংশের হাতে আছে ৪৩.৪ শতাংশ জমি। এই হিসেব থেকেই বলা যায় পরিমাণ করলেও এখনও ভূস্বামীদের হাতে বড় আকারে জমি আছে।

২. জমির পরিমাণ দিয়ে দেখলে ১৯৬১-২০১০ এই সময়কালে ভূস্বামী ও বড় চাষীদের হাতে থাকা মোট জমির পরিমাণ করেছে, মধ্য চাষীর সামান্য বেড়েছে, ক্ষুদ্র কৃষকের বেশ বেড়েছে, প্রান্তিক কৃষকেরও সামান্য বেড়েছে।

৩. আর যাদের জমির পরিমাণ ২.৫ একরের নীচে সেই প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীনদের একসাথে ধরলে এদের সংখ্যা ১৯৬১ সালে গ্রামীণ জনগণের ৬৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৩ সালে ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই ভূস্বামীরা ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করে নিজেদের উদ্যোগে কিছুটা চাষ করে বটে কিন্তু সেই প্রক্রিয়া কিছুতেই একটি পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে নি কারণ যারা জমিতে খাটে তারা স্বাধীন মজুরে রূপান্তরিত হয় নি, অপরদিকে ভূস্বামীরাও বৃহৎ জোতে আধুনিক ও সংগঠিত চাষ করার বদলে ভূমিহীন কৃষকদের নিয়োগ করে মূলতঃ ছোট আকারেই চাষ করে থাকে। তাই কৃষি মূলগতভাবে অসংগঠিতই থেকে গেছে, একসঙ্গে ১০ জনের বেশি শ্রমজীবী কাজ করেন এ ধরনের জোত এদেশে প্রায় নেই (রতন খাশনবিশ-অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১২)। অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদাকারে চাষের মধ্যে দিয়ে শ্রমকে ক্রমাগত সামাজিক করে তুলেই বাজারের প্রতিযোগিতায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। আর সেটা করতে গিয়েই ঘটে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যা মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ নিয়ম। ফলে এই ধরনের বিকাশ

না ঘটাতে বোঝা যায় যে, শেষবিচারে ভারতবর্ষের ভূস্বামী চাষ পুঁজিবাদের কিছু আপাত রূপই বহন করে। তার গতিটি পুঁজিবাদের বিকাশের দিকে নয়। তাই এখানে পুঁজি নয়, কোন না কোনভাবে জমির মালিকানাই শোষণের মূল ভিত্তি হিসাবে থেকে যায়।

অপরদিকে ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক, ছোট ও মধ্য কৃষক এদের একসাথে ধরলে এরাই গ্রামীণ জনগণের ৯৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী এদের বড় অংশই পুঁজি সঞ্চয় তো দূরের কথা, কৃষি থেকে যে আয় হয় তাতে পরিবারের সারা বছরের খরচই ওঠে না। এরা এদের উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ বাজারে বিক্রি করে বটে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফসল উঠবার পর মহাজনের ঋণ ও তার সুদ মেটাতে ফসলের অতীবী বিক্রি করতে বাধ্য হয় যার সুযোগ গ্রহণ করে আবার ফসল ব্যবসায়ীরা। ফলে একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক চক্রের মধ্যে পড়ে এই কৃষকদের তৈরি উদ্বৃত্ত চলে যায় সুদখোর মহাজন, কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ী ও ফসল ব্যবসায়ীদের হাতে এবং এই উদ্বৃত্তের বেশিরভাগ অংশ আর কৃষি উৎপাদনে ফিরে আসে না, তা চলে যায় অন্যান্য অনুৎপাদক ক্ষেত্রে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে এমন কোন প্রক্রিয়া চালু নেই যার ফলে এই ধরনের কৃষকদের মধ্যে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশের সাধারণ নিয়মে মেরুকরণের মধ্যে দিয়ে একদিকে পুঁজির সঞ্চয় ও অন্যদিকে স্বাধীন শ্রমের বাজার গড়ে ওঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে পারে।

এখন এ হল ৯৬ শতাংশ গ্রামীণ এই জনগণের জাতি-বর্ণের বিচারে অবস্থান কোথায়? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তেঁতুল ও ভূমিহীন কৃষকদের ৯০ শতাংশ আসে দলিত, অন্যান্য নিম্ন জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে থেকে, খালি তাই নয়, অনেক অঞ্চলে দলিতদের আলাদা গ্রাম থাকে যেখান থেকে তেঁতুল পাওয়াটাই নিয়ম। একটি হিসাব অনুযায়ী তপসিলি জাতিগুলির মোট পরিবারের ৫৪ শতাংশ তেঁতুল, তপসিলি উপজাতিগুলির মোট পরিবারের ৪৪.১ শতাংশ তেঁতুল এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির ৩১.৩ শতাংশ তেঁতুল। প্রান্তিক, ছোট ও মধ্য কৃষকদের মধ্যেও সেইসব নিম্ন জাতিবর্ণের মানুষের আধিক্য থাকে যাদের একটি অংশকে মন্ডল কমিশনে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে বর্তমানে এটা ঠিক নয় যে যে সব পরিবারের হাতে বিরাট পরিমাণে জমি আছে তাঁরা সবাই উচ্চবর্ণের। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহাের ইত্যাদি উচ্চবর্ণের সাথে সাথে মহারাষ্ট্রে মারাঠা, অন্ধ্রপ্রদেশে কামা ও রেড্ডি, কর্ণাটকে ভোঙ্কালিঙ্গা, লিঙ্গায়ত, গুজরাটে প্যাটেল, উত্তর ভারতে জাঠ, যাদব ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের হাতেও যথেষ্ট পরিমাণে জমি ও গ্রামীণ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিশেষত আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে উচ্চবর্ণের হাতে অধিক পরিমাণে জমি কেন্দ্রীভূত হয়

নি। এছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও চিরাচরিতভাবে কেবল উচ্চবর্ণ নয়, শূদ্রজাতির কিছু অংশের হাতেও যথেষ্ট জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আবার জমির উপর কর্তৃত্বের জোরে সেই জাতিগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থানও বদলেছে, তৈরী হয়েছে কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কর্তৃত্বও। তবে মনে রাখা দরকার যে, নিম্ন জাতি-বর্ণের একটি অংশের এই কর্তৃত্ব কখনই ব্রাহ্মণ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি, কেবল ক্ষমতার কাঠামোতে নিজেদের জুড়ে নিতে চেয়েছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সময় সময় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী হয়েছে তা এই প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। মন্ডল কমিশন ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণের দাবী ও তার আংশিক রূপায়ণ-এর প্রক্রিয়ারই ফসল। তবে এক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্যবাদ খুব সহজে জমি ছাড়তে রাজী নয়। নিম্ন জাতি-বর্ণ ও আদিবাসী নেতাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আমলাতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠতা এখনও সুদৃঢ় না হওয়াতে এদের এখনও দুর্নীতি করে সি.বি.আই.-এর বিড়ম্বনায় পড়তে হয় বা জেল খাটতে হয়। অর্থাৎ দুর্নীতির নানা কলাকৌশল এরা এখনও সেভাবে রপ্ত করে উঠতে পারে নি। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদকে দুর্নীতি মামলায় জেলে গিয়েও ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের বাহক ভগবদ গীতার স্মরণ নিয়ে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে নিমজ্জিত সবচেয়ে পুরনো দল তথা কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীর ভজনা করে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তিনি এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার একজন প্রকৃত রক্ষকই বটে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে উচ্চবর্ণীয় আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন

তবে একথা মনে রাখা দরকার যে জাতি-বর্ণের মধ্যবর্তী স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটলেও দেখা যাবে যে তার দুই মেরুতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় এক মেরুতে থাকা ব্রাহ্মণ জাতির যেমন উচ্চবর্ণগত অবস্থানের পতনের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়নি তেমনি অন্য মেরুতে থাকা শূদ্র বা অতিশূদ্র তথা দলিত অংশেরও কোন উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ভাঙার প্রক্রিয়া না থাকলে এটি হওয়াও সম্ভব নয় কারণ এটি জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার অস্তিত্বের শর্ত। উঁচু বর্ণগুলি যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে মানসিক শ্রমের সাথে তথা সমাজ পরিচালনার নানা কাজের সাথে যুক্ত এবং এই ধরনের শ্রমে দৈহিক শ্রমের তুলনায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে অপেক্ষাকৃত কম। আর তাই সমাজের উঁচু বর্ণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি সাধারণ মাত্রা থাকে, বিশেষ কোন অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য থাকে না এবং এই কারণে উচ্চবর্ণের কার্যকলাপ একটি বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে নিয়ন্ত্রণ কায়ম করতে পারে। ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তন হলে তার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করে উচ্চবর্ণীয় অংশটি কারণ বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে এরা অনেক আগে থেকেই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে

এগিয়ে ছিল। ফলে এরা সারা ভারতীয় অঞ্চল জুড়ে ঔপনিবেশিক আমলে আমলাতন্ত্র সহ প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

আর এইসব কারণে ও মানসিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হওয়াতে গোটা ভারতীয় অঞ্চল জুড়ে এদের চলাচল ও উপস্থিতি বজায় থাকে যার ফলে গোটা ভারতীয় অঞ্চল জুড়ে এদের একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ব্রিটিশ পুঁজির অধীনে ও তার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখেই গোটা ভারতীয় অঞ্চলকে নিজেদের একচেটিয়া বাজার হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে বহু আঞ্চলিক জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও তাদের ভেতরকার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনা হাজির হয় তা আসলে এই উচ্চবর্ণ ও বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির মিলিত স্বার্থেরই প্রতিফলন। হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জাতীয়তাবাদ যে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে পরিচালিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ তা চেপে রাখা যায় নি, দলিত মানুষের আলাদা সংগ্রাম, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংগ্রাম ও বিভিন্ন জাতিসত্তার সংগ্রাম এই সত্যকে সামনে তুলে ধরেছে।

বিদ্বান, ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি ও জাতিভেদ এখা

অনেকে মনে করেন যে বিশ্বায়নের অর্থনীতি ভারতে একদিকে যেমন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাবে তেমনি তা জাতি-বর্ণের সাথে পেশার সম্পর্কটিকেও ভেঙে ফেলবে। এম.এন. পাণিনি ১৯৯৬ সালে লিখেছেন, “উদারীকরণের নীতি একটি পর্যায়ে অর্থনীতিতে জাতি-বর্ণের প্রভাবকে দুর্বল করবে। ...উদারীকরণ বলতে যেহেতু তথ্য ও প্রযুক্তির মুক্ত চলাচল বোঝায়, তাই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কিছু জাতি-বর্ণের মানুষের একচেটিয়া উপস্থিতি রয়েছে তা অচিরেই ধ্বংস হবে। ...”

পাণিনির এই মতকে সমর্থন করে শ্রীনিবাস ২০০৩ সালে বলেছেন, “...তথ্য আদানপ্রদানের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, দুর্বল জাতির জন্য সরকারী নীতি, মানুষের রাজনৈতিক জমায়েত এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন পরিবর্তন - এসবই জাতি ও বিভিন্ন সামাজিক পেশার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ভেঙে ফেলবে।”

এইসব বক্তব্য কতদূর সত্য তা জানবার মত কোন সর্বভারতীয় তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু এটা ঠিক যে নিম্নজাতির বেশ কিছু মানুষ তাদের পেশায় টিকতে না পেরে অন্য পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আমরা আগেই আধা-সামন্ততন্ত্রের কথা বলেছি। নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এই আধা সামন্ততন্ত্রের একটি গতি থাকে আর

তা হল আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সম্পর্ক যেমন কিছু ক্ষেত্রে ভাঙে তেমনি অন্যভাবে তার পুনরুজ্জীবন ঘটে। তাই কম্পিউটার প্রযুক্তি যেমন, আদৌ দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের মধ্যে দিয়ে নয়, বিদেশী কোম্পানী ও বিদেশী সরকারী কাজে কেবল শস্তার শ্রমের যোগান বা শস্তায় কম্পিউটার শ্রমিক সরবরাহ করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় কর্পোরেট পুঁজির মুনাফাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং উচ্চবর্ণের কাছে লোভনীয় চাকরীর সুযোগ এনে দিয়েছে তেমনি গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক শহরে এসে এদের বাড়ীতে বি-চাকর-দারোয়ানের কাজে যুক্ত হয়েছে। এটা যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের একটি রূপ থেকে অন্য একটি রূপে স্থানান্তর তা খালি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ নয়, শাসক বামপন্থীদের মাথায় একেবারেই ঢোকে না। কত না সহজেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-নিরুপম সেন রা বলেছিল যে সিঙ্গুরে টাটাদের মোটর কারখানা হওয়ার ফলে যে উন্নয়ন হবে তাতে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা ও খানকার বড়লোকদের বাড়ীতে বি-চাকর-দারোয়ানের কাজ পাবে ও তাতে কর্মসংস্থান বাড়বে।

আসলে বিশ্বায়নের পর্বে যেমন আড়াই লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে তার সাথে সাথে কৃষিকাজ করে পরিবার চালাতে না পেরে, নগরায়ণ, সেজ ইত্যাদি কারণে জমি অধিগ্রহণ হওয়াতে এক বিরাট পরিমাণ মানুষ কৃষি থেকে উৎখাত হয়েছেন। এরা অন্যের বাড়ীতে বি-চাকরের কাজ, হকারী, চায়ের দোকান, হোটেলের কাজ ইত্যাদি নানা ধরনের অসংগঠিত পরিষেবার কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। আর অন্যদিকে সরকার কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়াকে উন্নয়নের সূচক হিসাবে হাজির করে চলেছে। আবার বিশ্বায়নের সাথে সাথে একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসনের ফলে চিরাচরিত পেশার সাথে যুক্ত যেমন জেলে, তাঁতী, কুমোর, কামার ইত্যাদি জাতির বহু মানুষ নিজেদের পেশা ও সেই পেশার উপর ভিত্তি করে ছোটখাটো ব্যবসা থেকে উৎখাত হয়ে হয় বেকার আর না হলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে বাঁধা বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার নীচের স্তরে থাকা জাতিগুলির পেশার পরিবর্তন আসলে কোন অগ্রগতি সূচিত করছে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য এক ধরনের দৈহিক শ্রম থেকে আর এক ধরনের দৈহিক শ্রমে অংশগ্রহণ চলছে। যেমন উদারনীতির চাপে শান্তিপুর, ফুলিয়ার তাঁতীরা কাপড় বুনে সংসার চালাতে না পেরে কেবল সহ বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণকর্মীর কাজে অংশগ্রহণ করছেন। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ভাটা এলেই এই কাজ আর থাকবে না। ফলে এতে কোন প্রলোভনীয়করণের উপাদান নেই।

অপরদিকে উদারীকরণের ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারী সংস্থা হয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে না হলে জলের দরে তার বে-সরকারীকরণ হয়েছে। সংর ৭-খা থাকায়

সরকারী সংস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের যে অসুতপাে দৈহিক শ্রমের কিছু কাজ জুটত ও সামান্য পরিমাণে হলেও তাদের শিিত অংশের কিছুটা নিম্ন শ্রমের বৌদ্ধিক কাজ জুটত তার সুযোগও নত হয়ে গেছে। খালি তাই নয়, বর্তমানে সরকারী সংস্থাগুলিতেও বাডুদার বা জমাদারের কাজগুলিতে অত্যন্ত কম বেতনে চুক্তি এখায় লোক নিয়োগ হচ্ছে। আর সেই সমস্ত কাজগুলিতে যে নিম্নবর্ণের মানুষের আখ্যান থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সাথে সাথে শি া যেভাবে বে-সরকারীকরণ করা হচ্ছে ও ডান্ডার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির মত উচ্চ পেশাগত শি ার ে ত্রে নির্লজ্জভাবে ক্যাপিটেশন ফী চালু হয়েছে তাতে নিম্ন জাতি-বর্ণের অসুভূক্ত গরীব মানুষ তো দূরের কথা এমনকী তাদের মধ্যকার মধ্যবিত্তদেরও শি া গ্রহণ করা ায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ফলতঃ সংর ণএখা কাগজে কলমে থাকলেও যেহেতু তা সরকারী ে ত্রগুলিতেই সীমাবদ্ধ তাই নয়। অর্থনীতির াবল আধিপত্যে বা স্ৰবত তার ণু ত্ব দিন দিন কমছে। অপরদিকে বেসরকারী সংস্থায় সংর ণের কথা উঠলে ভারতের কর্পোরেট পুঁজির সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের সম্পর্ক যে কত গভীর তা পরিষ্কার হয়ে যায়। বেসরকারী সংস্থায় সংর ণের ব্যাপারে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের কয়েকটি বস্ত ব্য শোনা যাক :

দি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টি (FICCI) াইভেট সেক্টরে সংর ণের বি ক্কে সোচ্চার আওয়াজ তুলেছে এবং বাজাজ অটো-র চেয়ারম্যান রাহুল বাজাজ সেই াচারে নেতৃত্ব দিয়ে ২০০৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর টাইমস অফ ইন্ডিয়া-তে "Devoid of Merit: Reservations Will Kill Indian Private Sector" শীর্ষক একটি াবন্ধ লেখেন যাতে তিনি বলবার চে া া যে ক স্বাধীনতার সময় থেকে অনুসূচিত জাতি ও উপজাতির জন্য সংর ণ চালু থাকায় সরকারী ও জাতীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলির বেহাল দশা হয়েছে। া জাত পরিচয়ের ভিত্তিতে অনুসূচিত জাতি ও উপজাতিদের সংর ণ দিলে তা হবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলির আত্মহত্যার সামিল।

মানসিক গড়নে বিদেশী াকচেটিয়া পুঁজির াকনিষ্ঠ সেবাদাস EXL Services-এর চিফ াক্সিকিউটিভ অফিসার বিক্রম তালোয়ার বলেছেন, “াটা পাগলামি। সমস্ত শিল্পই নর্দমায় নিষ্কিণ্ড হবে। আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রি চালানোর মাধ্যমে মাল্টি বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের স্বপ্ন, াসব তুলে যেতে হবে।”

ব্রিটিশ শাসকদের নিয়ন্ত্রণে বেড়ে ওঠা ও সামন্তবাদের সাথে হাজারো বন্ধনে াবদ্ধ অসুস্থ ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি কী কখনো পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়তা করেছে? তা সে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই হোক, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রেই

হোক, জাতি-বর্ণ প্রথা ভাঙার ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নই হোক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজও এদের ভূমিকা একইরকম থেকে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে নিমজ্জিত এইসব পুঁজিপতিদের এটুকুও বোঝার ক্ষমতা নেই যে তাদের প্রভু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো মানুষদের জন্য সংরক্ষণ কেবল সরকারী ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সর্বত্র প্রসারিত। আসলে এদের বোঝার ক্ষমতা নেই বা বোঝার দরকার নেই যে সংরক্ষণের অর্থ মেধার অবনমন নয় ঐতিহাসিক কারণে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা মেধাকে সামনে আনা, যার মধ্যে দিয়ে শেষ বিচারে চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে বাজার আরো শক্তিশালী হয়, সমসত্ত্ব শ্রমের বাজার তৈরীর মাধ্যমে বাজারের প্রতিযোগিতায় মজুরীর হার ঠিক হয় যা মুনাফাকে আরোও বাড়িয়ে দেয়। দেশের পশ্চাদপদতা বজায় রেখে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির অতি মুনাফাকে নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শস্তা শ্রমের লুণ্ঠন চলে। সেই লুণ্ঠনের একটি ভাগ পেতেই যারা অভ্যস্ত সেই বৃহৎ পুঁজিপতিদের এমন জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক ভাবনা আসবে কোথা থেকে?

রাহুল বাজাজ যা বলেছেন অর্থাৎ স্বাধীনতার সময় থেকে তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ চালু থাকায় সরকারী ও জাতীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলির বেহাল দশা হয়েছে — এটা শুনে বদ্ধ পাগলেও হাসি পেয়ে যাবে। সরকারী ও জাতীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলির উচ্চ ও নীতিনির্ধারক পদগুলিতে কোন জাতি-বর্ণের মানুষ আসীন থাকে সেটা এই অস্থি-মজ্জায় ব্রাহ্মণ্যবাদী বৃহৎ পুঁজিপতিকূল ভেবে দেখবার প্রয়োজনও বোধ করে না।

দেখা যাক তথ্য কী বলে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপারভাইজারি পদে তপসিলি জাতির উপস্থিতি ২.৬ শতাংশ, আর তপসিলি উপজাতির ১.১ শতাংশ, কেরানী পদে তপসিলি জাতি ৫.৩ শতাংশ আর তপসিলি উপজাতি ১.৬ শতাংশ এবং অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে এই প্রতিনিধিত্ব যথাক্রমে ১৭.৪ শতাংশ এবং ২.৭ শতাংশ। প্রশাসনের নীতি নির্ধারক পদগুলিতে সংরক্ষণ নেই, কিন্তু নীতি নির্ধারক নয় এমন পদগুলিতেও সংরক্ষণ কার্যকরী হয় না কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির মদতে (ক) যথাযথভাবে রস্টার (তালিকা) রাখা হয় না যার ভিত্তিতে সংরক্ষিত পদ গণনা করা হয়, (খ) নিয়োগকর্তারা নানা ধরনের বে-আইনী কাজ করে, (গ) আঞ্চলিক কোটা বাঁধতে গিয়ে কারচুপি করা হয় ও (ঘ) যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। এর সাথে ইন্টারভিউ বোর্ডে চলে নানা ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী চালাকী। বছর দুয়েক আগের হিসাব অনুযায়ী তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে ৩৫ হাজার আসন খালি পড়ে আছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সরকারী নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সেগুলি পূরণ হচ্ছে

না এবং বর্তমানে এই সংখ্যাটি নিশ্চয়ই আরো কয়েক হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত শিক্ষাক্ষেত্রে খোদ দিল্লীর জওহরলাল মেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৭ বছর সংরক্ষণ প্রথা থাকা সত্ত্বেও ফ্যাকাল্টি পদে তপসিলি জাতি ও উপজাতির উপস্থিতি যথাক্রমে ৩.২৯ এবং ১.৪৪ শতাংশ।

শেষ বিচারে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির আসল কথা হল দলিত মানুষের উপর নানাভাবে আক্রমণ জারি রাখা; যাতে তারা মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, যাতে বাড়িতে চাকর বাকর পাওয়ার অভাব না হয়, যাতে কেবল জীবন ধারণের বিনিময়ে ফসল ফলানার লোকের অভাব না হয়, যাতে রাস্তা, বাঁধ, নগর তৈরীর কাজে সস্তার শ্রমের যোগানের অভাব না ঘটে, যাতে প্রয়োজনমত এদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে জল-জঙ্গল-জমি দখল করা যায়, যাতে প্রয়োজনে এদেরকেই ব্যবহার করে সংগ্রামী মানুষদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার জন্য বে-আইনী বাহিনী তৈরী করা যায়।

আজকের সময়ে শ্রেণিসংগ্রাম ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিপক্ষে সংগ্রামের সম্পর্ক

আমরা এতক্ষণ ভারতে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ও তার সাথে শ্রেণির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম। ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে আজ অবস্থা যেখানে পৌঁছেছে তাতে আজ কেবলমাত্র জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান শেষপর্যন্ত শ্রেণি সমঝোতারই জন্ম দেবে। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে যে সামন্ততন্ত্র আজও শক্তিশালীভাবে টিকে আছে সেখানে শূদ্রজাতিগুলির একটি অংশও নিজেদের শোষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর সেই কারণে তাঁরা আমূল ভূমি সংস্কারের বিরোধী হয়ে উঠেছে। অপরদিকে রাজনীতির আঙিনাতেও এই জাতিগুলির একটি অংশ এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। শ্রেণিস্বার্থের কথা এড়িয়ে গিয়ে এরাই এখন নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের ঐক্যের আওয়াজ তোলে আর নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদী দল কংগ্রেস ও বিজেপির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতা ভোগ করে।

অপরদিকে এখনও সরকারী এবং বিভিন্ন বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিচালনার পদগুলি বাদেও মূলগতভাবে মানসিক শ্রমের সাথে উচ্চবর্ণের মানুষ ও দৈহিক শ্রমের সাথে নিম্নবর্ণের মানুষের যুক্ত থাকা সমাজের কাঠামোগত বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বটে, এবং এটাও ঠিক যে এটা না ভাঙলে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা দুর্বল হবে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানসিক শ্রমের সাথে যুক্ত উচ্চবর্ণীয় মানুষগুলি শোষক। আসলে শ্রমবিভাজনের উপরিস্তরে যুক্ত হলেও উচ্চবর্ণের বেশিরভাগ মানুষই এই ব্যবস্থায় নানাভাবে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির শোষণেরই শিকার। যদিও তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে নিমজ্জিত থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম জারি রেখেই উচ্চবর্ণের এই অংশের সাথে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক লড়াই গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ প্রথা দুর্বল হবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে কী জাতি-বর্ণের কথা এড়িয়ে গিয়ে কেবল শ্রেণির প্রশ্নটি সামনে আনতে হবে যেমনটি বিভিন্ন সুবিধাবাদীরা করে থাকে। তাদের যুক্তি হল যে (ক) জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার উপস্থিতি রয়েছে কেবল উপরিকাঠামোতে, (খ) জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে শেষ বিচারে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন করা হয়। এই সুবিধাবাদীরা ব্রাহ্মণ্যবাদে এতটাই আচ্ছন্ন যে, এরা ব্রাহ্মণ্যবাদের কৌশলী সমর্থক নেহেরু ও জাতিভেদ প্রথার কটর সমর্থক গান্ধীকে উর্দু তুলে ধরে আর জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নিম্নবর্ণের নেতা আশ্বেদকর, ফুলে পেরিয়ার ইত্যাদি মানুষের কথা সম্বন্ধে এড়িয়ে চলে। তৎকালীন সময়ে উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন বাম সরকার তো বলেই দিয়েছিল যে, বাংলায় কোন অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির অস্তিত্ব নেই, তাই মন্ডল কমিশনের সুপারিশ এখানে কার্যকরী নয় যেখানে কিনা এই রাজ্যে অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির মধ্যে এমন সব জাতি রয়েছে যারা তপসিলি কোন কোন জাতির চেয়েও শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে পিছিয়ে। ভারতীয় বাস্তবতায় জাতি-বর্ণ কেবল উপরিকাঠামোর বিষয় নয়, তা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসলে ভারতে আধা সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামেরই অংশ। অপরদিকে এই সুবিধাবাদীরা শ্রেণি সংগ্রাম বলতে মজুরী বৃদ্ধি, বর্গা রেকর্ড ইত্যাদির মত কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামই বোঝে। আসলে আজকের দিনে শ্রেণিসংগ্রাম বলতে বোঝায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শোষিত শ্রেণিগুলির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চলে না, তা চালাতে হয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে এবং শেষ বিচারে এই সংগ্রামের লক্ষ্য প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও উন্নত ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন যেখানে শ্রমজীবী মানুষ এবং শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে দেশশ্রেমিক উদ্যোগপতিরাই গণতন্ত্র ভোগ করবে।

ভারতে সামাজিকভাবেই মানুষ জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে আছে, অর্থনৈতিক ভাবে একই স্তরে থাকা উচ্চবর্ণের মানুষ ও নিম্নবর্ণের মানুষ একই রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগ করে না এই সত্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়েই শ্রেণিসংগ্রাম ও তার ভিত্তিতে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ধ্বংস করার সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব। আর তার জন্য শ্রেণি ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে, কিন্তু তা গড়ে তুলতে হলে নিম্নবর্ণের মানুষের উপর, এমনকি কখনো কখনো নিম্নবর্ণের স্বচ্ছল অংশের উপরও নানা ধরনের

সামাজিক নিপীড়নের বিধ্বংস সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রামাঞ্চলে দলিত মানুষদের উপর উচ্চবর্ণীয় জমিদার-সামন্তদের সামাজিক অত্যাচারের বিধ্বংস লড়াই গড়ে তুলতে হবে। চাকরী ও শ্রম সংরক্ষণ নিম্নবর্ণের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশের দাবী হলেও তার বিধ্বংস ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আত্র মকে প্রতিহত করতে হবে এবং তার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় মদতে দলিত-আদিবাসী-ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হিন্দুবাদী শক্তির ফ্যাসিবাদী আত্র মণের বিধ্বংস সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আর সেই কাজে যেমন নিম্নবর্ণের বিভিন্ন সংগ্রামী ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে একত্রে গড়ে তুলতে হবে তেমনি উচ্চবর্ণের মধ্যে থাকা সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকেও সাথী করতে হবে। যে পরিমাণে আধা-সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষকারী বুর্জোয়াদের বিধ্বংস সংগ্রাম জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিধ্বংস সংগ্রামকে তার আয়তনহীন করবে সেই পরিমাণে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত শোষকদের জাতি-বর্ণের এটিকে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে ও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার মতো হারাবে।

তথ্যসূত্র :

১. Scripting the Change (Selected writings of Anuradha Gandhi), Daanish Books
২. Class Caste Relations, Marxist Approach, DAFODWAM
৩. Caste and Agrarian class, Anand Chakravarty, Economic and Political Weekly, April-28, 2001
৪. Reservation in private Sector : An Overview of the Proposition, People's March, Vol.-6, 2005, www.bannedthought.net.
৫. Caste, Affirmative Action and Discrimination in India, Ira N. Gang, Kunal Sen and Myeong-Su Yun.
৬. Caste Injustice in Jawaharlal Nehru University, S.Santosh, Joshil K.Abraham, Economic and Political Weekly, 26 June, 2010
৭. Characteristics of Contemporary Caste System, Dr. Bharat Patankar, <http://seekingbegumpura.wordpress.com>
৮. The Political Economy of Caste, M.N.Panini, Caste - Its Twentieth Century Avatar, Edited by Srinivas, New Delhi, Viking

৯. An Obituary on Caste as a system, M.N.Srinival, Economic and Political Weekly, 01 Feb. 2003
১০. জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও মডল কমিশন - সম্বোধ রাণা।
১১. ভারতের তপসিলি জাতি-উপজাতি সংরক্ষণের চালচিত্র- সুনীল কুমার রায়, চেতনা লহর, এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩
১২. Private Sector resists Affirmative Action, Ravikiran Shinde, <http://www.ambedkar.org>.



ভারতীয় গণতন্ত্র এক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উত্তরাধিকার : প্রসঙ্গ সংরক্ষণ

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

গণতন্ত্রের মূল শ্লোগান বা ঘোষিত লক্ষ্য হলো—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া তথা পুঁজিপতি শ্রেণির অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক অভিধা হলো শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) এবং রাজনৈতিক অভিধা হলো গণতান্ত্রিক বিপ্লব। স্পষ্টতই কারচুপিহীন আর্থ-পরিভাষা দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ ও অভ্যুত্থানকে ‘শিল্প বিপ্লব’ দ্বারা চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধা হয় না সাধারণ মানুষের। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া তথা পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে যখন বলা হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখন সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই অত সহজে তা বুঝে উঠতে পারেন না। এরও পর যখন প্রায় বৈদিক সভ্যতার জীবনচরণে অভ্যস্ত ভারতের সংখ্যাগুরু মানুষ, তখন এদেশে ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে গণমানুষের শাসনব্যবস্থা বলে চালাতে তা চিরায়ত অবনতদের মনে কোন প্রশ্নের জন্ম দেবে না, সেকথা রাষ্ট্রীয় সমাজের ক্ষমতাপ্রদর্শনের না জানার কথা নয়। কিন্তু তথাপি একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অমানবিক সামাজিক বিধানের দ্বারা প্রায় পশুসুলভ জীবনে অভ্যস্ত মানুষেরা ঘোষিতভাবে রাষ্ট্রের কাছে সমানাধিকার ভোগের দাবিদার এই গণতন্ত্রে। এ উদারতা কেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের তরফে? কেন তাঁদের উত্তরাধিকার তাঁরা ছাড়লেন বা ছাড়তে বাধ্য হলেন?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র

ইংরেজদের অধীনতা থেকে প্রতক্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের সমগ্র সময়কালে নেতৃত্বে ছিল দল হিসাবে কংগ্রেস। কী ঐতিহাসিক পরিচয় এই দলটির? না, এর জন্মদাতা আদৌ স্বাধীনতা পিয়াসী কোন ভারতীয় নন। এই দলের স্রষ্টা এবং তার প্রথম সভাপতির নাম এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২), এবং এরপর যাঁরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে থেকেছেন তাঁরা সকলেই ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত জমিদারি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রজন্মের মানুষ। অধিকন্তু, যদিও কংগ্রেসের হাত ধরেই এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, একথাও স্মরণীয় যে, কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নয়, তার প্রতিষ্ঠা করা হয় ইংরেজের অধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়

সমাজের শামিল হওয়া এদেশীয় শিক্ষিত এবং আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের তরফে দরকষাকষির মঞ্চ হিসাবে। কালক্রমে যেমন ইংরেজের আনা বুর্জোয়া শিক্ষা এদেশের জাতীয়তাবোধহীন মানুষকে [বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত] ওজাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ করে, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় গণসংগঠনের ঢঙে গড়া এই কংগ্রেস মঞ্চ একসময় ঐ জাতীয় চেতনার হাত ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। এদেশের মানুষের চেতনাকে ইংরেজ অনুগত রাখার প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত ঐ ইংরেজদের দেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেল। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে গেল সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার বহনকারী লোকজনদের উপর। বস্তুত গ্রামীণ ও নাগরিক সুবিধাভোগী শ্রেণির আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থের পক্ষেই সর্বদা কংগ্রেসর অবস্থান দেখা দেছে এবং সে অবস্থানের পক্ষে যে চেতার চর্চা কংগ্রে করেছ সেটাও ছিল সরাসরি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার দ্বারা ‘মহিমাম্বিত’। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চর্চা এই দলের সব জাতের মানুষকে শ্রমঘৃণী সংস্কৃতিতে মোহগ্রস্ত করেছে। এরই ফলস্বরূপ কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। এমনকী এই দল যে ‘একমাত্র’ ব্যক্তিকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে সেই শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি কৃষকদের আন্দোলনের সরাসরি বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে ভারতীয় পুঁজির পৃষ্ঠপোষক বানিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই অবিসম্বাদী নেতার দেশপ্রেম ছিল তাঁর হিন্দুত্ব চেতনার নিকট অপাঙ্ক্তেয়। তাঁর নিজের ভাষায় : আমি প্রথমে হিন্দু, তারপর দেশপ্রেমিক [I am Hindu first, the lover of my country]। গান্ধিজির হিন্দুত্ব যেহেতু গীতা নির্দেশিত, তাই তা অবশ্যই শ্রমঘৃণী। কারণ, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে শূদ্রই শ্রমজীবী আর শূদ্র ঘৃণা এই ধর্মে এতটাই প্রবল যে শ্রমজীবী মানুষকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাবাদীরা পশুর থেকে সামান্যই উন্নত প্রজাতির কিছু ভাবেন।

অপর ধারার স্বাধীনতা আন্দোলন দুই ভাবে বিভক্ত। স্বদেশী বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদের পথে ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। এই স্বদেশী বিপ্লবীরা কংগ্রেসের নেতৃত্বের মতই ছিলেন দেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগী অংশের মানুষ এবং সার্বিকভাবে দেশের শ্রমজীবী এবং অন্যান্য অংশের মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন। আধুনিক বামরাজনীতির ভাষায় এঁদের এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তখনকার মধ্যবিত্ত স্বপ্নবিলাসীদের আন্তরিক সমর্থন পেলেও এঁরাও ছিলেন গীতা-হাতের বিপ্লবী এবং অতঃপর তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তা কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে প্রভাবিত ছিল না। তাঁদের জনবিচ্ছিন্নতার উৎস ঐ ব্রাহ্মণ্য সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আদর্শের সরাসরি প্রভাবমুক্ত তৃতীয় যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে বিগত শতাব্দের বিশেষ দশকে, সেটা হল তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের গড়ে ওঠার কোন আর্থ-ভিত্তি ছিল না এসময়। অধিকন্তু, এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্কসবাদ হওয়ায় অর্থাৎ বস্তুবাদ হওয়া তা ছিল সরাসরি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিপ্রতীপ। ফলে এই আন্দোলন তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান হেতু রাষ্ট্রের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এবং তার সাংস্কৃতিক অবস্থান হেতু আধুনিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরূপতার মুখোমুখি হয়। যদিও এই আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে ওঠে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভাষায় শূদ্রদের সংগঠিত করে, কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃত্বও ঐ বৃটিশের চালু করা জমিদারি ব্যবস্থার থেকে আসা মানুষজনদের হাতে, যারা সার্বিকভাবে অবশ্যই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগী মানুষ।

অর্থাৎ, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন সার্বিকভাবে পরিচালিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্তরাধিকার বহন করে। কালক্রমে এদেশের পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও কংগ্রেস অদ্যাবধি সাংস্কৃতিকভাবে ব্রাহ্মণ্য সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার বহন করে। এই উত্তরাধিকারের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষভাবে তথাকথিত বামেরা না করলেও অন্য সব রাজনৈতিক দল ঘটা করে পালন করত এতদিন। এখন আবার দেখা যাচ্ছে ঘোষিত ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা সব ধর্মের লোকদের তোষণ করার জন্য অথবা ধাপ্পা দেওয়ার জন্য তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল হচ্ছে। অবশ্য যেহেতু ‘গণতন্ত্র’ নামক রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় এই ধাপ্পা দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি দায়বদ্ধ, হয়ত তাই ঘোষিতভাবে ধর্মসম্পর্কহীন রাষ্ট্রের অনুমোদিত রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থক-দরদীদের কোন বিবেকপীড়া বা চিন্তা ও মতাদর্শের সংকট নেই এসব ঘটনায়।

ভারত জাতিরাষ্ট্রে র ভাবনা-ভিত্তি

জাতিরাষ্ট্র বা ইংরেজিতে যাকে বলে Nation State, তার জন্ম ইউরোপে। ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর ছোট ছোট রাষ্ট্রের বুর্জোয়া বা পুঁজিপতিদের তরফে বৃহত্তর বাজারকে একই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আনার গোষ্ঠীস্বার্থের ফলশ্রুতিতে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম। জাতিরাষ্ট্র বলতে বোঝায় জাতিসমূহের রাষ্ট্র — ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির নেতৃত্ব বুর্জোয়া অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্প্রসারিত করতে যে সংবিধান ভিত্তিক বৃহত্তর রাষ্ট্র গড়ে তোলেন তাকে বলে জাতিরাষ্ট্র।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে এদেশে শিল্পোদ্যোগ শুরু হয় এবং এমন কারখানাভিত্তিক উৎপাদনে প্রথম ভারতীয় পুঁজি

নিয়োগ হয় ঐ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, অর্থাৎ ত্রিশের দশকে। ভারত থেকে যখন সরাসরি ব্রিটিশ শাসন বিদায় নেয় তখনও ভারতীয় পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা তার শৈশবে। অর্থাৎ, তখনো ভারতীয় বুর্জোয়াদের বাজারের কোন সংকট তেমন ছিল না। তবুও তাদের নেতৃত্ব ভারত জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা কেন ভাবলেন? আবার দেখা গেল সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার বহন করে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দর্শন ‘ধর্ম-নিরপেক্ষতা’ বা secularism কে উপেক্ষা করে সেই নেতৃত্বই ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার সিদ্ধান্তও নিলেন! কেন এমন স্ব-বিরোধী আচরণ? এটা কি অপরিণত পুঁজির অপরিণত বিকাশ থেকে উৎপন্ন অপরিণত রাজনৈতিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত? নাকি, যে জগদল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সংস্কৃতি ভারতকে ইতিহাসের প্রত্ন স্থবিরতায় বন্দী করে রেখেছিল তারই উত্তরাধিকার হেতু সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ভারতকে পুঁজিতান্ত্রিকতার অগ্রবর্তী সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ্য সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিতে আবদ্ধ করে রাখাই ছিল এমন বৃহৎ এক জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্য?

সম্ভবত এগন সব প্রশ্নের যা উত্তর হতে পারে তেমন কোন কারণ হয়ত ছিৎ না এই ভারত জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলার পশ্চাতে। বস্তুত আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যেসব আধুনিক জীবনচরণে ও জৈবিক জীবনসংগ্রামে আমরা লিপ্ত তার সম্পূর্ণটিই আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য থেকে—হ্যাঁ, অবশ্যই ইংরেজের আনা আইনের শাসন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে। ইংরেজের হাত ধরে যে রাজনৈতিক হাতেখড়ি এদেশের মধ্যবিত্তদের ঘটেছিল, সম্ভবত গান্ধি এবং তাঁর কিছু স্বজাতীয় নেতৃত্ব ব্যতিরেকে বাকিরা নেহরু অসুস্থ ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। আর তাই মনে হয়, ভারতে গণতন্ত্র যেমন এক ইউরোপীয় অনুকরণ তেমন তার জাতিরাষ্ট্র গঠনও এক অনুকরণ। বস্তুত সামাজ্যবাদের উপস্থিতি এদেশে যে কৃত্রিম বুর্জোয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলে, সেই কৃত্রিমতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার জড়ানো আছে আধুনিক ভারত সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে—সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা বিষয়ক, শিল্পকলা প্রভৃতিতে এক অন্ধ অনুকরণের মিছিল। অবশ্য ঘটনা এমন ঘটায় অন্তত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অমানুষিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে এদেশের সুবিপুল শ্রমজীবী মানুষ অস্তত কিছুটা অব্যাহতি পেয়েছেন।

বস্তুত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জনচেতনার যে বিকাশ ঘটায়, তার ঢেউ গিয়ে পড়ে যেমন নানা ব্রাহ্মণ্য নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর উপর, তেমনি তার ঢেউয়ে গড়ে উঠতে থাকে আঞ্চলিক জাতিচেতনাও। অবশ্যই এইসব চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার তাগিদে ব্রিটিশেরও কিছু ভূমিকা ছিল। নানা জাতিচেতনা আর

জাতচেতনায় বিভাজিত ভারত ভূখণ্ড নিঃসন্দেহে এক সহজ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের আদর্শ। কিন্তু স্বরণাণীত কাল থেকে ভারত ছিল ভারতীয়তা বোধহীন মানুষের পিতৃভূমি এবং এমন মানুষ এদেশে সৃষ্টি হওয়ার সাংস্কৃতিক ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যা মানুষকে কেবল বিভাজিত করে রেখেছে সংকীর্ণ জাতগোষ্ঠী-চেতনার বেড়াজালে। আর এজন্যই এদেশ কখনই বহিরাক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। ইতিহাসের এই পাঠ যেমন ছিল ইংরেজের, তেমনি ছিল তাদেরই শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে এদেশের মধ্যবিভাগত [ইংরেজ শাসক এবং কৃষক-শ্রমিকের মধ্যবর্তী সর্বস্তর] রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদেরও। তাই বলা যায় কেবল অন্ধ ইউরোপীয় অনুকরণ নয়, ভারত জাতিরাস্ত্র গড়ে তোলা ছিল এদেশের অবচীন বুর্জোয়াদের অবচীন রাজনৈতিক দার্শনিকদের এক ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা।

জাতিরাণ্ড গড়ার ভারতীয় সমস্যা

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত এক বাধ্যতামূলক জাতিরাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যেখানে নানা আঞ্চলিক জাতিসত্তার মানুষের কোন সাধারণ সমর্থন ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত শাসকদের নিকট তাই সমস্যাটাকে সাধারণ সম্মতিতে গ্রহণ করানোই ছিল লক্ষ্য। ইতিমধ্যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ সময়কালে, ভারত উপমহাদেশের নানা আঞ্চলিক নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পরস্পরের মধ্যে ভাব-সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ পেয়েছেন। এক সাধারণ ‘ভারত-জাতি’ বোধের বিকাশ ঘটাবার সাংস্কৃতিক প্রয়াস স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত নেতৃত্বে অনুমোদন পেয়েছে। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসের পাবনা সম্মেলনে সভাপতি করেছেন, যে কবির ভারতভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর ‘ভারততীর্থ’ কবিতায়। এই কবিতায় কার্যত কোন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকারই করা হয়েছে। যদিও কবিকে আমরা বাঙালির কবি, বাঙালি কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি সম্ভারে।

এভাবেই একদিকে রাজনৈতিক উদ্যোগ এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক উদ্যোগ a[ওয়ে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে জৈবিক জীবন প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে ইংরেজের আনীত শিক্ষা-সংস্কৃতিজাত পরাধীনতার গ্লানিবোধ থেকে a] ওএক ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি গড়ে তুলছে। কিন্তু তবুও একটা সমস্যা ক্রমাগতই দানা বেঁধে উঠছিল যা একান্তই ভারতীয় এবং সমস্যাটি অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তার শতশত বৎসরে অমানবিক বঞ্চনার ফসল— পশ্চাপদ শতশত পেশাভিত্তিক জাতের জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের, স্বাতন্ত্র্যের দাবির সমস্যা। হ্যাঁ, এ সমস্যাটিও ঐ ইংরেজের

আগমনের ফসল। ইংরেজের আনা গণতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থার প্রয়োগ, তার চালু করা সীমিত জনশিক্ষার সুযোগ এই চিরায়ত শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্জিত ব্রাহ্মণ্য সামাজিক নিপীড়নের শিকার মানুষগুলির ধনিক অংশের নিকটও পৌঁছে দেয়। এরই ফলে পাবনা কৃষক বিদ্রোহ ঘটে, এরই ফলে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় চিরায়ত নিপীড়ক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদেরও, যা এই চিরায়ত অমানবিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মানুষগুলির চেতনার জগতে মানবিক অধিকার বোধের সঞ্চার ঘটায়। হ্যাঁ, একথা আমরা জানি, আদৌ এসব ইংরেজের সদিচ্ছার কোন প্রতিফলন নয়, তার সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে স্বদেশীয় বিচার, আইন, প্রশাসন, শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার উপ-ফলশ্রুতি মাত্র। কিন্তু এ থেকে এটাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য সামন্ততন্ত্র অপেক্ষা বৈদেশিক পুঁজিবাদী শাসন অনেক অনেক বেশি মানবিক। স্বাধীনতার যে আন্দোলন দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের প্রতি প্রেমের বাণী বহন করছিল তাও ছিল ঐ ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে অর্জিত। কেননা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কোথায়ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোন মানবসুলভ সহমর্মিতা কখনওই ছিল না। আর তাই এই আত্মপরিচয়ের, এই স্বাত্যবোধের আন্দোলন ছিল এদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শিরঃপীড়ার কারণ। রাষ্ট্র বহির্ভূত থাকলেও এমন অভিজ্ঞতা ইসলামিক শাসনকালে তাঁদের ছিল না। বরং পশ্চাদপদ সংস্কৃতির শাসকদের ব্রাহ্মণ-নির্ভরতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে প্রায় অব্যাহত গতিতে সচল রেখেছিল। ভারতে তার থেকে উন্নততর সভ্যতা আর সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল ইংরেজ আর এজন্যই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে উন্নততর বুর্জোয়া সভ্যতার জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

এটাই হল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় শাসন চাপিয়ে দেওয়ার মৌলিক অন্তরায় এবং অতঃপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের শিরঃপীড়ার কারণ। কীভাবে চিরায়ত অবনত শ্রমজীবী তথা শূদ্রদের [বাংলায় অবশ্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের মধ্যে শাস্ত্রী শূদ্র বর্তমান, যদিও তাঁরা সাধারণভাবে শ্রমজীবী অংশের মানুষ নন; কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ‘বর্ণহিন্দু’ অভিধা পেয়ে শূদ্রত্ব মুক্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক বর্ণভুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে] এই তথাকথিত গণতন্ত্রের ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে রাখা যাবে?

সংর ৭ কার স্বার্থে

হ্যাঁ, সে উপায়ও তাঁরা পেয়ে গেলেন ঐ ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গড়ার ইতিহাসের মধ্যে। কিন্তু মনে হয় উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যটা ঠিক বিপরীত ছিল! কী ছিল এই উপায়?

আর কীই বা ছিল উভয়ের লক্ষ্য?

জাতিরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অবশ্যই তথাকথিত গণতন্ত্র, যাকে কমিউনিস্টরা বলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র। আর এমন শাসনব্যবস্থা কয়েম করতে হলে রাষ্ট্রাধীন সমাজে বা রাষ্ট্রের সমাজভিত্তিতে বৈষম্য রাখা চলে না। অর্থাৎ জনগণের কোন অংশ বা এমনকী কোন একক ব্যক্তিও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হবে না। অথচ যখন নানা জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাতি রাষ্ট্রে মিলিত হয় তখন প্রাথমিক পর্যায়ে এসব জাতিগুলির বা জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে থাকে নানা বৈষম্য। এই বৈষম্য টিকে থাকলে নানা গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। জাতিরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর যেহেতু এইসব জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, তাই পরস্পর সাপেক্ষে প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থা এবং অবস্থান বুঝে নেওয়ার সুযোগ পান। এবং কোনরূপ বৈষম্য থাকলে মত প্রকাশের স্বাধীনতার পথ ধরে সহজেই সংগঠিত প্রতিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আরো লক্ষ্য করার যে, একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে হলে, সব অঙ্গ-রাষ্ট্রের সহমতের ভিত্তিতে রচনা করার দরকার হয় সংবিধানের, সেখানে জাতিরাষ্ট্রভুক্ত মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব থাকে সুনির্দিষ্ট বিধি, থাকে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি এবং থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি পরিষদ গঠনের রীতিনীতি ও আইনি বাধ্যবাধকতা।

কিন্তু এখানেই জাতিরাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না। যদিও এমন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ঘোষিত নীতি হলো — সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। তথাপি পশ্চাদপদ জাতি বা জনগোষ্ঠীগুলিকে অন্যান্য এগিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমতায় তুলে আনতে রাষ্ট্র ঘোষিত সাম্যের মধ্যে কিছু অসাম্যের অধিকার মেনে নিতে হয়। এই অধিকার কেবল দেওয়ার হয় এসব পশ্চাদপদ জাতি বা জনগোষ্ঠীগুলিকে যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের অগ্রবর্তী জনগোষ্ঠীগুলির সমপর্যায়ে তুলে আনা যায়। এই ব্যবস্থাকেই বলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা — বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকে কিছু জনগোষ্ঠীর জন্য যে ব্যবস্থায়। এবং লক্ষ্যণীয় যে, এই ব্যবস্থা কেবল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা। ভারতে এই বিষয়টি কেমন?

ভারতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয় যথারীতি সেই ব্রিটিশ অধীনে। সম্ভবত তাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িতদের সপক্ষে টানার জন্য ১৯৩২-এ কিছু কিছু জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণ তালিকাভুক্ত করেন। কিন্তু এটা যে একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তা তো অস্বীকার করা যাবে না। এই ইনকেই সম্প্রসারিত করে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে একটি তালিকা বা schedule যুক্ত করা হয় যার অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলিকে বলা হয় Scheduled Castes বা তপশীলভুক্ত জাতি বা তপশীল জাতি এবং এই তালিকায়

জনজাতিরা হলেন তপশীলি উপজাতি বা তপশীলি জনজাতি (Scheduled Tribes)।

স্বাধীন ভারতের বয়স ৬৬ বছর অতিক্রান্ত(এখন ২০১৩ সেপ্টেম্বর)। এইসব পিছড়ে বর্গের লোকজন এখনও পিছিয়ে। এখনও রাষ্ট্রীয় সমাজে তাদের সমানুপাতিক উপস্থিতি দুনিরীক্ষ্য। এমন কেন হল? যে ইউরোপ থেকে জাতিরাষ্ট্রের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেখানে তাঁরা যখন তাঁদের জাতিরাষ্ট্র গঠনে সফল হলেন, সফল হলেন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সমাজে সামিল করতে তখন ভারতে এই ব্যর্থতা কেন? কেন এতদিনেও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীগুলিকে রাষ্ট্রীয় সমাজে সামিল করা সম্ভব হল না? তাহলে কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এখনও ‘স্বমহিমায়’ বিরাজমান? তাহলে কি গণতন্ত্রের বাগাডুম্বরের পশ্চাতে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীগুলিকে প্রতারণা কর হচ্ছে? নাকি, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা আসলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদেরই সুবিধা করে দিচ্ছে যার জন্যই তারা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে অনির্দিষ্টকাল চালু রাখতে আগ্রহী? এটা ইউরোপের বিপরীতে সুবিধাভোগীদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নয় তো? কেননা এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির যাঁরা প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁদের নেতৃত্বে ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেই সুবিধাভোগীরা বিরাজিত। তাঁদের তরফে সংরক্ষণ অনির্দিষ্টকাল বজায় রাখা কেন? মনে রাখা দরকার, যে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী এইসব রাজনৈতিক দলের লোকেরা সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বাহক এবং পাহারাদারও।

অধিকন্তু এদেশের পশ্চাদপদ সব জনগোষ্ঠীর লোকেরা নথিভুক্ত নন। এদের নেতৃত্বের ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকারের অর্থাৎ উঁচু-নীচু জাতঘণার উত্তরাধিকারের প্রতি আত্মমর্যাদাহীন আকর্ষণ বর্তমান। অথচ তাঁরাও ঐ ব্রাহ্মণ্য সুবিধাভোগীদের নিকট পশ্চাদপদ এবং ঘণ্য। তেমনি অবস্থান মুসলিমদেরও। ফলে সংরক্ষণের বাইরে কর্মসংস্থানের যে ৭৮% বর্তমান তার দ্বার কেবল ১০%-এর কম জনসংখ্যার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সুবিধাভোগীদের নিকট অব্যাহত। তাই বলা যায় সংরক্ষণ সম্ভবত এ কারণেই সময়-সীমাহীন-কালব্যাপী থেকে যাবে এবং তিন হাজার বৎসরের ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকার সাংস্কৃতিক চেতনায় বাহিত হতে থাকবে।

সংরক্ষিতদের করণীয়

যাঁরা সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন তাঁরা যে অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যপন্থী ‘ঘণিতদের’ তুলনায় তেমন কিছু অগ্রণী হতে পেরেছেন, তথ্য তা স্বীকার করে না। এখনো গ্রামীণ শ্রমজীবীদের ঘরে শিক্ষার আলো তেমন উজ্জ্বলতায় উপস্থিত নয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘণিতদের মধ্যে চাষের সঙ্গে যুক্ত লোকদের কোন কোন গোষ্ঠী সংরক্ষণের সুযোগ

নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের তপশীলভুক্ত করাকে ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতার ছোটজদের পরিচয় বলে মনে করেছেন, যদিও তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের কাছ তাঁরাও সমান ঘৃণিত। অধিকন্তু ঐ ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতার নিয়ে তাঁদেরও হাত পাততে হয় বা হাত কচলাতে হয় ঐ সংরক্ষণ সূত্র ধরে সরকারী কর্মকর্তার সামনে বসা কোন ব্যক্তির নিকট। অবশ্য যদিও হিন্দু পরিচয়ের লোকদের কোন আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না, তবুও শিক্ষিত ব্যক্তির তো জানার কথা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক আত্মপরিচয় ঐ সমাজের মানুষেরা প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে চলেছেন। এমনিতেই ব্রাহ্মণ্য ব্যতিরেকে অন্য জাতের হিন্দুর কোন ধর্মাচার করার সহাসরি অধিকার নেই। তার জন্য দরকার একজন ব্রাহ্মণ জাতের মধ্যস্থতাকারী বা দালাল। অতএব প্রশ্ন থাকে, ঐ ব্রাহ্মণদের মধ্য কি কেউ আদৌ তাঁদের ধর্মাচার মেনে চলেন দৈনন্দিন জীবনে?

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সংরক্ষণ টিকেয়ে রেখে কার্যত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র জাতিঘৃণা এবং ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বজায় রেখে ভারতকে ইতিহাস পরিত্যক্ত দেশে পরিণত করতেই বদ্ধপরিকর, ঠিখ যেমন, ইংরেজ আগমনের পূর্বে হাজার তিনেক বৎসর ধরে এদেশকে বৈদিক যুগেই আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। তাই একথা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সামাজিক ও সভ্যতার অগ্রগমনের বিরুদ্ধবাদী ধ্যানধারণা।

আজ তাই চিরায়ত শ্রমজীবী মানুষ এবং বিশেষ করে সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়া মানুষকেই এই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিতে হবে। একাজ করতে হলে সংরক্ষণের প্রদত্ত সুযোগ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বাধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ খরতে হবে এবং সংরক্ষণের অপরিহার্যতাকে ইতিহাসকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। কেননা, সংরক্ষণ আত্মবিশ্বাসের অন্তরায়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার অন্তরায়। স্থায়ী সংরক্ষণ অমানবিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের স্থায়ীত্বেরই অপর নাম। তাই অলিখিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা কায়ম করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা এদেশকে কেবল নয়, নিজেদেরও অমানবিক পশ্চাদপদ জীবনে বন্দি করে রেখেছিলেন ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত।

রাঢ়বঙ্গের আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠী

সুনীল কুমার দাস

ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে রাঁচী, সিংভূম, পালামৌ, হাজারীবাগ, ছোটনাগপুর, ধানবাদ(মানভূম), দুমকা, ভাগলপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া(মানভূম) অঞ্চলগুলিকে নিয়ে গঠিত ‘রাঢ়দেশ’ বা ‘রাঢ়ভূমি’। রাঢ়-এর নাম সর্বপ্রথম লিখিত রূপে পাই খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত আচারঙ্গসূত্র জৈন ধর্মগ্রন্থে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে।

রাঢ় অঞ্চলে কয়েককোটি বছর পূর্বে উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের নিচে কয়লাস্তর রয়েছে। বিশাল হ্রদ বা নদী ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে ওই অঞ্চলে বিশাল বনভূমি উৎপন্ন হয়। ওই বনভূমি গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের তলায় চাপা পড়ে উদ্ভিদসকল কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। ট্রিয়াসিক যুগের ল্যাব্রিনথোডোণ্ড (LABYRINTHODOND) শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও সরীসৃপের অস্তিত্ব ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা দামুলিয়া নামে কয়লাখনি রানীগঞ্জ অঞ্চলে। মাছের কাঁটা জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে আসানসোল অঞ্চলের কয়লা খনি ভূগর্ভে। উপরোক্ত জীবাশ্ম প্রাণীটি কারবোনি ফেরাস ও পারমিয়ান যুগে হ্রদ বা নদীতে বিচরণ করত।^১ পারমিয়ান ও ট্রিয়াসিক যুগের সন্ধি লগ্নে অর্থাৎ ২৫ কোটি বছর পূর্বে লিঙ্কাসরাস নামে এই প্রাণীর ফসিল রানীগঞ্জে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের এটাই সবচেয়ে প্রাচীন ফসিল। উপরোক্ত প্রাণীর বিবর্তনের ফলে এরপর আরও উন্নত জীবের উদ্ভব হয়েছিল রাঢ় অঞ্চলে, যার প্রমাণ শুশুনিয়া(বাঁকুড়া জেলা) পাহাড়ের গুহায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে। সেটি প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে একটি আদি মানব-এর চোয়াল।

প্রায় ১০-১২ কোটি বছর পূর্বে রাঢ় অঞ্চল ছিল ‘টেথিস’ নামে এক অগভীর সাগরের নিচে (ত্রিপুরা হতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল পর্যন্ত)। যে ভারতবর্ষ ছিল দক্ষিণমেরু আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এক বলয়ে যুক্ত।^২ ভূ-সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীর উত্তরভাগে লারেশিয়া নামে প্লেটটি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে উত্তর-পূর্বাভিমুখী গণ্ডোয়ানা প্লেটটির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে গণ্ডোয়ানা প্লেটটি দক্ষিণমেরু ও আফ্রিকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়। কালক্রমে উভয় অতিকায় প্লেটের চাপের ফলে টেথিস সাগরতলের ভূ-ভাগ ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠতে থাকে এবং ৭ কোটি বছর পূর্বে ক্রমাগত পার্শ্বচাপের

ফলে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়। ° হিমালয় পর্বতমালার উত্থানের ফলে গণ্ডোয়ানা ভূ-ভাগে ভূমির অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে। এ সময়ে আবহাওয়ায় শুরু হয় তুষার যুগ বা হিমবাহের যুগ। এই যুগের শেষ পর্বে পৃথিবী শীতল হয় এবং হিমালয় পর্বত হতে হিমবাহ পুষ্ট হয়ে বিপুল জলধারা নেমে আসে গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে।° এর ফলে দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী গ্লাবন এবং গ্লাবনজনিত জলধারার সঙ্গে পাথর, নুড়ি ও পলি অবক্ষেপণের ফলে গঠিত হয়েছিল রাঢ়ভূমি।°

প্রায় ৫০০ কোটি বছর পৃথিবীর বয়স। বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি হয়। এই জলের মধ্যে উদ্ভিদকুলের জন্ম। তারপর পৃথিবীতে জীবকুলের উদ্ভাবন হয়। ছোট-ছোট জীবাণু ধরনের কোষ যা খালি চোখে দেখা যায় না, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়।

সেটাই ছিল প্রাণের প্রথম প্রকাশ। এরা এই অবস্থাতেই কয়েক কোটি বছর ছিল। বহু বিবর্তনের ফলে আরও বড় জীবের উদ্ভব ঘটে— যেমন, জেলি মাছ, ও ছোট ছোট পোকা প্রজাতি। সমুদ্রই জীবনের টিকে থাকার একমাত্র জায়গা। তারপর আরও বিবর্তনের ফলে প্রথম সমুদ্রেরই দেখা দিল মেরুদণ্ডী জীব। ওই জীবকূল থেকে উদ্ভাবন হয় উভয়চর জীব। তারা জলে ও ডাঙাতে বিচরণ করতে লাগল। যেমন—সাপ, ব্যাঙ, শামুক বা শঙ্ক, কুমীর ও কচ্ছপ ইত্যাদি।

আজ থেকে প্রায় ৪০কোটি বছর আগে কিছু জীব ডাঙাতেই পুরোপুরি আধিপত্য কায়ম করেছিল। এই জীবসমূহ থেকে বিবর্তনের ফলে কোটি-কোটি প্রজাতের জীব উদ্ভব হল এই পৃথিবীতে। জীবের বহু বিবর্তনের ফলে ‘এপ’ নামক জীব অসে। ‘এপ’-এর বিবর্তনের ফলে ‘অ্যানথ্রোপয়েড’-এর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষের মত দেখতে বানর। এরাই ছিল বর্তমান মানবকুলের পূর্বপুরুষ। ‘মানুষ কোন পূর্বোদ্ভূত নিম্ন শ্রেণীর প্রজাতির বিবর্তিত উন্নততর রূপ কিনা জানতে চাইলে প্রথমেই জানতে হবে শারীরিক গঠন ও মানসিক গুণের বিচারে মানুষ তাদের থেকে কোনভাবে ভিন্ন কিনা। ... এটা শুনতে বেশ খারাপ লাগারই কথা যে, মানুষের শারীরিক গঠন ঠিক অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর আকার বা গড়নের মতই। তার কাঠামোর সমস্ত হাড়কেই বাঁদর, বাদুর বা সীল মাছের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে।° সেটা ঘটে প্রায় ২৬০ হাজার বছর পূর্বে এবং হোমোসেপিয়েন্স-এর বিকাশের ফলে তা শেষ হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে নানা পর্যায়ে নরাকার জীবের আবির্ভাব ঘটেছে আবার তাদের বিনাশও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টিকে গিয়েছে ‘ক্রোম্যানিয়ন’ জাতির মানুষ। মানুষের জীবনের এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে আজ থেকে ৪০ হাজার বছর পূর্বে। তখনই ক্রোম্যানিয়ন মানুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে

বর্তমান ককাসয়েড, মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড জাতিসমূহ।^৭ নিগ্রোয়েড বা প্রোটো অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর বর্তমান প্রতিনিধি হল — কোল, ভীল ও মুণ্ডা ইত্যাদি। মুণ্ডা গোষ্ঠীর শাখা হল—বাউড়ী জনগোষ্ঠী এবং সান্তাডী(সাঁওতাল) জনগোষ্ঠী। বাঙালীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে।^৮ আদি বাঙালী বলতে বোঝায় নিগ্রোয়েড বা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড-এর বিবর্তিত গোষ্ঠীকে এবং তেমনই আদি বাংলাদেশ বলতে বোঝায় রাঢ়দেশকে।

আমরা উপরোক্ত রাঢ়দেশ বা রাঢ়ভূমি-এর উৎপত্তি এবং সেখানকার আদিম জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবন সম্বন্ধে কিছু পর্যালোচনা করলাম। এবার রাঢ়ের ভাষা উদ্ভাবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

রাঢ় অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর ভাষা উৎপত্তি : মানুষ উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে শেখেনি। আদিম যুগে মানুষ নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে প্রথমে জোট বাঁধে বা দলবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে এই জোট বাঁধাকে সমাজ বলা হয়। একই সঙ্গে থাকা ফলে পরস্পরকে ডাকার জন্য বা মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ কথা বলতে শেখে। আদিমকালে প্রথম-প্রথম অঙ্গভঙ্গি করে বা হাত-পা নেড়ে ভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। নানা রকমের শব্দের দ্বারাই সৃষ্টি হয় মানুষের ভাষা। যে কথা বা মুখে উচ্চারিত শব্দ বা শব্দগুলো দিয়ে মানুষ নির্দিষ্ট দেশে পরস্পরের নিজের মনোভাব জানায় তার নাম ভাষা (Language)।^৯ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বাউড়ী জনগোষ্ঠীর এবং সান্তাডী (সাঁওতাল) জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি হাজারীবাগ অঞ্চল। সেখান থেকে মুণ্ডা জনগোষ্ঠী থেকে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রাঢ়ের বিভিন্ন অংশে। সেটা প্রাগৈতিহাসিক কালের ঘটনা। অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে সাঁওতাল জাতির আদি নিবাস হাজারীবাগ জেলায়। মুণ্ডারিজ জাতিগোষ্ঠীগুলির আদি বাসভূমি রাঁচি, হাজারীবাগ এবং পালামৌ জেলা তিনটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল। ... আবার রাঢ়ীয় বাউড়ী জাতির সম্বন্ধে জানা যায় যে, বাউড়ী জাতির আদি নিবাস হাজারীবাগ জেলায়। হাজারীবাগ জেলার বাহিরে বাউড়ী জাতির মানুষেরা পরবর্তীতে ছড়াইয়া পড়ে।^{১০}

আমরা এটাও জানি যে, আদি মানবগোষ্ঠী যখন আদি ভূমি থেকে অন্যদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তাদের ভাষারও পরিবর্তন হয়েছিল। ঐ একই গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মি. হেরেরা মন্তব্য করেছেন, “উপজাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জাতি বিভক্ত হওয়ার ফলেই ভাষার এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।”^{১১} আদিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন শাখায় ভাগ হয়ে যাওয়াতে তাদের গোষ্ঠীগুলির নাম হল—মুন্ডাডী,

সান্তাড়ী(সাঁওতাল), বাগড়ী(বাউড়ী), শবড়ী, কেড়া, ধাঙ্গড়। এই ভাগ হয়ে যাওয়াতে পরবর্তীকালে নিজ নিজ ভাষাগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হল। যেমন—মুণ্ডাগণ যে ভাষায় কথা বলে বা তাদের মাতৃভাষাকে মুণ্ডা ভাষা বলে; সান্তাড়ীগণ যে ভাষায় কথা বলে তাকে বা তাদের মাতৃভাষাকে সান্তাড়ী ভাষা বলে; ধাঙ্গড়গণ যে ভাষায় কথা বলে তাকে ধাঙ্গড় ভাষা বলে; কোড়াদের মাতৃভাষাকে কোড়া ভাষা বলে; শবড়ীগণ যে ভাষায় কথা বলে তাকে শবড়ী ভাষা বলে; এবং বাউড়ীগণ যে ভাষায় কথা বলে তাদের মাতৃভাষাকে বাউড়ী ভাষা বলে।^{১২} কিন্তু আমরা এই বাউড়ী ভাষাকে বাউড়ী না বলে ‘রাঢ়ভাষা’ বলব। কারণ এই রাঢ় দেশের মুণ্ডা, সান্তাড়ী, ধাঙ্গড়, কোড়া, শবড়ী ভাষাগোষ্ঠীর ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও বাউড়ী ভাষা বা রাঢ়ভাষাতে কথা বলতে পারে বা বলে, তাই তাকে রাঢ়ভাষা বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। এই ভাষাকে রাঢ় দেশের জাতীয় ভাষা বললেও কোনও ভুল হবে না।

কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বা গবেষকগণ এই রাঢ়ভাষাকে আদি বাংলা ভাষা বলেন, যা চর্যাপদে পাওয়া যায়। উপরোক্ত অংশে আমরা বাউড়ী ভাষা বা রাঢ়ভাষা নিয়ে পর্যালোচনা করলাম। এবার অসছি গোত্র ও পদবী সম্বন্ধে কিছু কথায়।

বাউড়ী জনগোষ্ঠীর গোত্র ও পদবী : আদি মানবগোষ্ঠী আদিকালে স্বজন নিয়ে দল বাঁধত। লুইস হেনরী মর্গ্যান এক-একটি দলকে জেনাস (Genus) বলেছেন। বর্তমানকালে নৃতত্ত্ববিদরা জেনাস শব্দের পরিবর্তে বলছেন ক্লান (Clan)। এক-একটি দল বা ক্লানকে চেনার জন্য তাঁরা ব্যবহার করত এক-একটি প্রতীক, যাকে গোত্র বলে। যেমন, নর্থ আমেরিকায় কালের ব্যবধানের জন্য ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলির গোত্রের সংখ্যা ও নামে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় সর্বাধিক গোত্রের সংখ্যা হল আট। এগুলি নিম্নরূপ :

সেনেকা — নেকড়ে, ভালুক, কচ্ছপ, বীবর, হরিণ, কাদাখোঁচা, বানমাছ ও বাজপাখি।

ক্যায়াগা — নেকড়ে, ভালুক, কচ্ছপ, বীবর, হরিণ, কাদাখোঁচা, বানমাছ ও গুটি।

ওনিডা — নেকড়ে, ভালুক, কচ্ছপ।

মোহক — নেকড়ে, ভালুক, কচ্ছপ।

টায়কারোরা — ধূসর নেকড়ে, ভালুক, বড় কচ্ছপ, বীবর, হলদে নেকড়ে, কাদাখোঁচা, বানমাছ, ছোট কচ্ছপ।^{১৩}

উপরোক্ত অংশটি থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ইরোকোয়া নামে বৃহৎ জনগোষ্ঠী আবার ছয়টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং প্রতিটি গোষ্ঠী কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত।

অনুরূপভাবে আমরা রাঢ়দেশেও লক্ষ্য করি যে, মুণ্ডা জনগোষ্ঠী থেকে বাউড়ী ও সান্তাড়ী জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়।

বাউড়ী জনগোষ্ঠী কয়েকটি শাখাতে বিভক্ত ছিল। যেমন—গোব্যরা বাউড়ী, ধূলা বাউড়ী, শিখ্যরা বাউড়ী, মূলা বা মল্লব বাউড়ী, মানা বাউড়ী, বোঁহটা বাউড়ী ও কাম্যারা বাউড়ী ইত্যাদি। এদের গোত্রগুলি হল—বক বা বগ, কুকুর, শালগাছ, পলাশগাছ, ঈগল, বানমাছ, সাপ, বাঘ ও কচ্ছপ (কাশ্যপ) ইত্যাদি।

বাউড়ী জনগোষ্ঠীর পদবী : ভারতের বা রাঢ়বঙ্গের মানব গোষ্ঠীর কিংবা বাউড়ী জনগোষ্ঠীর পদবী সম্বন্ধে জানতে হলে, তার আগে পদবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু তথ্যের কথা জানতে হবে। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মানুষের প্রথম পরিচয়ে দুটি শব্দের একান্ত প্রয়োজন। একটি নাম অপরটি পদবী। সুপ্রাচীনকালে কেউ পদবী ব্যবহার করতেন না। আর্যদের চতুর্বর্ণের গুণ-কর্ম অনুসারে মনু-সংহিতায় এবং বৃহদ্রশ্ম পুরাণ গ্রন্থে প্রথম পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন— “শর্মািবদ ব্রাহ্মণস্যাদ রাজো রক্ষা সমঘিতম।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম॥”

উপরোক্ত শ্লোকটি মনু-সংহিতা থেকে নেওয়া, মনুসংহিতা রচনাকাল ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ আজ থেকে ২২০০ থেকে ১৮০০ বছর পূর্বে।

“ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মনো রায়বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়।
ধনা বৈশ্যে তথা শূদ্রের দাস, শব্দঃ প্রযুক্তিতি ॥”

উপরোক্ত শ্লোকটি বৃহদ্রশ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া। বৃহদ্রশ্ম পুরাণ রচনাকাল ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ রাজা বল্লাল সেনের আমলে। দুটো শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রাহ্মণদের ‘শর্মা’ ও ‘দেবশর্মা’, ক্ষত্রিয়দের ‘রায়শর্ম্মা’ পদবী বা উপাধি, বৈশ্যের ‘ভূতি’ এবং শূদ্রের ‘দাস’ পদবীর দ্বারা বর্ণের পরিচয় হয়।

কিন্তু বৈদিক যুগে আমরা অনুরূপ কোন পদবী বা উপাধি পাই না। যেমন—রাম, দশরথ, বালি, হরিশচন্দ্র, অর্জুন, ভীম ও দুর্যোধন প্রভৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে নামের শেষে পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পদবীর উৎপত্তির আগে ‘জাতি’র উৎপত্তি হয়। বর্ণ এবং জাতি শব্দের অর্থ কিন্তু এক নয়।

ইতিহাসের হাল আমলে অর্থাৎ ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বল্লাল সেন নতুন ২৬টি

জাতি বা শ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন। “এই পুনর্গঠনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা বল্লাল সেন। বল্লাল সেন যে শুধু হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করলেন তাই নয়, ভেদ অনুযায়ী এমনভাবে নতুন ছত্রিশটা জাতি বা শ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে সমাজের বিভেদের সূচনা হয় এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে উঁচু-নীচু বোধ অনেক বেড়ে গেল। এককথায় বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হল”।^{১৪}

পদবী কিংবা উপাধি উৎপত্তি নানাভাবে নানা কারণে হয়েছে। বিস্তারিত জনতে হলে পদবী সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ পড়তে হবে।

লক্ষ্মন সেন, বল্লাল সেন রাজারা ছিলেন কণাটকের ব্রাহ্মণ। খগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের ‘পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর পদবী পাই—বাউড়ী, দাস, দেওয়ানক, পাতর, পাথর ও মাঝী বা মাজী ইত্যাদি। বাউড়ীদের আরও কিছু পদবী জানতে পারা যায়, আসানসোল মহকুমার ‘বাউড়ী জাতীয় সম্মিলনী’র প্রচারিত একটি হ্যাণ্ডবিল থেকে। হ্যাণ্ডবিলটি মিনাভর্ত্তপ্রস, আসানসোল, ১৩৫২ সাল, ১২ই ফাল্গুন (ইংরাজি ১৯৪৫, ২৪শে ফেব্রুয়ারি) ছাপা হয়েছিল। এই হ্যাণ্ডবিলে প্রাপ্ত পদবীগুলো হল—মণ্ডল, দিয়াসী, ফৌজদার, ঘাটোয়াল, ছড়িদার ইত্যাদি। এই হ্যাণ্ডবিলে বহু মানুষের নাম ও পদবী আছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, কেউ বাউড়ী পদবী ব্যবহার করেননি। আরও কিছু পদবী বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—কোটাল, সিংহ, দিগার, দলুই, রায়, থানদার, বাগদি, বাগরি, বাগড়ী, চৌকিদার, চালক, রাখা, দেশমাঝি, দেবাংশী, লায়েক, অধিকারী, খান, সরকার, বাঘরায় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি। আমি ১৯৯৮ সালে মেদিনীপুর শহরের আশ-পাশের গ্রামগুলিতে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। মেদিনীপুর শহরে বর্তমানে চারটি বাউড়ী পাড়া রয়েছে। মীর্জাপুর বাউড়ীপাড়া, আবাস বাউড়ীপাড়া, মীর্জাপুর(নরমপুর মৌজা) বাউড়ীপাড়া ও নিমতলা বাউড়ীপাড়া। মীর্জাপুর বাউড়ী পাড়ায় মানিক সিং(বাউড়ী) ও তার ছেলে সুজয় সিং-এর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে চার পাড়ায় বাউড়ীরা সিং বা সিংহ পদবী লেখেন। মেদিনীপুর শহরেই পরামানিক, পান এবং হুগলি জেলাতে জেলে পদবী লেখেন। কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে বাউড়ীরা বেরা পদবী লেখেন। ‘যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বর্তমান সমাজ সাহিত্য ও রাজনীতি’ গ্রন্থে সুকান্ত মণ্ডল মশাই, ‘চন্দ্রকোণা গ্রামের বাউড়ী পাড়ার কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাউড়ীদের কটি পদবীর উল্লেখ করেন—দাস, খাড়া, মল্লিক, দোলাই, মাল ও ঘোড়াই প্রভৃতি। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রাম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি যে, ওই গ্রামে দুটি বাউড়ী পাড়া আছে। সেখানকার সমস্ত বাউড়ীরা

সর্দার বা সরদার পদবী ব্যবহার করেন। আমাদের রাজ্যের দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্যে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর পদবী মহাপাত্র, পট্টনায়ক, নায়ক, বারি ইত্যাদি। না-জানি আরও কত নামে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক পদবী আছে। এবার সামান্য রাঢ় সভ্যতা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করব।

রাঢ়দেশের রাঢ় সভ্যতা : নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গ্যান-এর গবেষণা গ্রন্থ থেকে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা উদ্ভাবন সম্বন্ধে আমরা অবগত হই যে, তিনি মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মূল তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। মূল তিনটি ভাগের আবার এক-একটি ভাগকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন। মূল তিনটি ভাগ হল—বন্য যুগ (Savagery), বর্বর যুগ (Babarism), ও সভ্যযুগ (Civilisation)।

বন্যযুগের তিনটি উপবিভাগ : নিম্ন অবস্থা, মধ্য অবস্থা ও উচ্চ অবস্থা। তেমনই বর্বর যুগের তিনটি অবস্থা এবং তিনটি অবস্থা সভ্যযুগেরও। যদি ধরে নিই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এক লক্ষ বছর, তাহলে এর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সময় অর্থাৎ কমবেশী ষাট হাজার বছর কেটে গেছে বন্য অবস্থাতেই। বাকি সময়ের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ কুড়ি হাজার বছর বর্বর যুগের আদি(নিম্ন) পর্যায়ে। মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপ্তি পনের হাজার বছর এবং বর্তমান সভ্য যুগের বয়স কমবেশী পাঁচ হাজার বছর।^{১৬}

বর্বর যুগের পরের যুগকে মর্গ্যান বলেছেন সভ্য যুগ বা নগর বিপ্লবের যুগ। মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে এই যুগের যাত্রা শুরু হয়, মিশরের নীল নদের উপত্যকায় নীল সভ্যতা বা মিশর সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস সভ্যতা বা সুমেরু সভ্যতা এবং সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা। অর্থাৎ এই তিনটি সভ্যতা বা নগর বিপ্লবের জন্মের ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে আমরা জানতে পারছি যে, সুপ্রাচীন রাঢ় দেশেও অজয়, দামোদর, সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই নদীর উপত্যকায় এক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। সেটা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার সমসাময়িক। এই সভ্যতাকেই আমরা এখানে রাঢ় সভ্যতা নামে অভিহিত করতে পারি বা করছি।

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘বাঙলার ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সংযোজন অংশে পাই—‘নব্য প্রস্তর যুগের পর মানুষ পাথরের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ধাতুর সাহায্য নেয়। কিন্তু কখন, কোন সময় মানব ধাতুর আবিষ্কার করিয়া তাহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে এ ধারণা গ্রাহ্য যে হয়ত বিভিন্ন স্থানে ইহার প্রারম্ভ।’ এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত

হইবার সময়ে বাংলাদেশের তাম্রযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোনও তথ্য ছিল না। এই সভ্যতাকে গাঙ্গেয় সভ্যতা বলাই ভাল, যদিও এখনও পর্যন্ত অজয় দামোদর উপত্যকায় মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান মহানির্দেশক বলিয়াছেন।^{১৬}

উপরোক্ত অংশে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অজয়-দামোদর উপত্যকায় যে সভ্যতা পাওয়া গেছে তিনি তাকে গাঙ্গেয় সভ্যতা নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? কোন্ যুক্তিতে বা কোন তথ্য দ্বারা একে গাঙ্গেয় সভ্যতা বলা হবে? এই সভ্যতা গঙ্গা নদীর উপত্যকায় জন্ম বা উদ্ভাবন হয়নি। তাছাড়া এখানে বলাও হয়েছে যে, অজয়-দামোদর উপত্যকার সভ্যতা হল তাম্রযুগের সভ্যতা। তবে কী কারণে এই অজয়-দামোদর উপত্যকার সভ্যতার গাঙ্গেয়সভ্যতা নামকরণ হবে? আসলে এই সভ্যতার নামকরণ হওয়া উচিত অজয়-দামোদর সভ্যতা। কারণ অজয়-দামোদর নদের উপত্যকায় এই সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন— মিশরের নীল নদের উপত্যকায় নীল সভ্যতা বা মিশর সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস সভ্যতা বা সুমের সভ্যতা এবং সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতা বলে। আবার এই সিন্ধু সভ্যতা ব্যাপক অঞ্চলকে জুড়ে আছে বলে একে হরপ্পা ও মহেঞ্জাদড়ো সভ্যতাও বলা হয়। তেমনি অজয়-দামোদর নদের উপত্যকার সভ্যতাকে অজয়-দামোদর সভ্যতা বলা যেতে পারে, আবার এই অজয়-দামোদর সভ্যতা রাঢ়দেশ-এর ব্যাপক অঞ্চলকে জুড়ে আছে বলেই এই সভ্যতাকে রাঢ় সভ্যতাও বলা যায়। কিন্তু কোনওমতেই এই সভ্যতাকে গাঙ্গেয় সভ্যতা বলা যাবে না বা বলা উচিত হবে না। আসলে গাঙ্গেয় সভ্যতা নামকরণ মনুবাদী চিন্তা-ভাবনা।

এবার আমরা রাঢ় সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন রাঢ়দেশ-এর কোন্ কোন্ জায়গাতে আবিষ্কৃত হয়েছে তার তথ্য এখানে খুবই সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব। পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম তাম্রাশ্মী সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কার হয় বর্ধমান জেলার অজয় নদের উপত্যকায় অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবির ধ্বংসাবশেষ ১৯৬১ সালে।^{১৭} বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে রাঢ় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তুলসী-কাঁসাই ও কুমারী নদী দুটির মিলনস্থলে সামান্য পরিসরে উৎখননের জন্য তাম্রাশ্মী সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে লৌহযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক ড. সাক্ষালিয়ার পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য অনুধাবণযোগ্য।^{১৮} মেদিনীপুর অঞ্চলেও রাঢ় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত

হয়ে রাজ্যের কয়েকটি স্থানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তামার নিদর্শন। অতীতে মেদিনীপুর জেলার তামাজুড়িতে আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি সঙ্কল্প কুঠার অথবা পরশু।^{১৯}

এবার পুরুলিয়া জেলার রাঢ় সভ্যতার তথ্যের কথায় আসছি। পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত ছড়া বনাঞ্চলে বেস্ট রিলিফ উপলক্ষ্যে খননের ফলে অনাবৃত হওয়া তিনটি অতুলনীয় সঙ্কল্প কুঠার একটি দীর্ঘাকৃতি নিদর্শন। ...এইরকম সুদৃঢ় হাতিয়ার মানভূমের শৈলাঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রাচীন যুগের কৃষি-কর্মের কাজে লাগা সম্ভব।^{২০}

এবার আমরা বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে যে রাঢ় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা এখানে তুলে ধরব। বীরভূমের বোলপুরের নিকট মহিষাদলে, কোপাই নদীর তীরে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র অবস্থিত রয়েছে। ১৯৬৩ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষেত্রের অন্তর্গত পূর্ব মণ্ডলের অধীক্ষক শ্রী আর.পি. দাস। মহিষাদল-এর টিবিটি খুঁজে এবং এখানে মোটামুটি ২ মিটার গভীরে অধিবসতি স্তরে দুইটি ইতিহাস পূর্বকালীন পর্বকে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। এই দুই পর্বের দ্বিতীয়টিতে লোহার প্রচলন ছিল। যেমন প্রথম পর্ব ছিল পূর্ণভাবে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক।^{২১} উপরোক্ত রাঢ় দেশের অর্থাৎ বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া(মানভূম) অঞ্চলগুলির তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন তুলে ধরলাম কিছু গবেষণা গ্রন্থ থেকে। এই রাঢ় দেশের সভ্যতাকে আমরা রাঢ় সভ্যতা বলছি। যা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সমসাময়িক।

উপরোক্ত সমস্ত পর্যালোচনাটি পড়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জাগতে বা উঠতে পারে যে, এই রাঢ়দেশের রাঢ় সভ্যতা কাদের দ্বারা সৃষ্ট বা কোন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই সভ্যতার ধারক এবং বাহক। “হরপ্পা পূর্ববর্তী (Pre-Harappan) অথবা তাহার সমসাময়িক অপর এক অনার্য সভ্যতার স্ফূরণ ঘটিয়াছিল রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া। তাম্র-প্রস্তর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে আসিয়াছে তাহার ফলে বহুল প্রচলিত সাহেব পুরাতাত্ত্বিকদের প্রচারিত আর্য সভ্যতা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার মূলে আঘাত হানিয়াছে। তামার খনি ও তামা গলানোর প্রাচীন কিছু পদ্ধতির নজির ভূ-তাত্ত্বিকরা রাঢ় অঞ্চলে পেয়েছেন। তামার আবিষ্কার, তামা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার এবং নিষ্কাশিত তামাকে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে রাঢ়ের আদিম মানুষ, সভ্যতার এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে।^{২২}

আমরা উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে জানতে পারলাম যে, প্রাগৈতিহাসিক কালে হরপ্পা বা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সমসাময়িক রাঢ়দেশেও সভ্যতা উদ্ভাবন হয়েছিল। সেই সভ্যতার ধারক এবং বাহক রাঢ়দেশের আদিম মানবগোষ্ঠী। রাঢ়দেশের সর্বপ্রথম

আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর বাস। তারাই পাহাড়ের গুহা ছেড়ে ডাঙাতে বা রাঢ় মাটিতে বসবাস আরম্ভ করে সেই প্রস্তর যুগে। তাই জোরের সঙ্গে বলা চলে যে, রাঢ়দেশের রাঢ় সভ্যতা বাউড়ী জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত। বহু গবেষণা গ্রন্থের উদ্ধৃতি বা তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করা গেছে যে, আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা রাঢ়দেশের আদি নিবাসী বা ভূমিপুত্র। যা আমরা এই আলোচ্য বিষয়টির আরম্ভেই বলেছি। উপরোক্ত অংশটিতে রাঢ় সভ্যতা নিয়ে পর্যালোচনা করলাম। এবার পর্যালোচনা করব কবে থেকে ঐতিহাসিক বা লিখিত রূপে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানা যাচ্ছে।

বাউড়ীদের সম্বন্ধে লিখিত ইতিহাস : বাউড়ী জনগোষ্ঠীর লিখিত রূপে ইতিহাস জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ভারতবর্ষের ইতিহাস কবে থেকে বা কোন সময় থেকে আরম্ভ অর্থাৎ স্কুল-কলেজের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে কবে থেকে ইতিহাসের সময়কাল ধরা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ-এর ‘ভারতকথা’র প্রথম কিছু অংশ তুলে ধরছি। “একসময় ধারণা ছিল যে, খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের আগে ভারতবর্ষের কোনও রাজনৈতি ইতিহাস ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর গবেষণায় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর লিখিত রূপে ইতিহাস পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার প্রায় দেড়শ বছর পরেই অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের সময় আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর লিখিত রূপে ইতিহাস পাওয়া যায়। তার মানে এও হয় যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস যে সময়কালকে ধরা হয়, সেই সময় থেকেই বাউড়ী জনগোষ্ঠীর তথ্য লিখিত রূপে পাওয়া যাচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ঐতিহাসিকভাবে বা লিখিত রূপে বাউড়ী নাম একটি শহর বা বাউড়ীল্যাণ্ড এবং বাউড়ী জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জানতে পারি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে আলেকজান্ডারের সময় মেগাস্থিনিস-এর লেখা বিশ্ব বিখ্যাত ইণ্ডিকা (Indika) নামে গ্রন্থ থেকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-এর রাজসভায় সেলুকাস-এর দূত হিসাবে মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্রে বহু বছর ছিলেন। সেই সময় ইণ্ডিকা গ্রন্থটি লেখেন। সেলুকাসের প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস অনেক বছর পাটলিপুত্রে কাটিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন।^{১৩}

ইণ্ডিকা গ্রন্থের Gangarides (গঙ্গারিডি) বা গঙ্গা রাঢ় বা রাঢ়দেশের কয়েকটি আদিম আদিবাসী ও স্থানের নাম সম্বন্ধে বিবরণ লিখেছেন মেগাস্থিনিস। রাঢ় গঙ্গায় শুধুমাত্র মুণ্ডা এবং বাউড়ী জনগোষ্ঠীর নাম সনাক্ত করা গেছে। বাকি আর একটি

নাম পাওয়া যায়নি। 'Uberea' শব্দটির অর্থ বাউড়ী। মেগাস্থিনিস-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতিগুলির John W. McCrindle টিপ্পনী করেছেন— 'Uberea' শব্দটির অর্থ বাউড়ী।

মেগাস্থিনিস লেখেন — 'The Uberea with a handsome town of same name'। অর্থাৎ, বাউড়ী এবং বাউড়ী নামেই একটি সুন্দর শহরও আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে মেগাস্থিনিস-এর লেখা 'The Uberea with a handsome town of same name' তথ্যটি ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরে 'বগড়ী' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। বগড়ী গ্রামে বাউড়ীদের পদবী দুলে। গ্রামে তিনটি পাড়ায় বাউড়ীদের বাস রয়েছে। এই অঞ্চলে বাউড়ীদের কিছু পদবী রয়েছে বাগরি বা বাগড়ি। এই বাগড়ী গ্রামের পূর্বদিকে কিছুটা দূরেই বগড়ী রোড নামে একটি রেল স্টেশন ও রয়েছে।

প্রাচীনকালে একসময় এই অঞ্চলটিতে বগড়ী নামে একটি রাজ্য ছিল। বগড়ী বা বগড়ী শব্দটি বা নামটির উৎপত্তি হয়েছে বগড়ী বা বাউড়ী জনগোষ্ঠী থেকে। এটা হয়েছে তাদের বগ বা বক গোত্র থেকে। বগ বা বক গোত্রের জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যেখানে বাস করত সেখানটাকে বগ-আড়া(বগড়া) বা বগড়ী বলত। আড়া শব্দের অর্থ ঘর। বগড়া নামে একটি গ্রাম আছে, আসানসোলার নিকট।

বগ + আড়া > বগড়া > বগড়ী > বাউড়ী > বাউরী।

এইভাবে বর্তমান বাউরী বা বাউড়ী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি।

আমরা জানি যে, পুরুলিয়া প্রথমে একটি গ্রামের নাম ছিল। এই পুরুলিয়া নামকরণ দিয়েই পুরুলিয়া থানা এবং পুরুলিয়া শহর। আবার বর্তমানে পুরুলিয়া নামেই জেলা করা হয়। ঠিক এভাবেই বগড়ী নামে এক জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য ওই স্থানটির নাম হয় বগড়ী গ্রাম। এই বগড়া গ্রাম থেকেই প্রাচীনকালে একটি সুন্দর শহর হয়েছিল বগড়ী নামেই এবং পরে বগড়ী রাজ্য হয়েছিল। বগড়ী গ্রামের নিকটে পুরনো একটি ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে বগড়ী রাজার রাজবাড়ীর।

এই বগড়ী রাজ্যের নাম আমরা বাংলার সেন আমলেও পাই। “১১০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সেন রাজাদের আমলে একটি পরগণার নাম ছিল ‘বগড়ী পরগণা’।”^{১৪} শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমলেও সরকারী নথিকে ‘বগড়ী’র নাম ছিল বা আছে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলার কালেক্টরী অফিস স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এ জেলা বর্ধমানের কালেক্টরের অধীন ছিল। এ বৎসরেই বগড়ী পরগণা বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়।^{১৫}

এবার আসছি 'বাউড়ীল্যাণ্ড' শব্দটির কথায়। এই Bauriland শব্দটি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল সেই সময়ের বর্ধমান জেলার Magistrate Collector এবং নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক W.B. Oldham, 'Same Historical And Ethnical Aspect's of the Burdwan District' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, রাঢ় দেশকে Bauriland বলে উল্লেখ করেন এবং তার ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন। W.B. Oldham -এর সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি আবার J.C.K. Peterson -এর Bengal District Gezetters(Burdwan) গ্রন্থে Appendix -এ প্রকাশিত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে পাই — 'This territory would include the whole of the modern Districts of Burdwan, Hugli, Bankura and a great part of Medenapur, Birbhum, Manabhum and the Santal Parganas and Contains the whole of Present Bauri Country (Or Bauriland)'

আমরা প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর নামে লিখিত রূপে পাই খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দ থেকে ব্রিটিশ কাল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। যা আমরা আগেই তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করেছি বা করলাম।

বিশ্ববিখ্যাত চোয়াড় বিদ্রোহ -এর ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আমরা পর্যালোচনা করব এবার।

রাঢ়দেশ-এর চোয়াড় বিদ্রোহ : পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জনগণ-এর দ্বারা রাজ কিংবা জমিদারের বিদ্রোহ লড়াই বা বিদ্রোহ হল রাঢ়বঙ্গে চোয়াড় বিদ্রোহ। সুপ্রাচীন রাঢ়দেশের আদিম ভূমিপুত্ররা বিশেষ করে আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের রাঢ় মাটির জন্য লড়াই করে আসছে, খ্রীঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দ, অর্থাৎ আলেকজান্ডারের আমল থেকে। সেই লড়াই আজও চলছে রাঢ় মাটির জন্য। মোঘল আমলে বাংলার নবাব আলীবর্দি খান-এর সময় এবং ব্রিটিশ কালের আরম্ভে ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৩ বছর ধরে চোয়াড় বা চৈয়াড় বিদ্রোহ বাউড়ী বিদ্রোহ নামে রাঢ় অঞ্চলে আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা জমিদার, রাজা ও ব্রিটিশ শাসকদের বিদ্রোহ বা লড়াই করেছিলেন। সমস্ত রাঢ়দেশ প্রাচীনকালে বাউড়ী ভূমি বা বাউড়ী দেশ ছিল। বাউড়ী দেশ-এর মেদিনীপুরের বাউড়ীদের প্রাচীন জমি কর্ণগড়-এর দেওয়ান অজিত সিং দখল করে নেন। বাউড়ীদের নিজস্ব জমি আবার দখল নেওয়ার জন্য ১৭৫৩ সালে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অজিত সিং-এর মৃত্যুর পর রানী শিরোমণির বিদ্রোহ লড়াই বা বিদ্রোহ করে কর্ণগড়-এর রাজবাড়ী এবং অঞ্চলটির দখল নেন সর্দার গোববর্ধন বাউড়ী। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা

জানতে পারি "While the Bolder sporits joined the bonds chuars in this connection the collector reported to the Board on 26th May 1799. The resumption of the Paikan Lands had taken place in the year 1201 and 129\04 (F. Style) ... Ajit Singh of Karnagarh, the discendant of the Diwan, died without issue 1753 A.D. And his two wives, Rani Bhawani and Rani Siromoni, succeeded to the Midnapore Raj. At this time the Chuars were in the field, and the Leader of the Chauras, Gobordhan Sardar. Taking advantage, of the Prevailing disorder, advanced against the Ranis with a \ strong force. The ranis to save themselves from dishonour, fled from Midnapore and found Shelter with their relation, Trilochan Khan o Norjol." এই চোয়াড় বিদ্রোহ বা লড়াই ১৭৫৩ থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত হয়েছিল। উপরোক্ত গ্রন্থ টিতেই পাই "In February 1816, the Chuars Banditi Consisted of 19 leaders and about 200 accomplices." তাই বলছি, জনগণ-এর দ্বারা চোয়াড় বিদ্রোহ বা লড়াই রাজা এবং জমিদারের বিদ্রোহ হয়েছিল। ইউরোপের ফরাসী বি.ব. ১৭৮৯ সালে হয়েছিল। তার আগেই চোয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় মাটিতে।

বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যে চোয়াড় বিদ্রোহ করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক তথ্য উপরোক্ত গ্রন্থের মধ্যে পাই " The others great stratum of the population the Bauri Caste is to be found in the western portion of the district. But the Bauris thought semi-hinduised and calling themselves Hindus and not admitted to Hindu by the Hindus and not admitted to Hindu by the Hindu but are pronounced by them to be unmitigated Chuars.:²⁶

এই চোয়াড় বিদ্রোহ হল পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকার এবং জমিদারদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের জন্য বাউড়ী গোষ্ঠীর মানুষদের হাজার হাজার অমূল্য জীবন ব্রিটিশ শাসকদের বন্দুকের গুলিতে শেষ হয়েছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিকগণ এই চোয়াড় বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিস্তারিত বাউড়ী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে নি। তাই রাঢ়খণ্ড বিভিন্ন স্থানে ১৫ই জানুয়ারী তারিখটিতে চোয়াড় বিদ্রোহ দিবস রূপে পালন করে আসছে। বর্তমান জেলার আসানসোল মহকুমার বারাবণী থানার অন্তর্গত চরণপুর গ্রামে ১৫ই জানুয়ারী ২০০৭ সালে চোয়াড় বিদ্রোহ-এর স্মৃতিচারণ করার জন্য একটি ১০ ফুটের কংক্রিটের স্মৃতি স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে।

এটা সম্ভব হয়েছে বিশেষ করে চরণপুর গ্রামের বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য।

আলোচ্য বিষয়টি এখানেই শেষ করার আগে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, বাউড়ী জনগোষ্ঠীর দ্বারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাউড়ীদের উৎপত্তি নিয়ে নানা কথা শুনতে পাই। কেউ বলেন— দুর্গাদেবীর শরীরের মল বা ময়লা থেকে বাউড়ীদের উৎপত্তি। কেউ বলেন— মনসার বারি থেকে বাউড়ীদের সৃষ্টি। আবার কেউ বলেন— অমুক মুনির থেকে বাউড়ীদের উৎপত্তি। এই ভাববাদের কথাগুলি শুনতে ভালই লাগে। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া— বাউড়ীদের উৎপত্তি উপরোক্ত ভাববাদের কথা, ঐতিহাসিকগণ, বুদ্ধিজীবীগণ, বা উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা মেনে নেবেন না। ঐতিহাসিক বা মানব বিজ্ঞানীদের দ্বারা মানব গোষ্ঠীর উৎপত্তির কথা কেই মানতে হবে। আমরা সেই পথ ধরেই আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তির ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরছি।

তথ্যসূত্র :

১. বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা. ১২৮
২. Atlas of the Earth - Coxlon P 50-57
৩. Encyclopedia Britanica Vol. 8, P.883
৪. ঐ ঐ পৃষ্ঠা ৮৮৪
৫. West Bengal Chatterjee & Brothers. P.1
৬. ডিসেন্ট অফ ম্যান - চার্লস ডারউইন, পৃষ্ঠা ১-২
৭. মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা - ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ৯৮
৮. বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন - ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ৩
৯. বাংলা ভাষা রূপরীতি ও প্রয়োগ - ড. অতুল চক্রবর্তী, ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ১-২
১০. সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (৪র্থ খণ্ড), মানিকলাল সিংহ, পৃষ্ঠা ৩৯
১১. এনসিয়েন্ট সোসাইটি - লুইস হেনরী মগ্যার্ন, পৃষ্ঠা ৬১
১২. রাঢ়ভাষা উৎস সম্বন্ধে - সুনীল কুমার দাস, পৃষ্ঠা ৩১
১৪. পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস - খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পৃষ্ঠা ৬
১৫. এনসিয়েন্ট সোসাইটি - লুইস হেনরী মগ্যার্ন, পৃষ্ঠা ৩১
১৬. বাঙালীর ইতিহাস (১ম খণ্ড) - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯
১৭. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা - পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৯৩
১৮. Pre-history and proto-history of India & Pakistan (2nd Edition Poone-1974) H.D. Sunkulia, P. 2

সুনীল কুমার দাস

১৯. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা- পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১২৬
২০. ঐ ঐ ঐ পৃষ্ঠা ১২৬
২১. ঐ ঐ ঐ পৃষ্ঠা ১২১
২২. সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (৪র্থ খণ্ড) মাণিকলাল সিংহ, পৃষ্ঠা ৮৪
২৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস - রোমিলা থাপার, পৃষ্ঠা ১
২৪. Bengal district Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson, P.27
২৫. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১০
২৬. Bengal district Gazetteers (Burdwan) J.C.K. Peterson, P 25



চয়ন :- বাউডীল্যাণ্ড - চতুর্থ দুনিয়া প্রকাশন

বিবেকানন্দের বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন (১৮৮৭-৯৩)

কণিষ্ক চৌধুরী

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ আগস্ট গলায় ক্যানসার রোগের কারণে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরই ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কুৎসিত দলাদলি। রামকৃষ্ণ ক্যান্টের বৃন্তের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতা নিয়ে তীব্র সংঘাত। সে সময় রামকৃষ্ণের ভক্তশিষ্যদের মধ্য নেতৃত্ব যার হাতে ছিল তিনি হলেন রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-৯৯)। সম্পর্কে বিবেকানন্দের দাদু। যদিও উভয়ের বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র ১২ বছর। তাই নরেন তাঁকে রামদাদা বলে ডাকতো। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে আসা হয় বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জীর একটি ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু রামকৃষ্ণের এ বাড়ি পছন্দ হয়নি। তাই তিনি চলে যান বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানে সাত দিন কাটানোর পর তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শ্যামপুকুরে ভাড়া করা গোকুল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। সময়টা হল ২ অক্টোবর ১৮৮৫(বিমলাত্মানন্দ : ২০০৯: ১২)। রামকৃষ্ণের চিকিৎসার আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর গৃহী ভক্তরা। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রসায়নবিদ রামচন্দ্র দত্ত।

সেবার দিকটা দেখতেন নরেনের নেতৃত্বে রাখাল, শরৎ, শশী, লাটু, কালী, বুড়ো গোপাল, বাবুরাম, যোগীন, নিরঞ্জন। দুই দত্তের (রামচন্দ্র ও নরেন) নেতৃত্বে অস্পষ্টভাবে দুটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ১২ অক্টোবর ড. মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিয়ে আসা হয় রামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য। ড. সরকার রামকৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যদের উপর যারপরনাই বিরক্ত ছিলেন। একবার মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম)কে বলেছিলেন, “তোমরাই অবতার অবতার করে মহাপাপে মগ্ন করিয়ে ওর Simplicity (সরলতা) ঘুচিয়ে মেরে ফেললে। ওর morals খারাপ করলে” (সরকার। ২০০৭: ৩৯)।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর সাময়িকভাবে তখন যুবক ভক্তরা গৃহত্যাগ করে উদ্যান বাটীতে চলে আসেন গুরুসেবার জন্য। চিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করতে হওয়ায় রাসমনির দেওয়া মাসিক পেন্সন তিনি আর পেতেন না। এই কারণেই তিনি জমিদার বলরাম বসুকে বলেন, “চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও” [সারদানন্দ, ২০১১: ২(২): ১১৫]। একইভাবে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে তিনি কাশীপুরের উদ্যান বাটীর মাসিক

ভাড়ার ৮০ টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে উভয়েই গুরুদেবের কথা রেখেছিলেন। যদিও অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করতেন রামচন্দ্র দত্ত। এইসময় রামকৃষ্ণকে সেবা করার জন্য সেখানে ১৩/১৪ জন ভক্তের আবির্ভাব হওয়ায় রামচন্দ্র দত্ত কীভাবে সেই ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। কারণ এদের ব্যয়ভারের আর্থিক দায়িত্ব ছিল রামচন্দ্রের উপর। এ ধরনের আলোচনা রামকৃষ্ণ ও তাঁর যুবক ভক্তদের রীতিমত ক্ষুব্ধ করেছিল। ব্যক্তিত্বশালী নরেন যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এ ঘটনায় রামকৃষ্ণ এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি যুবকদের শিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসার কথা বলেন (বিমলাত্মানন্দ। ২০০৯:১৩ এবং ধর। ২০০৯:৮৪)।

এইসময় নরেন সর্বসময়ের জন্য উদ্যানবাটিতে থাকলেও তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কতটা পরিমাণে ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, প্রথমত, বি.এল. পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতির জন্য আইনের গ্রন্থগুলি কাশীপুরের বাটিতে নিয়ে আসেন, অবসর সময় সেগুলি পড়বার জন্য। দ্বিতীয়ত, জ্ঞাতীদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে যে মামলা চলছিল তা নিয়ে তিনি কেবল উদ্বিগ্নই ছিলেন না, সক্রিয়ও ছিলেন [সারদানন্দ, ২০১১: ২(২):১৯৪]। তৃতীয়ত, রামকৃষ্ণ শিষ্যদের শিক্ষা করতে যাওয়ার জন্য বললেও, নরেন সম্ভবত খুব কম সময়ই শিক্ষা করতে যেতেন। চতুর্থত, এই সেবাকার্য চলাকালীনই রামকৃষ্ণের অনুমতি ছাড়াও নরেন, কালী(অভেদানন্দ) ও তারক(শিবানন্দ) বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন (গঙ্গীরানন্দ। ২০১২:১:১৫৪)।

এই যাত্রার প্রস্তাবটা ছিল নরেন-এরই। এখানে বলা দরকার যে শুধু এরাই নয় অন্যান্য যুবক ভক্তরাও সুযোগ পেলেই এদিক ওদিকে বেরিয়ে পড়তেন। ব্যতিক্রম ছিলেন শশী ও রাখাল। রামকৃষ্ণ তো বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলেন এবং ভক্তদের বলেছিলেন, “আচ্ছা ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে, কেউ গঙ্গাসাগরে” (প্রভানন্দ। ২০১২:৬১; শ্রীম। ১৩৭৭ বাংলা:৩:২৪৫)।

এমনটা ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে রামকৃষ্ণ ভক্ত/শিষ্যদের এইরকম আচরণ লক্ষ্য করেই তাদেরকে বেঁধে ফেলবার জন্য বারোটি গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা তুলে দিয়েছিলেন তাঁর যুবা শিষ্যদের হাতে। এই ধরনের প্রতীকি ঘটনা একদিকে যুবকদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি যেমন দিয়েছিল, তেমনি তাদের সংহতিও বৃদ্ধি করেছিল।

ড. সরকারের পরামর্শমত রামকৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করা হয় গঙ্গার কাছে কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের ভাড়া করা খোলামেলা উদ্যান বাটিতে। এই উদ্যানবাটিতেই প্রথম দলাদলির আবির্ভাব এবং রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তা আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করে।

যেহেতু অধিকাংশ খরচ-খরচা রামচন্দ্র দত্ত দিতেন, তাই তাঁর কর্তৃত্বটাই ছিল বেশি শক্তিশালী। একদিন তিনি টাকাপত্রের হিসাব রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাতে নরেন যারপরনাই রেগে গিয়ে বলেন, এত হিসেব রাখার কী আছে? এখানে তো কেউ চুরি করতে আসেনি (চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর। ২০১১:২১৩)। রামচন্দ্র দত্তের সাথে এই সংঘাতের ফলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে যুবক-ভক্তগণ গৃহীদের রামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ নিষেধ করে দেন। ফলে রামচন্দ্র দত্তের রামকৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব হয়ে উঠলো। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথায় পাই— “রামবাবু একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের [রামকৃষ্ণ] কাছে যেতে চাইলেন। নিরঞ্জন ভাই তাঁকে যেতে দিল না। তখন তিনি [রামবাবু] হামার হাতে কিছু মিষ্টি আর মালা দিয়ে বললেন - ‘ওরে এগুলো ওপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে’। এমন করে বলতে শুনে হামার মনে বড় দুঃখ হলো”(চট্টোপাধ্যায়। ২০১১:২২৭)। এই বিরোধ রামকৃষ্ণের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তিনি যথেষ্ট আতঙ্কিতও হয়েছিলেন। তাই বোধহয় কাশীপুরে একদিন ঠাকুর [রামকৃষ্ণ] সকলকে ডেকে বললেন—“দ্যাখ, দলাদলি করিস নি। মিলেমিশে থাকলে সকলেই আনন্দ পাবি আর দলাদলি করলে দুঃখ-কষ্টে পড়বি” (চট্টোপাধ্যায়। ২০১১:২৩৩)। শুধু তাই নয় এইসব রামকৃষ্ণ ভক্তরা যতই সবকিছুকে ত্যাগ করার কথা বলুন না কেন, ঝগড়ার সময় তা ভুলে যেতেন এবং প্রয়োজনে মারামারিও করতেন (পূর্বোক্ত)।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে তা নিয়ে ভক্ত/শিষ্যদের মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। রামচন্দ্রের নির্দেশে সকলেই কাশীপুরের উদ্যানবাটী ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করে। রামচন্দ্র দত্ত তাঁর কাঁকুরগাছির যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণের অস্থি প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের কেন্দ্রে রাখতে চাইলেন। কিন্তু গৃহী শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন আবার রামচন্দ্রের এই নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেন নি। তাদের মধ্যে বলরাম বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র(সুরেশ), গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত হলেন প্রধান। তাঁদের ইচ্ছা ছিল এইসব যুবকরা একত্রে মিলিত হয়ে একটি সংঘ তৈরি করুক। এই সংঘ স্থাপনের ক্ষেত্রে যুবক ভক্তদের যত না উৎসাহ ছিল তার থেকেও বেশি উৎসাহ ছিল সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের। এই বেশি উৎসাহের পিছনে দুটি কারণ দেখতে পাওয়া যায়—

প্রথমত, সুরেন্দ্র কালীর একটি তৈলচিত্র জনৈক শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিটিতে উগ্রভাবে কালীকে আঁকা হয়েছিল। তাই বাড়ির লোকজন ছবিটিকে বাড়িতে রাখতে নিষেধ করে। সেই ছবিটি তিনি কাশীপুরে রামকৃষ্ণের ঘরে রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর ফলে তিনি ছবিটিকে কোথায় রাখবেন এ নিয়ে সমস্যায় পড়েন।

ফলে তিনি বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি ভাড়ার কথা ভাবতে থাকেন, যেখানে ছবিটিকে রক্ষা করার জন্য দু-তিনজন ভক্তও থাকতে পারবে (শশীভূষণ ঘোষ, বিমলাত্মানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত, ২০০৯:১৮)।

দ্বিতীয়ত, সুরেন্দ্রর কথা থেকেই বেরিয়ে আসে অপর একটি কারণ। তা হল রামকৃষ্ণ ভক্তদের মিলনের একটি স্থান চাই, সেখানে সুরেন্দ্র মানসিক শান্তির জন্য খানিকটা সময় কাটাতে পারবেন। রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে সুরেন্দ্রর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ রামচন্দ্র দত্ত বৈষ্ণব এবং সুরেন্দ্রনাথ মিত্র শাক্ত। তাছাড়া সেখানে যাওয়া মানে রামচন্দ্রের অধিনায়কত্বকে মেনে নেওয়া। অর্থবান ও সামাজিক দিকে থেকে প্রতিপত্তিশালী দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুরেন্দ্রর পক্ষে রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ তাই কখনোই সম্ভব ছিল না। আবার নিজের বাড়িতেও যে রামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে জড় হবেন সে সুযোগও ছিল না, কারণ তাঁর পরিবারে লোকজন রামকৃষ্ণকে সুনজরে দেখতো না (ধর। ২০০৯:৮৪)। এমতাবস্থায় যুবক সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করে একটি ‘জুড়াইবার’ স্থান খোঁজা তাঁর কাছে অনেক বেশি স্বস্তিকর ছিল। তাই তিনি সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে নরেনকে বলেন, “ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, পুত ভস্মাঙ্ঘি ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র রেখে পূজার্চনার ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে তোমরা কাম-কাঞ্চন ত্যাগী ভক্তেরা একসঙ্গে থাকতে পারবে, মাঝে মাঝে আমরা গিয়েও সেখানে দু’দণ্ড জুড়াতে পারব। আমি কাশীপুরে যে টাকা দিতাম সেই টাকা এখনও দেব” (বিধানানন্দ, প্রভানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত, ২০১২:৭১)।

এইসময় নরেন্দ্র সহ যুবক শিষ্যদের মধ্যে একটা ছন্দছাড়া ভাব এসে গিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের আশ্রয়স্থানে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। নরেন্দ্র বাড়ি ফিরে আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে (মেহেন্দ্র দত্ত, ২০০৭:১:২৬)। শরৎ ও শশী তাদের নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে মঠ তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বরানগরে গঙ্গার কাছে ব্যবসায়ী ভুবন দত্তের একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে স্থাপিত হল বরানগর মঠ। তারিখটি হল ১৯ অক্টোবর, ১৮৮৬।

বাড়িটির ভাড়া মাসিক ১১ টাকা। হটকো গোপাল আর ভবনাথ দুজনে মিলে বাড়িটি পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করে তুললো। মঠ প্রতিষ্ঠার পর হটকো গোপাল, তারক, বুড়ো গোপালের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু হয়। নরেন, শরৎ, শশী মাঝে মাঝে আসতো (প্রভানন্দ, ২০১২:৭২)। মঠবাসীদের মধ্য হটকো গোপালই ছিল সবচেয়ে উদ্যোগী। মঠ জমিয়ে তোলার জন্য সেই সবচেয়ে বেশি চেষ্টা শুরু

করে। লাটু মহারাজের ভাষায়, “মঠ জমাবার জন্য ছটকো গোপাল খুব চেষ্টা করতো। কলকাতার সব ভক্তদের সঙ্গে সে প্রায়ই দেখা করতো; সেই তো লোরেন ভাইকে নিয়ে আড্ডা জমালো” (চট্টোপাধ্যায়। ২০১১:২৪৭)। ছটকো গোপালই কাশীপুর উদ্যান বাটা থেকে রামকৃষ্ণের বিছানা, গদি, বস্ত্র ইত্যাদি মঠে নিয়ে আসে। নরেন্দ্রর নেতৃত্ব ছাড়া বরানগর মঠ গড়ে তোলা অসম্ভব জেনেই ছটকো গোপাল (হয়তো সুরেন্দ্রর পরামর্শ মতো) নরেন্দ্রকে বারবার মঠে আসার কথা বলতো। নরেন আসা শুরু করায় আরও অনেকে মঠে আসতে শুরু করে। যদিও নরেন তখনও বরানগর মঠ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে নি। সেটা শুরু করে ১৮৮৭-র জুন মাসের কাছাকাছি কোনো সময়ে (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:১৭৯)।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে বাবুরাম ঘোষের মা মাতঙ্গিনী দেবী এই যুবকবৃন্দকে হুগলীর আঁটপুরে তার নিজের বিশাল জমিদার বাড়িতে বড়দিনের ছুটি কাটাতে নিমন্ত্রণ করেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল নরেন, বাবুরাম ছাড়াও আরও দু-একজন যাবে। কিন্তু অন্যান্য যুবকরা জানতে পারায় তারাও সেখানে যেতে চাইলো। ফলে নরেন্দ্র, বাবুরাম ছাড়াও শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর এবং সারদা হাজির হলেন আঁটপুরে (EWD. 1997:1:195)। এখানেই তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। যদিও এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কলকাতায় নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান এবং পড়াশুনার মনোনিবেশ করেন। নরেন নিজেও পড়াশুনো ও পারিবারিক মামলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যখনই সেইসব বৈষয়িক কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন তখনই তিনি অন্যদের বাড়ি গিয়ে আঁটপুরে সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। নরেনের এই উদ্যোগের ফলেই আবার সবাই বরানগর মঠে জড়ো হতে শুরু করে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নরেন সহ অন্যান্য যুবকেরা বিরজাহোমের মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নরেন চেয়েছিলেন গুরুর নাম অনুযায়ী তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম হোক রামকৃষ্ণানন্দ। কিন্তু শশী যেহেতু ঐ নামটি গ্রহণ করেছে, তাই নামটির প্রতি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দকে তা মেনে নিতে হয়। আর একান্ত বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হয় অন্য একটি নাম - বিবিদ্যানন্দ (EWD. 1997:1:199)। এ ঘটনা হয়তো ভবিষ্যৎ সংঘাতের সূত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। কিংবা বিবেকানন্দের নেতৃত্ব অস্বীকার করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টাও বলা যেতে পারে। সংঘাতের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বরানগর মঠে ঠাকুর ঘর স্থাপনকে কেন্দ্র করে। মহেন্দ্র দত্তের লেখা থেকে পাই, “সুরেশচন্দ্র মিত্তিরের (সুরেন্দ্রনাথ) ঠাকুরঘর করিতে আপত্তি ছিল। তিনি ইহাকে দোকানদারি বলিয়া

মনে করিতেন। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, ‘শ্যালারা করবি কি; যেমন শীতলাঠাকুর বসায়, তেমন ঠাকুরের ছবি রেখে ঘণ্টা বাজাবি আর পূজারীগিরি করবি? তার চেয়ে ঠাকুর ঘর না করাই ভাল’” (দত্ত। ২০০৭:১২৮)।

যে সকল যুবকরা সন্ধ্যাস গ্রহণ করে বরানগর মঠে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন তাঁরা হলেন—

বুড়ো গোপাল - অদ্বৈতানন্দ

୧୦୨ ✍ ଡ଼େନାଥ

জড়িয়ে পড়েছিলেন (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:১৮৩)। তাদের আচার-আচরণ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও উন্মত্তাপূর্ণ। দু-একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে —

১. নরেন, নিরঞ্জন ও শশী বরানগর মঠে বেশ কয়েক মাস (১৮৮৭, মে-জুন) উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন এবং বাইরের লোকের সামনে এইভাবে বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকতে লজ্জিত হতেন না। এর কারণ বস্ত্রের অভাব নয়, বরং সাধনার ভাবই নাকি ছিল এর প্রধান কারণ (দত্ত, ম., ২০০৭:১:৪৯)।

২. স্নান করা ও প্রাকৃতিক কর্মের সময়ও এই যুবকরা উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। এনাদের তামাক না খেলে প্রকৃতির ডাকের বেগ আসতো না। তাই সেসব সরঞ্জাম তাঁরা শৌচস্থানেই রাখতেন এবং উলঙ্গ অবস্থায় ধূমপান করতেন যতক্ষণ না তাদের বেগ আসছে (পূর্বোক্ত : ৩০)। এই ধরনের কু-অভ্যাস ও অস্বাভাবিক আচরণ কোন ধরনের আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন?

৩. ১৮৮৭-র কোন একটা সময়ে বলরাম বসুর বাড়িতেও নরেনের অস্বাভাবিক আচরণ মহেন্দ্র দত্তের নজরে পড়ে যায়। মহেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “নরেন্দ্রনাথ তখন একটি ঘরে একাই বসিয়া রহিয়াছেন, কখনও বা ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া কাহাকে যেন কিছু বলিতেছেন, কখনও বা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া সতেজে কোন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা নিজের বিজয় হইল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্বস্ত হইল এইরূপ ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কখনও বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কী বকিতেন কিছু বুঝা যাইত না” (পূর্বোক্ত: ৬৭)।

৪. এই ধরনের একলা মনে বক্ বক্ করা কাল্পনিক ব্যক্তির সাথে কথা বলা, হ্যালুসিনেশন (ভুল দেখা) প্রভৃতি নরেনের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। রামকৃষ্ণের বেঁচে থাকা কালেই। শরৎ মহারাজের অভিজ্ঞতায় নরেন শুধু অস্বাভাবিক আচরণ করতো না, ভূত-প্রেতও দেখতে পেতো। একবার জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ‘তবে রে শালা’ বলে একটি প্রেতকে তাড়া করেছিলেন (পূর্বোক্ত: ৭১)।

৫. মহেন্দ্র দত্ত আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৭-র কোন একটা সময় মহেন্দ্র দত্ত বরানগরে গিয়ে দেখেন নরেন্দ্র বাড়ির দালানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করছেন। তাঁর চক্ষু স্থির, উর্ধ্ব দৃষ্টি এবং যেন হুঁশ নেই (পূর্বোক্ত: ৫১)।

৬. সেই সব যুবকবৃন্দ ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত ছিলেন যে,

তারা যখন তখন কাঁদতেন, হাসতেন, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, বেদান্তের আলোচনা করতেন। বিভিন্ন দেবদেবীর নামে তাদের চোখে জল চলে আসতো আবার একই সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতেন। বিভিন্ন কু-অভ্যাসে (যেমন, তামাক খাওয়া, আফিম খাওয়া) অভ্যস্ত হতেন, নিজেদের মধ্যে ছোটবড় ঘটনা নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হতেন, একে অপরের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। নরেন ছিলেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ। মহেন্দ্র দত্তর স্মৃতিকথায় পাই, “বরানগর মঠে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া যোগেন মহারাজ বৃন্দাবনে গ্রহণ করিলেন। তথায় বলরাম বাবুর কুঞ্জ(কালাবাবুর কুঞ্জ) কয়েক মাস থাকিয়া মঠে পুনরাগমনের পর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, ‘যোগে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এল; আনলে কতকগুলো তুলসীর মালা, একটা মালায় বুলি আর তেলকমাটি। সকলের খাওয়া হলে প্রায় বারটা নাগাদ নরেন বললে, ‘ওরে যোগে, শ্যালা ত বৃন্দাবনে গেছিল, দে শ্যালা আমাকে বৈরাগী সাজিয়ে দে’। সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথকে কপালে তেলক, গলায় কণ্ঠি, হাতে বুলি, আর তা থেকে জপ করবার জন্য আঙুল বার করে দিয়ে এক সং সাজিয়ে দিলে। নরেন্দ্রনাথ প্রথম খানিকক্ষণ ব্যঙ্গ করে যেন কতই মালা জপ করছে—আওয়াজ করে বলতে লাগল, ‘আ-ধা-কে-ভো-আ-ধা-কে-ভো-আ-ধা-কে-ভো’, তারপর একটা গান ধরলে, ‘নিতাই নাম এনেচে রে’। নাম কথাটা না বলে অপর একটা কথা বলে যোগেন মহারাজকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। এই রকম কৌতুক, ব্যঙ্গ হাসি চলছিল। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহ গর্জনে বলতে লাগল, ‘বোল হরি বোল, হরি হরি বোল-। ...অবিরাম হুঙ্কার ধ্বনি, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু নৃত্য-কীর্তন বন্ধ নাই” (দত্ত, ম. ২০০৭:১:৩৮)।

নরেন্দ্র যতই সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিবিদ্যানন্দ হয়ে বরানগর মঠে গিয়ে বাস করুন না কেন, পাক্ষা উত্তর কলকাতার সংগীত প্রিয়, আমুদে, খেপাটে, মাত্রা বোধহীন, প্রতিভাবান, উদ্ধত, তামুক প্রিয় নরেন কিন্তু সন্ন্যাসী নরেন-এর মধ্যে থেকে কখনই বিদায় নেয় নি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ, সুযোগ পেলেই অন্যকে ছোট করতেন, কারণে-অকারণে শ্লেষাত্মক কথা বলতেন আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে চূর্ণ করতে ভালোবাসতেন। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হল—

১. গিরিশ ঘোষের বাড়িতে জনৈক মুন্সেফকে তিনি যারপরনাই অপদঙ্গ করেছিলেন। মুন্সেফটি বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলে অভিহিত করায় নরেন্দ্র তাঁকে অপমানসূচক কথা বলতে থাকেন। মুন্সেফটিও তাঁকে অসম্মান করে বলে, কি হে

কী কর। কাজকর্ম করনা কেন? কেবল গিরিশের অন্ন ধ্বংস করতে এসেছ? দত্ত, ম. ২০০৭:১৬৫। এখানে ল'র করার বিষয় হল মুন্সেফটি সঠিক ভাবেই বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলেছিলেন। কারণ বুদ্ধদেব বেদকে এমাণ বা সঠিক জ্ঞান বলে মনে করতেন না। যারা বেদকে সঠিক জ্ঞান বলে মনে করেন তাদের বলা হত আশ্রিত আর যারা তা মনে করতেন না তাদের বলা হত নাস্তিক। মুন্সেফটি বলেন যে, তিনিএকটি বইতে পড়েছেন, বুদ্ধদেব কোন ভগবান মানতেন না। সে যে ত্রে তিনি মুন্সেফ সঠিক কথাই বলেছিলেন। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম হল ভগবান ছাড়া ধর্ম। নরেন্দ্র নিশ্চয়ই এসব জানতেন। তৎসত্ত্বেও তিনি মুন্সেফটিকে কেন অকারণে অপদম্ করলেন তা বোঝা খুবই কঠিন।

২. নরেন্দ্র ছিল শাক্ত ভাবাপন্ন। তাই তিনি পাঁঠা বলি এমন কী মানুষ বলি-তেও বিশ্বাস করতেন (দত্ত, ম. ২০০৭:১:৭৭)। বাবুরাম ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। তাই তাঁকে ‘রাধারানী’ বলে বিদ্রূপ করা হত। তাঁর একটু ভাবাবেশ হলেই কাঁদিয়া ফেলিতেন। এই কারণে নরেন্দ্র তাঁকে ভেঁপু বলে ব্যঙ্গ করতেন (পূর্বোক্ত:৭০-৭১)। বৈষ্ণবদের সম্পর্কে নরেন্দ্রের ছিল অবজ্ঞার ভাব। কীর্তন ছিল তার কাছে মেয়ে মানুষি বাজনা। তাঁর মতে, ‘কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল’ (বিবেকানন্দ। ২০১২:৯:১৩১)। রাখাল মহারাজ পুরীতে জগন্নাথের মন্দির ভ্রমণ করে আসার পর নরেন্দ্র তাঁকে বিভিন্ন ভাবে ব্যঙ্গ করতে থাকে (দত্ত, ম. ২০০৭:১:৭০)। বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করার জন্য নরেন্দ্র বলরাম বসুকেও বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি (পূর্বোক্ত:৮০)।

৩. মানিকতলা থেকে দুই রামকৃষ্ণ ভক্ত একতারা নিয়ে ভজন গাইতে আসতেন। নরেন্দ্র তাঁদের নিয়ে যথেষ্ট ঠাট্টা-তামাশা করতেন। তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল নেড়ে-উড়ে(পূর্বোক্ত:৮৮)।

৪. প্রতাপ চন্দ্র হাজারা নামক জনৈকি ব্যক্তি রামকৃষ্ণের কাছে আসতেন। নরেন্দ্র তাকে নিয়ে খুবই ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেন। তিনি প্রতাপচন্দ্রকে ডাকতেন থাউসেণ্ড (Thousand-আ)। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি’র লেখক অক্ষয়কুমার সেনকে নরেন্দ্র ‘শাঁকচুন্নি মাস্টার’ বলতেন (পূর্বোক্ত:১০৪-১০৫)।

৫. গিরিশ ঘোষকে নরেন্দ্র বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হত, নিঃসন্দেহে তা সীমা অতিক্রম করে যেত। কোন একটি প্রসঙ্গে— গিরিশ ঘোষ নরেন্দ্রকে বলেন, “থাম শালা, সন্ন্যাসী ভিখারী”(দত্ত, ম। ২০০৭:১:৬৫৮২)। গিরিশ ঘোষের পক্ষে এ ধরনের বাক্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ যখন প্রত্যুত্তরে বলেন, “যা শ্যালা ভাঁড়, তুই শ্যালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শ্যালা কী brain আছে?” (পূর্বোক্ত)— তা শুনে বিস্মিত হতে হয়।

৬. নরেন্দ্রর কথাবার্তা অনেক সময় অস্বস্তিকর হয়ে উঠতো। কখনো কখনো সৌজন্যের সীমাও অতিক্রম করত। শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৯ র সাথে নরেন্দ্র একবার এমনভাবে এমন সব কথা বলেন যাতে তিনি যথেষ্ট অপমানিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী ইংল্যান্ড ১৮৮৮ থেকে ফিরে এলে, যোগেনকে সাথে নিয়ে নরেন্দ্র তাঁর বাড়িতে যান। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রীকে নরেন বলেন, “শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি নাকি বিলাত থেকে এসে সাহেব বলে গেছেন? বড় নাকি সাহেবী চং ধরেছেন? দত্ত, ম। ২০০৭: ১৯৪। শিবনাথ শাস্ত্রী নরেন্দ্রর থেকে কেবল বয়সে ১৬ বছরের বড় নন, তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সামাজিক কর্ম ও অবদান সবদিক থেকেই বড়। ২৫ বছর বয়স্ক নরেন্দ্রর মুখে এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। এখন এ হল এই ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে কী নরেন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর পুরনো একটি রাগের শোধ নিলেন? কারণ এই শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছেই তিনি চাকরি চেয়ে এতখান্যত হয়েছিলেন দত্ত, ভূ। ১৪০০ বাংলা ৮১।

পাড়ার অনেকেই তাঁকে ‘ডেঁপো ইয়ার ছেলে’(দত্ত, ম। ২০০৭: ১: ৩৯) বলে মনে করত। কারণ তাঁর কথাবার্তা, আচরণ হয়তো অনেকেরই পছন্দ হতো না। তাঁকে তারা মনে করত অহঙ্কারী ও দান্তিক। ১৮৮৭-র এপ্রিল-মে মাসের কোনো এক সময়ে নরেন্দ্র হরমোহনকে বলেছিলেন, “দ্যাখ হরমোহন, দর্শন শাস্ত্রগুলো যেন আমার হাতের মুঠোর ভেতরে রয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনগুলোও আমার ওষ্ঠের অগ্রে রয়েছে। আমরা কোন্‌ থাক জানিস? আমরা ইচ্ছা Teacher class; জগৎকে নতুন ভাব দেবার জন্য আমরা আসি” (পূর্বোক্ত: ৭৯)।

নরেন্দ্রর আচরণে পরিচিত লোকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হত—এটা বলাই বাহুল্য। তাঁরা নরেন সম্পর্কে বলতেন, “নরেনটা পাগল হয়ে গেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কী বকে যে তার মাথা মুণ্ড নেই, আবার বলে বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ ... আমরা কোনকালে এসব কথা শুনি নাই বাপু। আর শিখেছেন কতগুলো বচনের ঝুড়ি। কাজকর্ম করবার নাম নেই, চাকরি বাকরি করবার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি ওর বাড়ি পেটঠেসে আসে, আর কাজের মধ্যে কতকগুলো ছোঁড়াকে বকিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে কীরকম করছে সব— একটা কর্মনাশার দল করেছে” (দত্ত, ম। ২০০৭: ১: ৪৫)। বরানগর মঠে নরেন্দ্রর নেতৃত্বে যুবক সন্ন্যাসীর দল সাধন ভজন নিয়েই থাকত। তারা উপার্জনের দিকে বিশেষ নজর দিত না। নরেন ভারতীয় দর্শন, অধ্যাত্মবাদ, পুরাণ, বাইবেল, বৌদ্ধ শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করতেন এবং সুযোগ পেলেই সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। এইসব জটিল তত্ত্ব ও দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হত না। তাই বোধহয়

নরেনের কথাকে তারা ‘বচনের বুড়ি’ বলত। নরেন্দ্রর অস্বাভাবিক আচরণ তাদের কাছে পাগলামী বলেই মনে হতো। তবে বরানগর মঠে যারা থাকতেন তাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে খোঁটা দেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ রামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্ত/শিষ্যদের বাড়িতে যখন তাঁরা যেতেন তখন নিঃসন্দেহে খাওয়া দাওয়া খারাপ হতো না।

বরানগর মঠের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খারাপ ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথম থেকেই শশী নামক এক ব্রাহ্মণ পাচককে মঠবাসীদের রান্না করে খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ করেছিলেন(প্রভানন্দ। ২০১২:৭২)। তার মাসিক মাইনে ছিল ৬ টাকা (EWD. 1997:194)। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাড়ি বাড়ার ১১টাকা, পাচকের মাইনে সহ মোট ১০০ টাকা (প্রথম দিকে দিতেন ৩০ টাকা) মঠ চালানোর জন্য দিতেন। এছাড়াও বলরাম বসু, গিরিশ ঘোষ এবং মহেন্দ্র গুপ্ত মঠকে সাহায্য করতেন সাধ্যমত। আরও অনেকেই বিভিন্ন সময় সাহায্য করে থাকতেন। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতম। যখনই মঠে কোন কিছুর অভাব হতো তখনই হয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, নয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তা কিনে দিতেন বা কেনবার জন্য অর্থ দিতেন (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:১৮৪)। অথচ বিবেকানন্দের জীবনীকারদের রচনায় দেখা যায় যে এ সময় যুবক সন্ন্যাসীরা অনাহারে, অর্ধাহারে প্রায় বস্ত্রহীন ভাবে, ভিক্ষার উপর নির্ভর করে দিন কাটাতেন। পাশাপাশি তাদের খাওয়া দাওয়ার এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যা আবার জীবনীকারদের দাবীর সাথে মেলে না। মহেন্দ্র দত্তের বর্ণনায় মঠবাসীদের খাদ্য তালিকার মধ্যে লুচি, গুটকে, কচুরি, আলু ছেঁচকি ও মিষ্টি(২০০৭:১:২৩)। রাত্রে রুটি ও সুজির পায়ের(পূর্বোক্ত:৭৬), দিনে ভাত, দুধ (পূর্বোক্ত:৭৪) এবং চা-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।। যে পরিমাণ অর্থ মঠবাসীরা সুরেন্দ্র মিত্রের কাছে পেতেন তাতে তাঁদের খাওয়ার অভাব হওয়ার কথা নয়, অন্যান্য অভাবও থাকা উচিত নয়। কারণ ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মাসে ১০০ টাকা কয়েকজন সন্ন্যাসীর পক্ষে যথেষ্ট। তবুও এ সময় তাদের বস্ত্র, বাসস্থান ও খাদ্যের দুরবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার কারণ বোধগম্য হয় না।

সে সময় আপার-লোয়ার গ্রেডের কেরানীরা মাইনে পেতেন ৪-১০ টাকা এবং ৮-২০ টাকা মাসে। তাতেই তাদের সমাজে আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছিল(ঘোষ, বিনয়, ১৯৯৭:২:১২০)। ফলে ৮-৯ জন (কারণ অনেকেই মাঝে মধ্যে মঠ ছেড়ে ভ্রমণে যেতেন) সন্ন্যাসীদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা ছিল পর্যাপ্ত। বরানগর মঠ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ে ১৮৯০-এর এপ্রিল-মে মাসে। কারণ ঐ বছর ১৩ এপ্রিল বলরাম বসু এবং ২৫মে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মারা যান। মঠের ব্যয়ভারের প্রায় সবটাই এঁরা দিতেন। ফলে তখন প্রকৃত অর্থেই মঠ আর্থিক সংকটে পড়ে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ

আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠি পাঠালেও কোনো সদর্থক ফল পাওয়া যায়নি (গন্তীরানন্দ। ২০১২:১:২১৮)। যাই হোক, তাদের মৃত্যুর পর দারিদ্র্য ও অভাব ভয়ঙ্করভাবে হানা দিয়েছিল মঠবাসীদের জীবনে। তখন মঠকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহন প্রমুখ ভক্তরা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই সামান্য। তাই মঠের খরচ চালানোর জন্য রামকৃষ্ণ ভক্ত মহিমাচরণ প্রতিষ্ঠিত কাশীনাথ হাইস্কুলে রামকৃষ্ণগনন্দ (শশী) শিক্ষকতা শুরু করেন। মহিমাচরণ অনুরোধ করেন শশীকে সেখানে অঙ্ক শেখাতে। বিকল্প কোন পথ না পেয়ে শশী রাজী হয়ে যান। মাসিক বেতন ছিল ৫০ টাকা (বিমলাত্মানন্দ। ২০০৯:৩৬)। এই আর্থিক সংকট মুক্তির ক্ষেত্রে এই মহিমাচরণ চক্রবর্তীর একটা বিরাট ভূমিকা আছে। ফলে সন্ন্যাসীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসে।

বরানগর মঠের স্থায়িত্বকাল ছিল পাঁচ বছর [(১৮৮৬-র অক্টোবর থেকে ১৮৯২-এর অক্টোবর-নভেম্বর), (দত্ত, ম। ২০০৭:১:১৭৫)]। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে মঠ বরানগরের ভাঙাচোরা বাড়িটি ছেড়ে আলমবাজারের চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠে আসে। মহেন্দ্র দত্তের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, এটা বরানগরের বাড়ির থেকে অনেক ভালো, অনেক বেশি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক (পূর্বোক্ত)। এখন কথা হলো বলরাম বসু ও সুরেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর (১৮৯০) পর বরানগরে অর্থকষ্ট চরমে ওঠে এবং এই অর্থ কষ্টের অবসান হয় ১২/১৪ মাস পর। তারপরে প্রায় আকস্মিকভাবেই সন্ন্যাসীরা অনেক স্বচ্ছল অবস্থায় চলে আসেন। কিন্তু কীভাবে?

শশী মহিমাচরণ চক্রবর্তীর কাশীনাথ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে ৫০ টাকা বেতন পেতেন, এই তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে হবে। কেননা সে সময় শিক্ষকের বেতন হিসেবে ৫০ টাকা ছিল অস্বাভাবিক রকম বেশি। তাই তথ্যটি ঠিক নাও হতে পারে। আবার ঠিক হতেও পারে। এর পিছনে একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। রামকৃষ্ণ যতই ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ বলুন না কেন, প্রয়োজনে তিনি অনেকের কাছ থেকেই আর্থিক সাহায্য নিয়েছিলেন। বড়বাজারের এক ধনী ব্যবসায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ মারওয়ারি রামকৃষ্ণকে বছবার অর্থদান করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার তাকে ফিরিয়ে দিলেও শেষপর্যন্ত তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন (গন্তীরানন্দ, ২০১২:১:১৬১)। গৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার টাকা। সে সময়ের বিচারে সেটা ছিল বিরাট অঙ্কের অর্থ। এই টাকাটি রামকৃষ্ণ জমা রাখেন মহিমাচরণ চক্রবর্তীর কাছে। এ তথ্য পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার সেনের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি’তে (উদ্বোধন

কার্যালয়, কলকাতা)। মহিমাচরণ চক্রবর্তী ছিলেন একজন ছোট মানের জমিদার। একই সাথে তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের গুরুভাই। কারণ তিনিও ছিলেন তোতাপুরীর মন্ত্রশিষ্য। রামকৃষ্ণের সাথে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। যখন রামকৃষ্ণ দেখলেন যে তাঁর ভক্ত/শিষ্যদের মধ্য দলাদলি শুরু হয়ে গেছে, তখন হয়তো তিনি কোন পক্ষের হাতে টাকাটা তুলে দেওয়া ঠিক হবে তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ফলে তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল মহিমাচরণের কাছে টাকাটা থাকলে শুধু নিরাপদ হবে না, প্রয়োজনে তা কাজেও লাগবে। মহিমাচরণ সেই বিশ্বাসের যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। যখন বরানগরের মঠবাসীরা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেন তখন তিনি তাদের অর্থ কষ্ট দূর করতে এগিয়ে এলেন।

এখন প্রশ্ন হলো, বলরাম ও সুরেন্দ্রর মৃত্যু হয় ১৮৯০-এর এপ্রিল-মে মাসে। অথচ মহিমাচরণ মঠবাসীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। কেন? এর পিছনে সম্ভাব্য কারণ হলো নরেন্দ্রনাথের সাথে মহিমাচরণের বিবাদ। মহিমাচরণ গুরুভাই হওয়ায় রামকৃষ্ণের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন। তার উপর তিনি ছিলেন একাধারে ব্রাহ্মণ জমিদার এবং ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিত। তাই তিনি সুযোগ পেলেই রামকৃষ্ণের ভক্ত/শিষ্যদের ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। আবার একতারা বাজিয়ে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই গেরুয়া পোশাক পরা সুন্দর চেহারার মহিমাচরণের আলোচনার দ্বারা অনেকেই মুগ্ধ হতেন। যুবক নরেন্দ্রও ছিলেন যথেষ্ট ব্যক্তিত্বশালী এবং প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাই তাঁর মহিমাচরণের প্রভাব বিস্তার একেবারেই পছন্দ হতো না। তাছাড়া নরেন্দ্র কোন সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারতেন না। তাই সুযোগ পেলেই মহিমাচরণের সাথে তর্ক জুড়ে দিতেন এবং কড়া কথা শুনিয়ে দিতেন বা ব্যঙ্গ-বিদূষিত করতেন। শুধু তাই নয়, নরেন্দ্র মহিমাচরণের বাড়িতে গিয়েও তাকে অপদস্থ করে আসেন [(সারদানন্দ। ২০১১:১:২(২):১৮৫-৮৬)]। স্বাভাবিক ভাবেই মহিমাচরণও নরেন্দ্রকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই যতদিন বরানগর মঠে নরেন্দ্র ছিলেন ততদিন তিনি মঠকে সাহায্য করেন নি। কিন্তু জুলাই ১৮৯০-এ নরেন্দ্র পাকাপাকিভাবে মঠ ত্যাগ করায়, মহিমাচরণের সুযোগ এসে যায় বরানগর মঠে আসার। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন নরেন্দ্র আর ফিরছে না, তখনই তিনি শশী মহারাজ ও বরানগর মঠকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। শশীকে কেবল অস্বাভাবিক অঙ্কের বেতনই দিলেন না, তাঁর কাছে জমা ১০,০০০ টাকা আলমবাজারে নতুন বাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত করার জন্যেও কাজে লাগালেন (Chattopadhyaya. R.G. 2010:108)।

১৮৮৭ থেকে ১৮৯০-এর জুলাই— এই পর্বে নরেন্দ্র বারংবার মঠ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। ১৮৯০-এর জুলাইতে তিনি পাকাপাকিভাবে মঠ ত্যাগ করেন। আর কোনো দিন বরানগর মঠে ফিরে আসেন নি। এইভাবে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। যোগানন্দ, লাটু, সারদা(স্বামী ত্রিগুণাতীত) প্রমুখ যখন তীর্থভ্রমণ বা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন এবং রাখাল মহারাজও যখন তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বিবেকানন্দ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এইভাবে একে একে যদি সকল মঠবাসী তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তো মঠই উঠে যাবে। গম্ভীরানন্দ লিখছেন, “মঠ প্রতিষ্ঠার পর ইহাতেই কেহ না কেহ প্রায়ই বাহিরে যাইতেন কখনও কখনও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ(শশী) এবং আরও দুই-একজন ছাড়া মঠ শূন্যপ্রায় হইয়া যায়। কেহ যাইতেন অল্পকালের জন্য, কেহ যাইতেন সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা ও তপস্যায়। এদিকে স্বামীজী চাহিতেন তাঁহার গুরুভ্রাতারা সঙ ঘবদ্ধ হইয়া থাকুন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে গড়িয়া উঠুন” (২০১২:১:১৯৩)। কিন্তু রাখালও যখন তীর্থযাত্রার কথা বললেন নরেন্দ্র তখন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। রাখালকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে বললেন, “হ্যাঁ, তা যাবে বৈকি! ঐ রকম ভবঘুরের মতো বেড়ালেই ভগবান সশরীরে দেখা দেবেন আর কি!” (বসু, প্রথম নাথ। ২০১১:১:১৩৭)।

অর্থাৎ বিবেকানন্দ এই রকমের ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর বিরোধী ছিলেন। তবুও তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হল মঠ ছেড়ে। কারণগুলি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, মঠের মধ্যে দলাদলি এবং গুরুভাইদের বিদ্রূপ ও দুর্ব্যবহার।^{১২} মহেন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথা থেকে পাই যে, গুরুভাইদের বেশ কয়েকজন নরেন্দ্রকে ‘দান্তিক’ বলে মনে করতো। এবং নরেন্দ্র পড়াশুনা করা দেখে ঠাট্টা তামাশা করতো। নরেন্দ্র কালী ও শরতের প্রতি এই ধরনের অবজ্ঞার ভাব চরমে ওঠায় তাঁরা মঠ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন (দত্ত, মহেন্দ্রনাথ। ১৪০৭ বাংলা:৪১)।

দ্বিতীয়ত, বলরাম বসু ও সুরেন্দ্রনাথ মিত্র আমৃত্যু বরানগর মঠকে আর্থিক সাহায্য করে এসেছেন। কিন্তু সেই অর্থ সন্ন্যাসীদের থাকা খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হলেও, চিকিৎসার প্রয়োজনে যথেষ্ট ছিল না। সে সময় নরেন্দ্র কিডনির রোগে ভুগছিলেন। (EWD. 1997:1:211)। ফলে যখনই তিনি ভালোমত অসুস্থ হয়েছেন, তখনই তাঁকে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য। কারণ মঠের অর্থে চিকিৎসা চালানো সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়ত, বিবেকানন্দ নিজে একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি ভগ্নী ক্রিস্টনকে এক সময় বলেছিলেন যে, তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতীয় রাজাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী জোট গঠনের জন্য। তাঁর লক্ষ্য ছিল এই শক্তিশালী জোট গঠনের মধ্যে দিয়ে বিদেশী শাসনকে বল প্রয়োগের দ্বারা উচ্ছেদ করা (দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। ১৪০০বাংলা : ২)। এরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে তিনি ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন— জীবনীগ্রন্থগুলিতে কিন্তু তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, ১৮৯০-এর জুলাই মাসে তিনি যখন পাকাপাকিভাবে মঠ ত্যাগ করেছেন তখন মূল কারণটি ছিল আর্থিক। ১৮৯০-এর ১৩ এপ্রিল বলরাম বসু ও ২৫ মে সুরেন্দ্র মিত্র মারা যান। মঠবাসীদের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ে।

অবস্থানটি বর্ণনা করতে গিয়ে গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, “...তখন মঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল— কে মঠের ব্যয় নির্বাহ করিবেন, আর সন্ন্যাসীরা কোথায় দাঁড়াইবেন? অথবা মঠ যদি উঠিয়াই যায় এবং সাধুরা পরিব্রাজকরূপে ইতস্তত ঘুরিতে থাকেন, তাহাতেও হয় তো তেমন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্র ভ্রম্মাবশেষ কোথায় সংরক্ষিত হইবে? এই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া স্বামীজী ইতস্তত সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশ্য কলিকাতার বন্ধুরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া মঠের কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে গিরিশবাবু(ঘোষ), মাস্টার মহাশয়(মহেন্দ্র গুপ্ত/শ্রীম) প্রভৃতির সহায়তায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহারা তো ধনী ছিলেন না; আর ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদানের সামর্থ্য ইহাদের মোটেই ছিল না”(২০১২:১:২১৭)। এরকম একটা পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র প্রমদাদাস মিত্রকে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন (২৬ মে, ১৮৯০)। প্রমদাদাস মিত্র ছিলেন বারানসী নিবাসী ধনী ব্যক্তি। নরেন্দ্রের চিঠির কোনো সদর্থক উত্তর তিনি দেন নি। বরং এমন কিছু কথা হয়তো চিঠিতে লিখেছিলেন যা উভয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। অর্থাৎ বরানগরের মঠের আর্থিক সংকট কাটানোর কোন উপায় যখন নরেন্দ্রের সামনে থাকলো না, তখন বাধ্য হয়ে মঠ ত্যাগ করলেন, শেষবারের মতো। অর্থাৎ মঠ ত্যাগের পিছনে কোন আধ্যাত্মিক কারণ নয়, বরং পার্থিব প্রয়োজনই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

যাই হোক ১৮৮৭ থেকেই তিনি ঘুরে বেড়ানো শুরু করেন এবং সেটা যে বাধ্য হয়েই তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকেবারই যাবার সময় বলে যেতেন, ‘এই শেষ, আর ফিরছি না’ (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:১৩৮)। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে ফিরে আসতে হত। ফিরে আসার অন্যতম কারণই ছিল নিজের অসুস্থতা। এই সময় অর্থাৎ ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ এই ক’বছর তিনি বেরিয়েছেন এবং ফিরে এসেছেন। কিন্তু

১৮৯০-এর জুলাই-এর পর তিনি আর বরানগর মঠে ফিরে আসেন নি। ফিরেছেন একেবারে ১৮৯৭-এ যখন বরানগর মঠের অস্তিত্ব আর নেই।

নরেন্দ্রর জীবনীগ্রন্থগুলিতে তাঁর পরিব্রাজন সম্পর্কে বহু তথ্য সংযোজিত আছে; সেগুলির বিস্তৃত বর্ণনা না করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উপস্থিত করা হবে। এখানে কালানুক্রমিকতাকে অনুসরণ করার জন্য সালের ভিত্তিতে তাঁর পরিব্রাজক জীবনটাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৮৮৬ খ্রিঃ পদ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাশীপুর উদ্যানবাটিতে রামকৃষ্ণের চিকিৎসা চলাকালীনই কালী ও তারককে সাথে নিয়ে নরেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সময়টা সম্ভবত ১৫ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল এর মধ্যে। এসময় তাঁরা বুদ্ধের জীবনী ও বাণী এবং সন্ন্যাস জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন। রামকৃষ্ণকে না জানিয়েই তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে বালি যান এবং রাস্তার ধারের একটি দোকানে রাত কাটিয়ে গয়ার ট্রেন ধরেন (গভীরানন্দ। ২০১২:১:১৫৪)। গয়া ভ্রমণ ছিল তাঁর ‘রথ দেখা ও কলা বেচা’র মত। কারণ একইসাথে ধর্মস্থানে গিয়ে পুণ্যলাভ তো তাঁর হলোই, তার সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল আরও একটি বৈষয়িক স্বার্থ। সম্ভবত গয়া ভ্রমণের সময়ই তিনি সেখানে জমিদারীতে ম্যানেজারীর চাকরীর সন্ধান পান। তাই গয়া থেকে তীর্থ দর্শনের পরই তাঁকে বলতে শোনা যায়(২১ এপ্রিল) “বিদ্যাসাগরের ইচ্ছুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে”(শ্রীম। ১৩৭৭ বাংলা:৪:২৯২)। বোধগয়াতে ধর্মশালায় এবং গয়াতে জনৈক উমেশবাবুর বাড়িতে তাঁরা অতিথি হিসেবে ছিলেন। সেখান থেকে ট্রেনে কাশীপুরে ফিরে আসেন। এই উমেশবাবুর কাছ থেকে ম্যানেজারের চাকরীর সংবাদটি তিনি পেয়ে থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

১৮৮৭ খ্রিঃ পদ

গোটা ১৮৮৭ সালটি ছিল নরেন্দ্রর কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। প্রায় সকল দিক থেকেই তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমত, শারীরিক অসুস্থতা; দ্বিতীয়ত, পারিবারিক দারিদ্র্য ও মামলা মোকদ্দমা; তৃতীয়ত, গুরুভাইদের সাথে নানা বিষয়ে সংঘাত ইত্যাদি তাঁকে এক দিকশূন্য প্রান্তরের দিকে ঠেলে দেয়। ১৮৮৭-র জুন মাসের কাছাকাছি কোন সময় নরেন্দ্র বরানগর মঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তার আগে তিনি বাড়ি ও বরানগর মঠ উভয় স্থানেই কিছুদিন করে থাকতেন। তিনি ঘন

ঘন অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তার উপর পরিবার নিয়ে দুঃশ্চিন্তা ও মঠের অনিয়ম—তিনি বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই বছরের মাচ-এপ্রিলে^১ তিনি জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হন। বলরাম বসুর কাছ থেকে খবর পেয়ে ভুবনেশ্বরী দেবী বরানগর মঠে নরেন্দ্রকে দেখতে যান। সেখানে তিনি এক অপমানকর অবস্থার মুখোমুখি হন। নরেন্দ্রর মা ভুবনেশ্বরী অসুস্থ সন্তানের বিছানার পাশে দাঁড়ালে নরেন্দ্র অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যেই বলেন, “এখানে স্ত্রীলোককে কেন ঢুকতে দিলে? আমিই নিয়ম করলুম আর আমার বেলায়ই নিয়ম রদ হল?” (দত্ত, মহেন্দ্র। ২০০৭:১:৪০)। বিস্মিত হতে হয় এটা দেখে যে, তিনি ও তাঁর গুরু এত ‘মা, মা’ করেছেন, অথচ সেই নরেন্দ্র নিজের মা’কে কেবলমাত্র একজন নারী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন গরমের শেষ ও বর্ষার প্রথমে, অর্থাৎ মে-জুন মাসে। রোগটি হল পাথুরি ব্যথা। এসময় তিনি ৭নং রামতনু বসুর গলিতে এসে থাকতেন এবং ডা. রাজেন্দ্রলাল সরকারকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এছাড়াও তাঁর প্রায় চিরদিনের সঙ্গী ছিল পেটের রোগ। বরানগর মঠে ঘন ঘন এর আবির্ভাব ঘটতো(দত্ত, মহেন্দ্র। ২০০৭:১:৫০)।

এইরকম বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ১৯৯৭ তে মঠের বাইরে পর্যটন করতে বিশেষ যেতে পারেন নি। পাশাপাশি শশী, রাখাল প্রমুখের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বেড়েই চলছিল।

১৮৮৭-তে বরানগর মঠ কালীপূজাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্য মতান্তর ঘটে। এই কালীপূজায় নরেন্দ্র পাঁঠাবলির কথা বলেন। রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) সহ বেশ কয়েকজন এই বলির বিরোধিতা করেন। নরেন্দ্র তখন বলেন, “আরে একটা পাঁঠা কি, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবানকে পাওয়া যায় তাই করতে আমি রাজী আছি” (দত্ত, মহেন্দ্র। ২০০৭:১:৭৭)। মানুষের প্রতি ভালোবাসার যে বাণী বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা যেন হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর ধর্মীয় ভাবনার সামনে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে পাবার জন্য নরেন্দ্র নিরীহ পাঁঠাটিকে বধ করেন (পূর্বোক্ত)।

এই পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নরেন্দ্র ঠিকুজি দেখা। সময়টা গ্রীষ্মকাল। সে সময় ভুবনেশ্বরী দেবী, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, রামতনু বসুর গলির বাড়িতে থাকতেন। নরেন্দ্র সেই বাড়িতে পৌঁছিয়ে মহেন্দ্রকে ঠিকুজিখানি নিয়ে আসতে বলেন। ঠিকুজির পাতা পড়তে পড়তে নরেন্দ্র বললেন, “ওরে যোগে, দ্যাখ ঠিকুজির সঙ্গে আমার ঠিক মিলেছে। তাসবর্ণ কেশ হবে, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ হবে, নিরাশ্রয়— দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে ও উন্মাদ হবে।” তারপর আবার পড়ে বলেন, “দেখি দেখি, পরে

কী লিখেছে। ওরে, পরে যে এসব ভাল লিখছে রে। দ্যাখ্ শালা, আমার ঠিকুজি ছবছ মিল গেছে রে” (দত্ত, মহেন্দ্র। ২০০৭:১:৪৪)। ভক্তবৃন্দ কর্তৃক বহুল প্রচারিত ধারণাটি হল—বিবেকানন্দ জ্যোতিষের বিরোধী ছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে জ্যোতিষের সমগোত্রীয় ঠিকুজিতে তাঁর প্রবল বিশ্বাস।

এই পর্বে তাঁর পরিভ্রমণ বলতে কয়েকটি অল্প দিনের ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন— বসন্তকালে দেওঘর ও শিমুলতলায় গিয়েছিলেন। ১৮৮৭-র শেষ দিকে বা ১৮৮৮-র প্রথম দিকে বারানসী, অযোধ্যা, লখনউ ও আগ্রা ভ্রমণ করেন।

১৮৮৮ খ্রিঃ ১দ

সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে ১৮৮৮-র প্রথম দিকে তিনি কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলেন EWD (1997:1) প্রমথ বসু(২০১১:১), গম্ভীরানন্দ (২০১১:১) Chattopadhyaya (1999) ইত্যাদি জীবনীগ্রন্থগুলিতে ১৮৮৮-র মার্চ থেকে জুলাই এই সময় নরেন্দ্র কোথায় ছিলেন তা স্পষ্ট করে বলা নেই। তাই এ সময়ে বরানগর মঠ, কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ অসুস্থতা কখনই তাঁর পিছু ছাড়ে নি।

অগাষ্ট মাসে তিনি অযোধ্যা ও বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ট্রেনে করে। বৃন্দাবনে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বলরাম বাবুদের ঠাকুর বাড়ি ‘কালাবাবুর কুঞ্জ’। বৃন্দাবন থেকে তিনি ট্রেনে করে উত্তরাখণ্ডে হাথরাসে যান। এই হাথরাস স্টেশনে তাঁর সাথে দেখা হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের। প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি পাওয়া যা় শরৎচন্দ্র গুপ্ত (স্বামী সদানন্দ)-র স্মৃতি কথায় : “হাথরাস স্টেশনে কাজ করতাম। একরাতে সাধুর স্বপন দেখি, তাঁকেই খুঁজছিলুম। তিন দিন পরে এক ট্রেনে দেখি, একটা ফার্স্টক্লাস কামরায় এক লাল সুন্দর পাগড়ি বাঁধা বড় বড় চোখাওলা সাধু যাচ্ছেন। দেখে বুঝলাম হিন্দুস্থানী নন, বাঙালী—আমারই স্বপনের সাধু”(স্বামী সদানন্দ। ২০১২:২৯)। EWD (1997:vol. 1), প্রমথনাথ বসু (২০১১:খণ্ড ১) এবং গম্ভীরানন্দ (২০১২:খণ্ড ১) প্রমুখ জীবনীকারের বর্ণনা থেকে হাথরাস স্টেশনে শরৎচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাথে সদানন্দ(শরৎচন্দ্র গুপ্ত)- স্মৃতিকথার সাদৃশ্য থাকলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, EWD, বসু ও গম্ভীরানন্দ উল্লেখ করেন নি যে নরেন্দ্র সে সময় প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনটি জীবনীতে দেখানো হয়েছে যে স্টেশন চত্বরে বা প্লাটফর্মে নরেন্দ্র

(তখন বিবিদিষানন্দ) ক্লান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। সদানন্দের তথ্য অন্যরকম। তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম শ্রেণির কামরায় বসে থাকতে দেখেন এবং সেখানেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎকার।

তৃতীয়ত, তিন জীবনীকারগণের মতে নরেন্দ্র প্রথম সাক্ষাৎকারের সাথে সাথেই সদানন্দের বাড়িতে চলে যান এবং খাদ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সদানন্দের তথ্য ভিন্নরকম। প্রথম সাক্ষাতের পর ট্রেনে করে নরেন্দ্র চলে যান। এবং ফিরবার পথে হাথরাস স্টেশনে নেমে সদানন্দের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন (সদানন্দ ২০১২:২৯)।

হাথরাস স্টেশনে সদানন্দের সাথে সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি মহেন্দ্রনাথ যেভাবে করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার। তাঁর তথ্যের সাথে অন্যান্য জীবনীকারদের বর্ণনার কোন সাদৃশ্যই নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মহেন্দ্র দত্তের কথাই সঠিক বলে মনে হয়। বারবার গুরুভাইদের সাথে সংঘাতের ফলে এবং তাঁদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপে অতিষ্ঠ হয়ে নরেন্দ্র বরানগর মঠ ত্যাগ করেছিলেন। শরৎ ও কালীও যেহেতু নরেন্দ্রর অনুগামী তাই তাঁদেরও উত্যক্ত করা হতে থাকে। এবং তার ফলে তাঁরাও মঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। মহেন্দ্রনাথ সে সময় নরেন্দ্রর মনের অবস্থাটি কেমনতর ছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, “নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ ছাড়িয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল। হাথরাস স্টেশনে বসিয়া অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছে, সেই সময় গুপ্তর (শরৎচন্দ্র গুপ্ত) সহিত দেখা হয়। মনে তখন অত্যন্ত কষ্ট। ...ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া ভিখারি হইল, জনকতক গুরুভাই-এর সহিত রহিল শুধু সাধন-ভজন করিবার জন্য, কিন্তু তাহাদের ভিতরও কয়েকজন বিরোধী হইয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিল। জগতে যেন একটু মাথা রাখিবার স্থান নাই—সবই বিষণ্ণভাব। তখন তাঁহার মনে এইরূপ কষ্ট চলিতেছিল। গুপ্ত এই সকল কথা আমায় বলিয়াছিল। অভেদানন্দ (কালী) এ বিষয় সব জানিত”(দত্ত, মহেন্দ্রনাথ। ১৪০৭ বাংলা : ৪২)।

সদানন্দ ছিলেন নরেন্দ্রর প্রথম শিষ্য। গুরুভাইদের সাথে নরেন্দ্রর সংঘাতের উত্তাপ থেকে তিনিও রক্ষা পান নি। মহেন্দ্রনাথের বর্ণনায় পাওয়া যায়, “গুপ্ত (সদানন্দ) যখন নরেন্দ্রনাথের শিষ্য হইয়া বরানগর মঠে আসিল,^১ তখন এক মহা গণ্ডগোল হইল। নরেন এর মধ্যে চেলা করতে আরম্ভ করেছে। তিনি (রামকৃষ্ণ) কী নরেনকে চেলা করতে বলেছিলেন? নরেনের হয়েছে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। নরেনের চেলাকে এখানে থাকতে দেওয়া হবে না। শুধু যারা তাঁকে (রামকৃষ্ণ) দেখেছে, তাঁর সময়কাল লোক, তারাই থাকতে পাবে, অন্য কেউ থাকতে পাবে না। এই সময় অনেকেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কেবল জনাকতক মঠে ছিল, কারণ তখন তাহাদের ভিতর প্রবল ভাব ছিল কঠোর তপস্যা

করিবার। ভাগ্যক্রমে, তখন পাহাড় হইতে যুবা শরৎ ফিরিয়া আসিল এবং সে গুপ্ত (সদানন্দ)-র হইয়া কথাবার্তা বলায় গুপ্ত থাকিতে পাইল। এইটি হইল নরেন্দ্রনাথের প্রতি জনাকতকের বিদেহ ভাব” (দত্ত, মহেন্দ্রনাথ। ১৪০৭ বাংলা : ৪২)।

হাথরাস থেকে ট্রেনে শরৎচন্দ্র গুপ্তকে নিয়ে তিনি এবার হৃষীকেশ যাত্রা করলেন। এই হৃষীকেশে নরেন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে আবার কলিকাতায় ফিরতে হয়। কলিকাতায় ফিরে আসার আরও একটা কারণ ছিল— তা হল পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা। ১৮৮৮-র অক্টোবর-নভেম্বরে তিনি দিদিমার বাড়িতেই ছিলেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে আবার বেরিয়ে পড়েন।

১৮৮৯ খ্রিঃ বর্ষ

ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন আঁটপুরে বাবুরাম ঘোষের বাড়িতে, সম্ভবত ঐ মাসেই কামারপুকুর বা জয়রামবাটিতে ভ্রমণ করেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলিকাতায় ফিরে আসেন। জুন-জুলাই মাসে যান শিমূলতলায়। বাহন ছিল ট্রেন। আবার অসুস্থ হন এবং কলিকাতায় ফিরে আসেন। এই বছরেই নভেম্বর মাস অবধি কলিকাতা ও বরানগরের মঠেই থাকেন। ডিসেম্বরের শেষ ভাগে ট্রেন ধরে তিনি দেওঘর যাত্রা করেন। আশ্রয় নেন পূর্ববাবুর বাড়িতে।

১৮৯০ খ্রিঃ বর্ষ

জানুয়ারী মাসে তিনি উপস্থিত হন এলাহাবাদে। টেনেই যেতে হয়েছিল সেখানে। এলাহাবাদে আশ্রয় নেন গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে। ঐ মাসের ২২ তারিখে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাজীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন। গাজীপুরে তিনি আরও একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি হলেন রায়বাহাদুর শ্রীগগন চন্দ্র রায়। এই গাজীপুরেই তিনি পত্তহারী বাবার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় নরেন্দ্র কোমরের ও পেটের রোগে ভুগতেন (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭:২৪-২৫, ৩৩)। এই পর্বে তিনি তাঁর গুরুভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না। তিনি কোথায় আছেন তাও তিনি গুরুভাইদের জানতে দিতেন না। বলরাম বসুকে তিনি একটি চিঠিতে (৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০) লেখেন, “আমি এখানে’ আছি কাহাকেও বলিও না, ও আমাকেও কাহারও খবর দিবে না” (পত্রাবলী, ১৯৭৭ : ২৩)। মার্চ মাসের একটি চিঠিতে অভেদানন্দকে লিখেছেন, “আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরানগরে কাহাকেও লিখিও না” (পূর্বোক্ত : ৩৪)।

এই সময়টি বিবিদিযানন্দের (নরেন্দ্র) কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গগন রায় বিবিদিযানন্দের সাথে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মি. রসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই মি. রসই জেলা জজ মি. পেনিংটনের সাথে আলাপ করান। বিবিদিযানন্দের সাথে আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে মি. পেনিংটন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বিবিদিযানন্দকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর ভাবনাকে প্রচার করার পরামর্শ দেন (EWD. 1997:1:231, বসু প্রমথনাথ। ২০১১:১:১৫০ এবং গম্ভীরানন্দ। ২০১২ : ১: ২০৯)। মহেন্দ্রনাথ দত্ত কিস্তি পেনিংটনের সাথে আলাপের সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, “জনৈক ইংরাজ তখন (এপ্রিল, ১৮৯০) গাজীপুরে District Judge ছিলেন। এবং শ্রীশচন্দ্র বসুর বাটির নিকট বাগান বাড়িতে বাস করিতেন। শ্রীশচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার খুব হৃদয়তা ছিল। ইংরাজটির বেশ বয়স হইয়াছিল এবং বেশ সৎলোক ছিলেন। একটি যুবক সন্ন্যাসীকে মুসেফের বাড়িতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া ইংরাজটি শ্রীশচন্দ্রের নিকট সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন এবং শ্রীশচন্দ্রও সন্ন্যাসীটির অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য ইংরাজটিকে বুঝাইয়া দিলেন। ফলে ইংরাজ সন্ন্যাসীর সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একদিন শ্রীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজটির বাড়ি গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তেজস্বী যুবক ও তর্ক-যুক্তিতে বিশেষ পারদর্শী, ইংরাজটি বুদ্ধ ও ধীর; দুজনায় নানা প্রসঙ্গ ও দর্শন শাস্ত্রে আলোচনা হইতে লাগিল। ... নরেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়িতে যাইতেন। একদিন ইংরাজটি নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “দেখুন স্বামী, আপনি ইংল্যাণ্ডে যান, তথায় আরও ভাল করে লেখাপড়া শিখুন। আপনার ভিতর যা শক্তি আছে তাহার উপর যদি উচ্চবিদ্যা শিক্ষা হয়, তাহা হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণকর কার্য হইতে পারে; তাহার জন্য যাহা খরচ লাগিবে, আমি নিজে তাহা আনন্দের সহিত বহন করিতে রাজি আছি” (দত্ত, মহেন্দ্র। ২০০৭:১:১৫৪-১৫৫)। স্পষ্টতই প্রথম তিন জীবনীকারদের সাথে মহেন্দ্র দত্তের বর্ণনা মূলগতভাবে পৃথক।

প্রথমত, মি. রস নয়, মহেন্দ্র দত্তের মতে, শ্রীশচন্দ্র বসু পেনিংটনের সাথে নরেন্দ্রর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মি. পেনিংটন নরেন্দ্রকে ধর্মপ্রচারের জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা বলেন নি, বলেছিলেন আরও ভালো করে পড়াশুনা শেখার জন্য সেখানে যেতে।

তৃতীয়ত, দত্তের মতে পেনিংটনের কথা যে নরেন্দ্রকে নাড়া দিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ ১৮৮১-৮৪তে তাঁর ইচ্ছা ছিল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আইন পড়ার। সেই ইচ্ছাটাই আবার উস্কে দিলেন মি. পেনিংটন। শিকাগো যাত্রার প্রাক্ প্রাথমিক সূচনা

বিন্দু বোধহয় এটাই। যদিও তিনি পেনিংটনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। হয়তো তাঁর চিন্তার দ্বিধাগ্রস্ততাই তাঁকে বাধা দিয়েছিল। যাই হোক কারণটি খুব একটা স্পষ্ট নয়।

ইতিমধ্যে ১৩ এপ্রিল বলরাম বসু মারা যান। সে খবর এসে পৌঁছয় বিবিদিশানন্দের কাছে। তিনি কলকাতায় ফিরে যান এবং বলরাম বসু শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ২৫ মে সুরেন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয়। প্রমদাদাস মিত্রকে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখে যখন নরেন্দ্র কোন সুফল পেলেন না তখন সেই দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে বরানগর মঠ ও গুরুভাইদের ফেলে জুলাই মাসে পাকাপাকিভাবে বরানগর মঠ থেকে বিদায় নিলেন।

বরানগর মঠ ত্যাগ করে ট্রেনে চেপে তিনি প্রথমে গেলেন ভাগলপুর। সেখানে আশ্রয় নিলেন কুমার নিত্যানন্দ সিংহের অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক মনমথ চৌধুরীর বাড়িতে। এখানে তিনি এক সপ্তাহ কাটান। সেখান থেকে দেওঘর। আশ্রয় পান সম্ভবত কোন আত্মীয় বাড়িতে। সেখান থেকে বৈদ্যনাথ ধাম হয়ে পৌঁছন কাশীধামে। সেপ্টেম্বর মাসে ভ্রমণ করেন বারানসী, অযোধ্যা, নৈনিতাল, আলমোড়া, কর্ণপ্রয়াগ এবং রুদ্রপ্রয়াগ। প্রথম তিনটি স্থানে ট্রেনে ভ্রমণ করলেও বাকী স্থানগুলিতে তা সম্ভব হয় নি। সর্বত্রই (অযোধ্যা বাদে) আশ্রয় ও খাদ্যের সুবন্দোবস্ত ছিল। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে ভ্রমণ করেন শ্রীনগর, উত্তরপ্রদেশ, তেহরি, দেরাদুন, হৃষীকেশ, মীরাট। হৃষীকেশ ও মীরাটে তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাকি স্থানগুলিতে হেঁটেই ভ্রমণ করেন। হাঁটা ছাড়া সে সময় কোন বিকল্পও ছিল না। মনে রাখা দরকার এই যাত্রা পথে অসুস্থতা তাঁকে কখনই পরিত্যাগ করে নি।

১৮৯১ খ্রিঃ ব্দ

জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অবধি তিনি শেঠজীর বাগানে ছিলেন। ফেব্রুয়ারী মার্চে তিনি যান দিল্লীতে। আশ্রয় পান শেঠ শ্যামল দাসের বাড়িতে। মার্চ মাসে আলওয়ারে তিনি বেশ কিছুদিন কাটান ও চরণ নন্সরের বাড়িতে। দিল্লী থেকে আলওয়ার যাত্রায় তাঁর বাহন ছিল ট্রেন। আলওয়ার বাস পর্বের শেষ দিকে তিনি ছিলেন পণ্ডিত শম্ভুনাথ ও আলওয়ারের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীর বাড়িতে। এই রামচন্দ্রজীর মধ্য দিয়েই তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় আলওয়ারের রাজার সাথে। আলওয়ারে তিনি সংস্কৃত ভাষা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ইত্যাদির উপর গু ত্ব দিতেন। গম্ভীরানন্দ এই সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, একটি ব্রাহ্মণ বালক তাঁহার বিবেকানন্দের কাছে আসিত এবং শিষ্য যেমন গু কে ভালোবাসে তেমনি ভালবাসিত।

তাহার উপনয়নের সময় সমাগত হইলেও অর্থাভাবে উপনয়ন হয় নাই। স্বামীজি ইহা জানিতে পারিয়া ইহার ঐতিকারক চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বিত্ৰাশালী ভক্ত দিগকে বললেন, তোমাদের কাছে আমার একটি ভি ৷ আছে। এই ব্রাহ্মণ বালকটির উপনয়ন সংস্কারের উপযুক্ত অর্থ নাই গৃহস্থ হিসাবে একে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্যও অতএব তার জন্য চাঁদা তোল। এর বয়সের ব্রহ্মণ ছেলে স্ববর্ণোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ত্রি যাকলাপ জানবে না, এটা বড় অশোভন। তার যদি তোমরা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পার তো বড় উত্তম হয় ২০১২ ১ ২৫। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকেই আদর্শ বলে মনে করতেন। আর জাতিভেদ এখার তিনি কোন দিনই অবসান চান নি। যা চেয়েছিলেন তা হল ছোট জাত ? ও বড় জাত ? উভয় শাস্ত্রপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখুক।

১৪ এপ্রিল তিনি আবু পাহাড়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি চম্পা গুফা নামের একটি গুহাতে কিছুদিন আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আশ্রয় নেন দেশীয় রাজার এক উকিলের সুন্দর বাংলোয়। এই উকিলের মাধ্যমেই তাঁর সাথে আলাপ হয় কোটার রাজ্যের উকিল মহারাজ ও মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহের সাথে। এর কয়েকদিনের পরেই খেতড়ি রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলাল বিবিদিষানন্দের আশ্রয়দাতা মুসলমান উকিলের বাড়িতে আমন্ত্রিত হন। ফলে আলাপ হয়ে যায় বিবিদিষানন্দের সাথে। জগমোহনলাল যোগাযোগ করিয়ে দেন খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সাথে। বিবিদিষানন্দের জীবনে ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন। এই অজিত সিংহের হাত ধরেই ‘বিবেকানন্দ’র আবির্ভাবের সূত্রপাত।

রাজগৃহে হাজির হল যুবক সম্যাসী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গী দ্বারা আকর্ষিত হলেন খেতড়ি রাজা অজিত সিংহ। ৪ জুন, ১৮৯১-এর সেই সাক্ষাৎকার ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটা ছিল শুরুর শুরু। এর পরের থেকেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি শব্দগুলি বিবেকানন্দের জীবন থেকে বিদায় নেয়। রাজগৃহে দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞান-গম্ভীর আলোচনা সহ রাজকীয় খাওয়া ও থাকার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল তাঁর সে সময়ে। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে তাঁকে আর পিছনে তাকাতে হয় নি।

২৪ জুলাই অজিত সিংহের সাথে তিনি খেতড়িতে যাত্রা করেন। খেতড়িতে পৌঁছান ৭ অগাস্ট। এখানে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই অজিত সিংহ তাঁর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নেন। এই প্রথম তিনি কোন রাজাকে শিষ্য হিসেবে দীক্ষা দিলেন। ১৮৯১-এর এপ্রিল থেকেই তিনি কখনও বিবেকানন্দ, কখনও সচ্চিদানন্দ নাম ব্যবহার করতেন। অজিত সিংহের অনুরোধেই তিনি বিবেকানন্দ নামটি পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে ব্যবহার

কণিক চৌধুরী

করতে শুরু করেন।

জীবনীকারগণের মতে গুরুর আশীর্বাদে অনেক অসম্ভব জিনিস সম্ভব হয়। খেতড়ি রাজ অজিত সিংহের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। অজিত সিংহ ছিলেন অপুত্রক। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর রাজত্ব কার হাতে যাবে তাই নিয়ে তার যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি পেয়ে গেছেন এক ব্যক্তিত্বশালী, প্রতিভাবান, বাগ্মী বাঙালী গুরু। অজিত সিংহ তাই গুরুর কাছে পুত্রসন্তান লাভের জন্য আশীর্বাদ চাইলেন। বিবেকানন্দও তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন। সে আশীর্বাদ ফলেও গেল। এই কাকতালীয় ঘটনা সম্পর্কে জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর মন্তব্য : “আজন্ম ব্রহ্মচারীর এ আশীর্বাদ বিফল হয় নাই” (২০১১:১:১৯৭)।

খেতড়িতে তিন মাস কাটিয়ে (অগাস্ট থেকে অক্টোবর) তিনি যাত্রা করেন আজমীরে। কখনও ট্রেনে, কখনও গরুর গাড়ীতে করে কিছু সময়ের জন্য হেঁটে তিনি আজমীরে পৌঁছান। সেখানে আশ্রয় পান আর্য সমাজের প্রেসিডেন্ট হরবিলাস সর্দারের বাড়িতে। নভেম্বর মাসে হাজির হন শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার বাড়ি। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সাব-জজ লালশঙ্কর উমীয়া শঙ্করের বাড়িতে বেশ কিছুদিন বাস করেন। ডিসেম্বর মাসে লিমড়ি রাজ ঠাকুর সাহেব বেহেমিয়াচাঁদ-এর প্রাসাদ ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। ডিসেম্বরে জুনাগড় যাত্রার আগেই লিমড়ি রাজের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিতে ভুললেন না। কারণ পরিচয়হীন সন্ন্যাসীর থেকে রাজা/দেওয়ান/প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লিখিত পরিচয়পত্র এমন একটি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে যার সাহায্যে অন্য রাজ্যে সহজেই আশ্রয়, সাহায্য ও সম্মান পাওয়া যায়। জুনাগড়ে লিমড়ি রাজের দেওয়া পরিচয় পত্রের সাহায্যেই সেখানকার রাজ দেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারী দাসের ভবনে সহজেই আশ্রয় পাওয়া গেল (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২০৩)। এখানে তাঁর সাথে আলাপ হয় দেওয়ান অফিসের ম্যানেজার মি. এইচ. পাণ্ডিয়ার সাথে। পাণ্ডিয়ার বাড়িতেও তিনি বেশ কিছুদিন বাস করেন। কথা প্রসঙ্গে পাণ্ডিয়ার কাছে তিনি পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (EWD. 1997:1:295)।

১৮৯২ খ্রিঃ ১৮

জানুয়ারী মাসে তিনি জুনাগড় ত্যাগ করলেন। যাবার সময় জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস দেশাই-এর কাছ থেকে পরিচয় পত্র ও চিঠি নিয়ে নিলেন যাতে করে তাঁর ভুজ যাত্রা সুগম হতে পারে। তিনি ভুজ রাজ্যে গিয়ে সেখানকার দেওয়ানকে পরিচয় পত্র দেখানোর ফলে তাঁর বাড়িতেই বিবেকানন্দের থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আলাপ হয় ভুজ-এর মহারাজের সাথে। ভুজরাজ্য থেকে আবার তিনি জুনাগড়ে ফিরে

গেলেন। সেখান থেকে পোরবন্দরের প্রধানমন্ত্রীকে দেবার জন্য একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে নিলেন।

জীবনীকারদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, “ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর রাজা ও রাজ কর্মচারীদিগের সহিত এত আলাপ পরিচয় করার কী প্রয়োজন?” (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:১০৬)। এও মনে হয়েছে যে, “সন্ন্যাসজীবনের যে সর্বজনবিদিত ধারণা আছে, তাহার সহিত এই পরিচয় পত্র ব্যবহারের সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন। সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পদ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর মুখাপেক্ষী সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয় কেন?” (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:২৭৫)। গম্ভীরানন্দ নিজে প্রশ্ন তুলে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন: “স্বামীজী বলিয়াছিলেন তাঁহার মতো আর একজন থাকিলে বুঝিতে পারিত। আমরা তো কোন ছার!” (পূর্বোক্ত)।

অর্থাৎ বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে যদি কোন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগে তাহলে তাঁর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ একজন ‘বিবেকানন্দ’র মত কেউই পারে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে। তাই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা নিছক বোকামো।

জুনাগড় থেকে এপ্রিল মাসের আগেই পৌঁছলেন পোরবন্দরে। পোরবন্দরের দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ-র বাড়িতেই তিনি প্রথমে আশ্রয় নেন এবং পরিচয় পত্রের জোরে তিনি সেখানে যথেষ্ট সমাদর পান। “পোরবন্দরে তিনি ৮/৯ মাস ছিলেন এবং মহারাজের আহ্বানে রাজবাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন।” (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২১০)। এ সময়ই তৃতীয়বার পাশ্চাত্য গমনের বিষয়টি তাঁর মনে আসে। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ তাঁকে বলেন, “Swami, I am afraid you can not do much in this country. Few will appreciate you here. You ought to go to the west where people will understand you and your worth. Surely you can throw a great light upon western culture by preaching the Sanatana Dharma!” (EWD. 1997:1:295)। অর্থাৎ “স্বামীজী আমার আশঙ্কা আপনি এদেশে খুব একটা কিছু করতে পারবেন না। সামান্য সংখ্যক লোকই আপনার (কাজের)মূল্য দেবে। আপনার পাশ্চাত্যে যাওয়া উচিত, সেখানে লোকেরা আপনাকে ও আপনার মূল্যকে বুঝতে পারবে। নিশ্চিতভাবেই আপনি সনাতন ধর্ম প্রচার করার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করতে পারবেন।” শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গকে সমর্থন করে আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বিবেকানন্দকে বলেন, “সত্যই স্বামীজী, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্যদেশেই গমন করুন এবং একবার সে দেশে আগুন জ্বালিয়া আসুন—দেখিবেন, এদেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে বসিতেছে” (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২১৪)। এসব কথা শুনে খুব

স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

পোরবন্দর ত্যাগ করে তিনি যান দ্বারকায়। সেখানে আশ্রয় পান সারদা মঠে। দ্বারকা থেকে ট্রেনে করে পৌঁছান মাণ্ডবীতে। মাণ্ডবীতে তাঁর সাথে দেখা হয় গুরুভাই অখণ্ডানন্দের সাথে। এখান তাঁরা দুজনে এক বৃদ্ধা শেঠীর (ভাটিয়া) বাড়িতে আটদিন কাটিয়েছিলেন।

অখণ্ডানন্দ বিবেকানন্দের কাছে একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ান। কারণ অখণ্ডানন্দ তাঁকে ছাড়তে চাইছিলেন না এবং একসাথে ভ্রমণ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না কারণ তিনি চাইছিলেন একা একা ভ্রমণ করতে। বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই অখণ্ডানন্দকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। যখন সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন বিবেকানন্দ বলপূর্বক তাঁকে বিদায় করেন (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২১৮)। বিবেকানন্দের অন্যান্য জীবনীকারগণের বর্ণনাটি বেশ কিছুটা আলাদা। মাণ্ডবীতে অখণ্ডানন্দের সাথে ভাটিয়ার বাড়িতে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর যখন বিবেকানন্দ মাণ্ডবী ত্যাগ করছেন তখন তাঁর ভয় হয় যে অখণ্ডানন্দও তাঁর সাথে যেতে চাইবে। গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, “...স্বামীজীর ভয় ছিল, তিনি যদিও একাকী ভ্রমণের পক্ষপাতী তথাপি অখণ্ডানন্দের হস্তে ত্যাগ পাওয়া সুকঠিন। অখণ্ডানন্দেরও স্বামীজীর মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না; তাই কিছুদিন পরে যখন স্বামীজী স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন, ‘ওরে গঙ্গা, আমি একটা মতলব করেছি; তোরা কেউ সঙ্গে থাকলে সেটা কার্যে পরিণত হতে পারবে না’ এবং নিজ কথায় জোর দিবার জন্য বলিয়া বসিলেন, ‘দেখ, আমি অসৎ হয়ে গেছি, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।’ তখন অখণ্ডানন্দ প্রত্যুত্তর দিলেন, ‘হলেই বা তুমি অসৎ! আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমার চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? কিন্তু তোমার কাজে বিঘ্ন আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম; সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। এখন তুমি একলা যেতে পার’ ”(২০১২:১:২৮১)। অর্থাৎ অখণ্ডানন্দের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। এখানে বলা দরকার যে, বিবেকানন্দ অখণ্ডানন্দের সাথেই কেবল এমন ব্যবহার করেন নি, পোরবন্দরে ত্রিগুণাতীত (সারদা)-এর সাথেও প্রায় একই ব্যবহার করেছেন। পোরবন্দরে রাজপ্রাসাদে ত্রিগুণাতীত-এর সাথে আকস্মিকভাবে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়ায়, তিনি যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বলেন যে, “এভাবে অপরে তাঁর অনুসরণ করে ইহা তিনি পছন্দ করেন না (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:২৭৯)।

যাই হোক, অখণ্ডানন্দের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে মাণ্ডবী থেকে ভূজরাজ্যের দেওয়ানের আমন্ত্রণে একবার ভূজরাজ্যে যান। সেখান থেকে বরোদার গায়কোয়াড়ের

রাজধানীতে ভূতপূর্ব দেওয়ান বাহাদুর মনিভাই-এর বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য থাকেন। সেখান থেকে খাণ্ডোয়া শহরে উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ তৈরী করেন এবং তাদের বেশ কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন।

খাণ্ডোয়াতেই তাঁর মনের মধ্যে শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছা জাগে। গাজীপুর (পেনিংটন), জুনাগড় (সি.আই. পান্ডিয়া) এবং পোরবন্দর (শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ) ভ্রমণের সময়েই পাশ্চাত্য যাবার প্রশ্নটি তার সামনে আসে। কিন্তু খাণ্ডোয়াতেই সুনির্দিষ্টভাবে আমেরিকার শিকাগো যাত্রার কথাটি ভাবতে শুরু করেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো শহরে এক ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেন, “কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে এবং আমি যেতে প্রস্তুত” (EWD. 1997:1:304)। সময়টা জুন/জুলাই ১৮৯২।

তাঁর ইচ্ছা শুনে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াটি জানা যায় না। খাণ্ডোয়া থেকে বিদায় নেবার আগে হরিদাসের কাছ থেকে পরিচয় পত্রটি নিতে তাঁর ভুল হয় নি। হরিদাস বোম্বাই-এ যাবার ট্রেনের টিকিটও কেটে দিয়েছিলেন। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি বোম্বাই শহরে পৌঁছান। এখানে হরিদাসের ভাই-এর সাহায্যে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছাবিলদাসের সাথে পরিচিত হন। এবং তাঁর বিশাল প্রাসাদে সমুদ্র ভিলায় দুই মাস (জুলাই শেষ-সেপ্টেম্বর শেষ) অবস্থান করেন [শুদ্ররূপানন্দ। ২০০৫:৬৯৩/প্রকাশিত সর্বগানন্দ(সম্পাদিত) উদ্বোধন, ২০০৫, সেপ্টেম্বর (১০৭) কলকাতা: উদ্বোধন]।

বোম্বাই থেকে পুণা ভ্রমণ করে তিনি যান কোলহাপুর। কোলহাপুরে তিনি কাটান (৫-১১ অক্টোবর) রাজার ‘খানগী কারভারী’ বা ব্যক্তিগত সচিব শ্রীযুক্ত গোলভালকার এর বাড়িতে। কোলহাপুরে আসার সময় তিনি ভাবনগরের দরবার থেকে কোলহাপুরের দরবারের নামে একটি চিঠি করিয়ে এনেছিলেন। জি.এস. ভাটে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “একদিন সকাল ছটা নাগাদ আমার বাবার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত গোলভালকার-এর একটি চিঠি নিয়ে তিনি [বিবেকানন্দ] আমাদের বাড়ি [বেলগাঁওতে] এসেছিলেন। ...স্বামীজী যে দিন আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এলেন, সে দিন থেকেই পরপর ছোটখাট এমন কতগুলো ঘটনা ঘটতে লাগল যার ফলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাই আমূল পাল্টে গেল। প্রথমেই ধরা যাক তাঁর পোশাকের কথা। যদিও গেরুয়াই

পরতেন তবু অন্যান্য সন্ন্যাসীদের পোশাকের সাথে তাঁর পোশাকের কোন মিল ছিল না। তিনি ‘বেনিয়ান’ বা ‘ফতুয়া’ পরতেন। সন্ন্যাসীরা সচরাচর দণ্ড ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি নিতেন কতকটা ছড়ির মতো লম্বা লাঠি” (ভাটে। ২০১২:৫৩-৫৪)। স্ম- আ.বি. — প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহীগণ)। ভাটে বিবেকানন্দের পোশাক বা ইংরাজী বলা দেখেই কেবল চমকে যান নি, চমকে ছিলেন তাঁর পান-সুপুরি-তামাকের প্রতি আকর্ষণ দেখেও। ভাটে লিখেছেন, “প্রথম দিন খাওয়া দাওয়ার পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন একটু পান ও সুপুরি পাওয়া যায় কি না। ঠিক সেই দিন বা তার পরদিন তিনি দোস্তা চাইলেন। ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখুন। আমাদের মতো সাধারণ লোকের ধারণা, সন্ন্যাসী এইসব জাগতিক ছোটখাট কামনা-বাসনার বহু উর্দে। তাই সচরাচর যা হয় আমরাও ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম একি রে বাবা! এ আবার কোন ধরনের সন্ন্যাসী!” (পূর্বোক্ত:৫৪)। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ কিন্তু ভাটেদের বুঝিয়ে দিলেন, পান তামাক খাওয়া সন্ন্যাসীদের দোষের নয় এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ে সন্ন্যাসীদের কোন বাছবিচার করতে নেই। সুতরাং আমিষ-নিরামিষ সবই চলতে পারে।

অবশেষে পৌঁছলেন সাবডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাড়িতে। সেখানে থাকেন নয় দিন। তারিখটি হল ১৮ অক্টোবর, ১৮৯২। হরিপদ মিত্রের বাড়িতে থাকাকালীন কয়েকটি কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এখানে উল্লেখ করা হল—

১. তামাকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতই তীব্র ছিল যে তাকে তিনি কখনই গোপন করতে পারতেন না। হরিপদ মিত্র তাঁকে ছঁকো খেতে আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “তামাক-চুরুট — যখন যা পাই, তখন তাই খেয়ে থাকি, আর আপনার ছঁকায় খেতে কিছুই আপত্তি নেই” (মিত্র, হরিপদ। ২০১২:৬৯)।

২. “সেই সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করবেন না” (পূর্বোক্ত : ৭৬)। কিন্তু এ ব্রত পালনে তিনি সফল হননি। কারণ শিকাগো যাবার অর্থ তাঁকে নিতে হয়েছে এবং আমেরিকায় টাকাও রোজগার করতে হয়েছে।

৩. হরিপদ মিত্রকে বিবেকানন্দ বলেন যে, সন্ন্যাসীকেও বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলতে হয় (পূর্বোক্ত:৭৮)। কিন্তু ঘটনা হল, তিনি নিজে কখনই এই ধরনের বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলেন নি।^১ যেমন বেলগাঁও বাসের পঞ্চম দিনে তিনি হরিপদ মিত্রকে বলেন, “সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে একদিনের বেশি থাকতে নেই” (পূর্বোক্ত:৭৩)। ২০ অক্টোবর, ১৮৯২-এ একথা বলেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে বা পরে বহু স্থানেই বিশেষ করে রাজা দেওয়ান ও বড়লোকদের প্রাসাদ, অটালিকায় তিনি তিন দিন কেন, তিন মাসেরও বেশি বাস করেছেন। যেমন— খেতড়িতে (তিন

মাস), পোরবন্দরে (৮-৯ মাস) মাণ্ডবীতে ভাটিয়ার বাড়িতে (আট দিন), ছবিলদাসের সমুদ্রভিলায় (দুই মাস) তিন দিনের অনেক বেশিই কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে।

৪. হরিপদ মিত্রের বাড়িতে তিনি নয় দিন কাটিয়েছিলেন। ফলে হরিপদ মিত্রকে অনেক কিছুই দেখতে হয়েছিল। তিনি বিবেকানন্দের প্রতিভায় যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন তেমনি ব্যতিক্রমী আচরণেও হয়েছিলেন হতবাক। হরিপদ মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “লক্ষা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিঞ্জাসায় একদিন বলেছিলেন, ‘পর্যটন কালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানা প্রকার দূষিত জল পান করতে হয়; তাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরম প্রভৃতি নেশা করে থাকে। আমি সে জন্য এত লক্ষা খাই।’” (পূর্বোক্ত: ৭৯)। এই প্রথম জানা গেল যে গাঁজা, চরস, লক্ষা ইত্যাদি দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করে।

৫. অনেকের মত হরিপদ মিত্রের মনে হয়েছিল যে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ রাজা, মহারাজা, বড়লোক, দেওয়ান, মন্ত্রীদেবের সাথে কেন এত মেলামেশা করতেন। একদিন তিনি বিবেকানন্দকে এ-এ-এ করেও ফেলেন। উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন, “হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়ে সংস্কার করতে পারলে যে ফল হবে, একজন শ্রীমান রাজাকে সেই দিকে আনতে পারলে তদপে ১ কত অধিক ফল হবে ভাব দেখি। গরিব-এজার ইচ্ছা হলেও সংস্কার করবার মতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র এজার মঙ্গল বিধানের মতা পূর্ব থেকেই রয়েছে, কেবল তা করবার ইচ্ছা নেই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে একবার তার মধ্যে জাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীন সকল এজার অবশ্য ১ ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে। পূর্বোক্ত ৭৯। এখন এ হল তিনি এইসব দেশীয় রাজাদের সাথে মিশেছিলেন কেন? এজার মঙ্গলের জন্য না কি অন্য কোন লে? ভগ্নীত্রি নকে তিনি এই-এসঙ্গে একটি কারণের উল্লেখ করেন। তিনি বলে, “বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি শালী জোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। ১৪০৭ বাংলা ২। কিন্তু তাঁর পরিব্রাজনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বিবেকানন্দের এই দাবী কতদূর সঙ্গত বলে মনে হতে পারে? বরং পাশ্চাত্য বা শিকাগো যাত্রার পাথেয় সংগ্রহই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। হরিপদ মিত্রকে বলা কথা থেকে আবার মনে হতে পারে যে, জনকল্যাণই ছিল তাঁর

উদ্দেশ্য।

৬. ১৮৯১-এ তিনি সি.এইচ. পাভিয়ার কাছে পাশ্চাত্য যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরও সুনির্দিষ্ট করে শিকাগো যাবার প্রস্তাব তিনি ১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে হরিপদ মিত্রর কাছে করেন। তিনি বলেন, “...শিকাগোয় ধর্মসভা হবে, যদি তাতে যাবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাব” (মিত্র, হরিপদ। ২০১২:৭৬)। সে সময় শিকাগো যাত্রাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তিনি রাজা মহারাজাদের সাথে মেলামেশা করতেন। আতিথ্য গ্রহণ করতেন, খাওয়া দাওয়া করতেন এবং দীক্ষা দিতেন। আবার সেই তিনিই সময় বুঝে বলতেন, “সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ” (গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথনাথ। ২০১২:১১৬। পূর্ণাত্মানন্দ স্মৃতির আলোয়)।

২৭ অক্টোবর বিবেকানন্দ হরিপদ মিত্রর বাড়ি ছেড়ে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মহীশূরের রাজার দেওয়ান স্যার কে. শেখাদ্রি আয়ারে সাথে তাঁর পরিচয় হল। শেখাদ্রির মধ্যে দিয়ে তিনি মহীশূর রাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। মহীশূর থেকে তাঁর কারুকার্যখচিত হুকো, ট্রেনের টিকিট কেটে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করিয়ার কাছে বিবেকানন্দের একটি পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়। ট্রেনে করে তিনি কোচিনে যান এবং কয়েকদিনের জন্য সেখানে ঘুরে বেড়ান। কোচিনে তিনি ভালো আশ্রয়ই পেয়েছিলেন। কোচিনরাজের দেওয়ান মি. ডবলিউ রামাইয়া একজন পিয়নকে বিবেকানন্দের সাথে পাঠিয়েছিলেন ত্রিবাঙ্কুরে সুন্দররমণ আয়ারের কাছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজের ভাইপোর শিক্ষক সুন্দররমণ আয়ার বিবেকানন্দকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। সময়টা ডিসেম্বর মাস। সুন্দররমণ আয়ারের বাড়িতে তিনি নয় দিন থাকেন।

আয়ারের বিশিষ্ট বন্ধু রামারাও-এর বাড়িতে বিবেকানন্দ আয়ারের সাথে গিয়েছিলেন। সেখানে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, “চঞ্চল, অসংযত ইন্দ্রিয়দের বশে এনে ভগবানের দিকে মনের গতি ফেরাতে হলে, যদি দরকার পড়ে তো, এমন চরম উপায়ও আমাদের অবলম্বন করতে হবে” (কে. সুন্দররাম। সুন্দররমণ আয়ার। ২০১২:৬৮ স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ)। কী আশ্চর্য, ইন্দ্রিয়দের বশে আনার জন্য তিনি চরম উপায়ের কথা বললেও নিজ কতটা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যেমন, এই সুন্দররমণের বাড়িতে নিরামিষ রান্না খেতে খেতে তিনি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিন/চার দিনের মধ্যেই মাদ্রাজের তদানীন্তন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল সহকারী মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ি খোঁজ করতে থাকেন, কারণ সেখানে মাছ-মাংস পাওয়া যেতে পারে।

“তখন থেকে স্বামীজীও [বিবেকানন্দ] প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভট্টাচার্যমশাইয়ের সঙ্গেই কাটাতে লাগলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া ও তাঁরা একসঙ্গে সারতেন। একদিন আর থাকতে না পেরে অন্য এক অতিথির সামনেই আমি [সুন্দররমণ আয়ার] অনুযোগ করে বসলাম” (আয়ার। ২০১২:৬৮ স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ)। বিবেকানন্দ তাঁর উত্তরে জানান যে মন্মথনাথ তাঁর সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আসল কারণটি হল, “বহুদিন তিনি মাছটাছ খাননি। কারণ এই দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণকালে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের বাড়িতেই বেশি উঠেছেন, আর তাদের তো আমিষ আহার নিষিদ্ধ। তাই বঙালী রসনার উপযুক্ত বস্তুর সন্ধান যখন মিলেছে, তখন তা তিনি সদ্যবহার করতে চান” (পূর্বোক্ত)।

প্রায় একই ধরনের কাজ তিনি এর আগেও করেছিলেন। জুনাগড়ের দেওয়ান “হরিদাস বিহারিদাসের নড়িয়ার গ্রামে বা নগরে স্বামীজী ঘুরিতে ঘুরিতে যান এবং অল্পদিন থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় হরিদাস বিহারিদাস থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সাধু থাকিবে, দুইবেলা দুই মুঠো ভাত খাইবে এইরূপ তার প্রথমে অনুমতি দিয়াছিলেন—বিশেষ আলাপ বা ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুই নাই। গুজরাট বা সিন্ধুদেশের আহারাদি বাঙালীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক, ডাল সিদ্ধ করিয়া শিলে বাটিয়া হাঁড়ির জলে মিশাইয়া দেয় ও একটু মশলা ও ঘি দিয়া পাতলা জলের মত ডাল খায়। তরকারি নাম মাত্র। ভাত আর ঘি” (দত্ত, মহেন্দ্র। ২০১১:২:১২২)। এই কষ্টদায়ক খাবার বিবেকানন্দের সহ্য না হওয়ায়, তিনি পাচকের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর পছন্দমত খাবার পাচককে দিয়ে করিয়ে নেন (পূর্বোক্ত)।

ত্রিবাঙ্গমে সুন্দররমণ আয়ারের বাড়ি ছেড়ে তিনি ২২ ডিসেম্বর বেরিয়ে পড়েন কন্যাকুমারীর দিকে। এ সময় তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে। এই কন্যাকুমারী যাত্রা নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ বসু বিবেকানন্দের সাঁতার কেটে মা কুমারীর মন্দিরে যাওয়ার কথা বলেন নি (২০১১:১:২৬৩)। কিন্তু রামস্বামী শাস্ত্রী ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩:৩৬৫) লিখেছেন, “১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ত্রিবাঙ্গম হইতে কেপ কোমরিন (কন্যাকুমারী) যান। ...সমুদ্র হাঙ্গরে পূর্ণ ছিল; নৌকা করিয়া রকে (বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড) লইয়া যাইবার জন্য মাঝি এক আনা চাহিল; কিন্তু স্বামীজী কপর্দকশূন্য ছিলেন। অতএব সাহস ভরে সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক রকে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে জগন্মাতা কন্যাকুমারীর আনন্দময় মূর্তির ধ্যানে ও জন্মভূমি ভারতমাতার গভীর চিন্তায় রাত্রি যাপন করিলেন” (গভীরানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত। ২০১২:১:৩১৬)।

ইংরাজী জীবনীতে একই বর্ণনা পাই (EWD. 1997:1:340-41)। গম্ভীরানন্দও যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও শাস্ত্রী ও EWD-র সদৃশ। সমস্যা হল শেষ তিন লেখকেরা এটা লক্ষ্য করেন নি যে মা কুমারীর মন্দিরটি মূল ভূখণ্ডেই অবস্থিত, কোন সামুদ্রিক দ্বীপের মধ্যে নয়। আর এই সাঁতার কাটার গল্পটি বিবেকানন্দের চিঠিতেও (মার্চ ১৯, ১৮৯৪) পাওয়া যায় না। তাছাড়া বিবেকানন্দের সাথে ছিলেন মনমথ ভট্টাচার্য। ফলে নৌকা ভাড়ার অভাবে তাকে সাঁতার কাটতে হল এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে ড. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণটি উল্লেখযোগ্য, “১৮৮৯ থেকে বিবেকানন্দ তাঁর কোমরে বাতের জন্য বড় একটা হাঁটতেই পারতেন না। তাই তাঁর পক্ষে সাঁতার দেওয়া কঠিন ছিল। এছাড়া ডিসেম্বরের শেষে তাঁর হাতে সময় কমই ছিল, কারণ ইতিমধ্যে তিনি শিকাগো যাবেন ঠিক করেছেন অথচ যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় হয়নি। সাঁতার কেটে দ্বীপটিতে গেলে তাঁকে কৌপীন পরেই ঝাঁপ দিতে হত। প্রধান ভূখণ্ডে জামাকাপড় ফেলে এসে তিনি ওই দ্বীপে সময় কাটাবেন এটি অবিশ্বাস্য মনে হয় এই কারণেও” (২০০৭:৭৭)।

কন্যাকুমারী থেকে বিবেকানন্দ রামেশ্বরের দিকে যাত্রা করেন। রামেশ্বরে যাওয়ার পথে ২৯ ডিসেম্বর রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সাথে তিনি দেখা করেন। এখানে তিনি একটি পরিচয় পত্রের সাহায্যেই রাজার সাথে যোগাযোগ করেন। বিবেকানন্দ রামনাদের রাজা সেতুপতিকে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় মহিমা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সেতুপতি তখন তাঁকে শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন এবং অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:৩২১ এবং EWD. 1997:1:345)। বিবেকানন্দের নিজের বক্তব্যটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বাণী ও রচনায় পাই : “... আমাকে (বিবেকানন্দকে) চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার (ভাস্কর সেতুপতি) মনেই প্রথম উদ্ভূত হয়। তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বারবার উৎসাহিত করেন” (বিবেকানন্দ। ২০১২:৫:২৬)। লক্ষ্য করার বিষয় হল— ১৮৯২-এর জুলাই মাসে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও ঐ বছরেই অক্টোবর মাসের শেষের দিকে বেলগাঁওতে হরিপদ মিত্রের কাছে বিবেকানন্দ নিজেই শিকাগো ধর্মসভায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে বিবেকানন্দকে “চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা” ভাস্কর সেতুপতির মনেই প্রথম উদ্ভূত হয় এ বক্তব্যটি বোধহয় ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দই পাশ্চাত্য যাবার কথা সেতুপতিকে বলেন, সেতুপতি তা শুনে তাঁকে শিকাগো যাবার কথা বলেন। ফলে পাশ্চাত্য বা শিকাগো যাত্রার বিষয়টি আগে থেকেই বিবেকানন্দের মাথায় ছিল, সেটা আর আলাদা করে কাউকে ঢুকিয়ে দিতে হয়নি।

১৮৯৩ খ্রিঃ ১৮

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী, বিবেকানন্দ মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সাথে পন্ডিচেরীতে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে মন্মথনাথ তাঁকে মাদ্রাজে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। এখানে তিনি দুই মাস কাটান। অর্থাৎ ‘তিন দিনের বেশি সন্ন্যাসীর কোথাও না থাকা’র ব্রতটি তাঁর আবার ভঙ্গ হল। প্রকৃতপক্ষে এ সময় শিকাগো যাবার ভাবনা ছাড়া তাঁর মাথায় আর যেন কিছুই ছিল না। মন্মথনাথ ভট্টাচার্যই তাঁর প্রভাব খাটিয়ে মাদ্রাজে বিবেকানন্দের একটি স্থান করে দেন। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল বিবেকানন্দের বাগ্মীতা ও প্রতিভা।

মাদ্রাজের ট্রান্সলিগেন লিটারেরি সোসাইটির ভূমিকাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সোসাইটির বিভিন্ন সভায় তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এই বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচারের প্রয়োজনে শিকাগো ধর্মসভায় তিনি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২৮৪)। ফলে মাদ্রাজের জনসমাজে তিনি যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন। এই সমিতিই তাঁকে আমেরিকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সোসাইটির কয়েকজন প্রধান তরুণ সদস্যের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাদের মধ্যে আলাসিন্দা পেরুমল, ভেক্টরারঙ্গ রাও, বালাজী রাও, নরসিমাচারী প্রমুখ। মন্মথনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং এইসব তরুণদের সাথে বিবেকানন্দের পরিচয় ঘটিয়ে দিলে উপস্থিত এই যুবকেরা বিবেকানন্দের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ১৫/২০ জন যুবক সুপ্রামানিয়া আয়ারের বাড়িতে বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তাব দেয়। বিবেকানন্দ সম্মত হলেন। ফলে যুবকের দল উৎসাহের সাথে চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। আমেরিকা ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই অর্থ ছিল খুবই কম। তাই তিনি, সেই অর্থ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলেন (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২৮৫)।

ফলে তাঁকে আবার বেরিয়ে পড়তে হল। এবারে গম্ভ্যস্থল হায়দ্রাবাদ। সেখানে ১১ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী তিনি কাটালেন রাজ ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চ্যাটার্জীর আশ্রয়ে। মন্মথনাথ ভট্টাচার্যই এই যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদে তিনি নবাব, দেওয়ান, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সামাজিক উচ্চবর্গের মানুষদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করেন। কারণ আমেরিকা যাবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ কেবল এরাই দিতে পারে। এখানে তাঁর একটি বক্তৃতার শিরোনামই ছিল “আমার পাশ্চাত্য দেশে গমনোদ্দেশ্য”। নবাব, শেঠ প্রমুখও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, শিকাগো যাবার যাবতীয় খরচ তাঁরা বহন করবেন (বসু, প্রমথনাথ। ২০১১:১:২৮৯)। বিবেকানন্দ কিন্তু

তাঁদের প্রতিশ্রুতির উপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারেন নি। অর্থ সংগ্রহের ব্যর্থতা তাঁর মধ্যে এত তীব্র হতাশার সৃষ্টি করেছিল। তাই হায়দ্রাবাদ থেকে আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে (২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩) লিখেছেন, “...আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল; আর এই জন্যই আমি গোড়াতেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় পেতাম। ... আমার মতলব ছিল, আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭: ৫৭-৫৮)। যেহেতু তিনি ‘নতুন’ কোন রাজাকে ধরতে পারলেন না, তাই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হল মাদ্রাজে। মাদ্রাজে তাঁর প্রধান সহায় হলেন মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এবং মাদ্রাজের কয়েকজন যুবক। আলাসিঙ্গা, বালাজী রাও প্রমুখ মাদ্রাজী যুবকের মধ্যে তিনি হিন্দু গরিমা বৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী হিন্দু ধর্মের আধিপত্যের আধ্যাত্মিক বিজয়রথ ছোটানোর ভাবনাটি দৃঢ়মূল করে দিতে সক্ষম হন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আলাসিঙ্গা, বালাজী সহ মাদ্রাজী যুবকদের একাংশ এই ধর্মান্ধিত জাতীয়তাবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন— তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশ উপনিবেশের বাসিন্দা হওয়ায় প্রতিক্ষণে যে অপমানকর অবস্থার মুখোমুখি তাঁরা হচ্ছিলেন, তার যোগ্য জবাব দেবার একটি পথ তাঁরা খুঁজে পেলেন বিবেকানন্দের শিকাগো যাত্রার মধ্য দিয়ে, হিন্দু ধর্মের কণ্ঠ শ্বেতকায়দের কানে পৌঁছে দেবার মধ্য দিয়ে। তাঁরা বলতে চাইলেন আমরা আছি, আমরা হীন নই, অধম নই, কোন অংশে শ্বেতকায়দের থেকে কম নই। বিবেকানন্দ তাদের সামনে বেদান্তকে উপস্থিত করে, হিন্দু অতীতের চর্চা করে এই অহঙ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন অসাধারণভাবে। ফলে আলাসিঙ্গা সহ যুবকবৃন্দ বাঁপিয়ে পড়েছিল শিকাগো যাত্রার জন্য অর্থসংগ্রহে। মার্চ ও এপ্রিল মাস জুড়ে চললো এই অর্থ সংগ্রহ।

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে খেতড়ি রাজা অজিত সিংহ পুত্রসন্তান লাভ করায় এক উৎসবের আয়োজন করেন। খেতড়ির রাজা প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহনকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেন বিবেকানন্দকে খেতড়িতে নিয়ে আসার জন্য। বিবেকানন্দ প্রথমে তাঁর সাথে খেতড়ি যেতে রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত খেতড়ির উৎসবে যোগদান করেন। জগমোহনের সাথে বিবেকানন্দ খেতড়ি ত্যাগ করেন ১০ মে। বিবেকানন্দের এই খেতড়ি যাওয়ার পিছনে প্রধান যে চাকা কাজ করেছিল তা হল অর্থ। কারণ তিনি কারোর উপরই ভরসা করতে পারছিলেন না। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেছিলেন যে, আলাসিঙ্গা, বালাজী রাওরা চাঁদা সংগ্রহে যতই উদ্যোগী হোক না কেন তা শিকাগো যাত্রার জন্য যথেষ্ট হবে না। (পূর্বে মাত্র ৫০০ টাকা চাঁদা উঠেছিল)। তাই

একই সাথে তিনি রামনাদ, মহীশূর ও খেতড়ির রাজাকে অর্থ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন। যদিও রামনাদের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ রক্ষা করেন নি। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁকে ১০,০০০ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে দিয়েছিলেন মাত্র ৫০০ টাকা (Chattopadhyaya 1999:196)। যদিও খেতড়ির রাজা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন প্রাণভরে। বন্ধুবর মন্মথনাথ ভট্টাচার্য দিয়েছিলেন ৫০০ টাকা। বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অনুদান ছিল ৫০০ টাকা। মহীশূর রাজের সাহায্যের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি ১৫০০ টাকা। খেতড়ির রাজার প্রতিনিধি জগমোহন তাঁকে তিন হাজার টাকার সার্কুলারি নোট ছাড়াও জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। এর সাথে ছিল বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রের আলখাল্লা ও পাগড়ী। অবশেষে ৩১ মে, ১৮৯৩ পেনিনসুলার নামক স্টীমারে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। প্রমথনাথ বসু লিখেছেন, “...তিনি একটি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ ও গৈরিক পাগড়ী পরিধান করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে বেশে তাঁহাকে একজন দেশীয় রাজা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল” (২০১১:১:২৯৮)।

ভারতে সমাজপরিবর্তনের রূপরেখা

সুনীল কুমার রায়

অস্তিত্বের মারাত্মক সংকটের মধ্যেই ছিল আদিমযুগের মানুষ। ক্ষুধা, বন্যজন্তু, রোগ-ব্যাদি আর মৃত্যুর ভয় তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। আবার, কার্য-কারণের সম্পর্কটিও তাদের তখনও অধিগত ছিল না। তাই তাদের অবিকশিত চেতনায় ভীতি-বিহ্বলতার রন্ধ্রপথে কিছু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেব-দেবী অনুপ্রবেশ করেছিল।

"With primitive man it was above all fear that evokes religious notions--fear of hunger, wild beasts, sickness, death. Since at this stage of existence understanding of causal connections is unuslly poorly developped, human mind creates illusory beings, more or less amalogueous to itself on whose will or actions these fearful happenings depend." Albert Einstein, Ideas and Opinions: Religion and Science, p. 37]

এইসব দেব-দেবী নিয়ে কল্পনাবিলাসে মত্ত হওয়ার মত সময় ও সুযোগ অবশ্য সেই মানুষদের হাতে ছিল না। অস্তিত্বের আবশ্যিক স্বার্থে সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের নিরন্তর বাধ্যতা কেবলই তাদের তাড়া করে ফিরত। ক্ষুধার নিবৃত্তি, নিরাপদ আশ্রয়, বেদনার উপশম আর শীতের নিদান উষণতার সন্ধানে তাদের ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। তাদের অনলস কর্মপ্রয়াসের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল ক্রমোচ্চ স্তরের সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ পাথরের অস্ত্র, পাহাড়ের নিরাপদ গুহা-আবাস, গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরি ব্যথা-যন্ত্রণা-ক্ষতের নিরাময়কারী ওষুধপত্র, দু'খণ্ড চকমকি পাথরের ঘর্ষণে প্রয়োজনোচিত সময়ের আগুন এবং লোমশ জন্তুর চামড়ার পোশাক। অর্থাৎ মানুষের রুঢ় প্রয়োজনের তাগিদ এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের সৃজনশীলতাকে অর্গলমুক্ত করে দিয়েছিল।

"Everything that the human race has done and thought is concerned with the satisfaction of deeply felt needs and assuagement of pain. ... Feeling and longing are the motive force behind all human endeavour and human creation ..." [Do, p.36]

সেই সময় সকলে সমান কর্মোদ্যোগী এবং কর্মের সাফল্যে সকলেই সমান উৎফুল্ল হলেও ব্যর্থতার নৈরাশ্যে সকলেই একমাত্রায় গ্রস্ত হয়নি বলেই তাদের অনেকে

ব্যর্থতাকে বৃহত্তর সাফল্যের সোপানরূপে ব্যবহার করে পরিবর্তিত পদ্ধতির কর্মপ্রচেষ্টায় সকলকে সামিল করত। পুনঃপ্রচেষ্টার সাফল্যের অভিজ্ঞতায়ও তারতম্য ঘটত— পূর্বেকার হতাশাগ্রস্তদের অনেকে অধিকতর উদ্যমী হয়ে উঠত এবং দিশারীদের কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থে কার্য-কারণের সম্পর্কের বিষয়টিকে কুক্ষিগত করে রেখে যান্ত্রিকভাবে কর্মসম্পাদনকারীদের আঙা বাহীর স্তরে আবদ্ধ রাখতে চাইত যদিও অনের্যা সকলেই তখন বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত কর্মপন্থার নিবিড় সম্পর্কটি সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে যৌথ কর্মোদ্যোগে গতিসঞ্চার করতেই ব্যস্ত থাকত। বিফলতা ও সফলতার জটিল এক ভাঙা-গড়ার দীর্ঘ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সমাজবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছিল।

এইভাবে পুরুষানুক্রমে সৃষ্টিকর্মজাত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত কর্মপদ্ধতি পরিশীলনধর্মী সঞ্চয়নের গুণে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত তাই মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বৌদ্ধিক অস্ত্ররূপে ক্রমেই শানিত হয়ে উঠেছিল।

"Clearly one of the major factors in man's biological survival has been the additive or accumulative character of objective knowledge and rational technique" [Wibber E. Moore, Social Change, p. 122, PHI(1981)]

বৌদ্ধিক এই অস্ত্রটি সমাজবিকাশের স্বাভাবিক গতিপথ নির্ধারণের এবং সম্মুখস্থ বাধা-বিপত্তি অপসারণের পদ্ধতি নির্দেশ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই নির্দেশিকাই ছিল যুক্তিবাদের প্রারম্ভিক স্তর। এই স্তরেই তার প্রয়োগকুশলতা সমগ্র সমাজকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু অগ্রণী স্রষ্টাদের চেতনায় কার্য ও কারণের আন্তঃসম্পর্ককে এমন স্পষ্টভাবে মেলে ধরেছিল যে তাদের দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার ধারণাটি স্বেচ্ছা উবে গিয়েছিল এবং ততদিনে খাদ্যসংগ্রাহকদের যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ খাদ্যোৎপাদক কৃষিজীবীরূপে গৃহবাসী হয়েছিল।

ধান, গম, যব প্রভৃতি বন্যঘাসের বীজকে পোষ মানিয়ে প্রতিবছর একাধিকবার চাষযোগ্য শস্যবীজে পরিণতির জীবপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে সম্পাদিত এক অনন্য কর্মপ্রয়াসের অভীষ্ট ফলশ্রুতি। এই অসাধারণ কর্মপ্রয়াসের ঈঙ্গিত সাফল্য মানুষকে প্রবৃত্তিনির্ভর খাদ্যসংগ্রাহক থেকে কুশলী খাদ্যোৎপাদকের স্তরে উন্নীত করে পৃথিবীর বৃকে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল।

কৃষি ও তার অনুযঙ্গী কুটিরশিল্পের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে আসা উদ্যমী মানুষেরা এখন থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে মেহেরগড়ের মাটিতে সর্বপ্রথম কৃষি সভ্যতার সূচনা করেছিল। তারপর কতকগুলি অন্তর্বর্তী স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলের হল-কর্ষণজাত কৃষিতে বিপুল পরিমাণে উদ্ভূত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে পৃথিবীর বৃহত্তম এবং অনেক ক্ষেত্রে মহোত্তম তাম্র-প্রস্তর নগর সভ্যতায় তার উত্তরণ ঘটেছিল। এটি সিদ্ধুসভ্যতা বা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত।

"The earliest are the pre-Harappan Cultures; the Sothi Culture of the Saraswati Valley and the Chalcolithic village sites of Baluchistan and Sind. These were the precursors of the Harappa Culture(C2300-1750BC) which extended from southern punjab and Sind to the Narmada delta largely following the coastal region and eastwards as far as the upper Ganga/Yamuna doab." [Romila Thapar, Cultural Pasts:Society in Ancient India: The Formative Period, p. 311]

কৃষি সভ্যতার বিকাশের সূত্রে জমি তৈরি, বীজবপন, চারাগাছের পরিচর্যা, সেচদান, পাকা ফসল কেটে আনা, সশ্যাদানা ঝাড়া ও সংরক্ষণ করা বা রান্নার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে কৃষক পরিবারের নিরঙ্কুশ ভূমিকা প্রশ্নাতীত; কিন্তু কৃষির উপকরণ লাঙ্গল, কোদাল, কুড়ল, মই, কাস্তেহ হেসো, কাটারি, নিড়ানি ইত্যাদি, কৃষক পরিবার ঘরদোর এবং সংসারজীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় মরাই, ধমা, কুলো, ঝুড়ি, টেকি, যাঁতা, হাঁড়ি, কলস, থালা, গেলাস, গাডু, পরনের কাপড়, গামছা, চাদর, বিছানা ইত্যাদি প্রস্তুতকারকদের এবং গরু-মোষ পালকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বাদ দিয়ে উন্নত কৃষিনির্ভর সমাজের কল্পনাও করা যায় না।

তাছাড়া, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু পেশায় যুক্ত মানুষদের সংযোগ ও সমন্বয়-সাধন, তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিনিময় অথবা বিপণনের ব্যবস্থা এবং উদ্ভূত পণ্যাদি বহির্দেশীয় বাজারে প্রেরণ ইত্যাদি অত্যাৱশ্যক কাজকর্মের দায়িত্ব পালনে সক্ষম প্রশাসক, বণিক, নাবিক, ব্যবসায়ী, জাহাজনির্মাতা, কারিগর প্রভৃতি পেশাদারদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে সভ্যতা নামধেয় উচ্চস্তরের সমাজে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। অর্থাৎ কৃষি সভ্যতার অস্তিত্বের ও অগ্রগতির স্বার্থে অনিৱ্যভাবে সামাজিক শ্রমের বিভাজন ঘটে। তার ফলে সমপেশার মানুষদের চিন্তা-ভাবনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, পেশাগত কর্মের জন্য পালনীয় কতকগুলি রীতি-নীতি, পূর্বসূরীদের কর্মকুশলতার প্রতি গর্ববোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি

সেই সমাজে অনেক পেশাগত জাতিও সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার বিষয় শুধু এই যে, সেই কালে পেশাগত জাতিগুলি শ্রমঘণার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল না। সব জাতির মানুষেরাই তখন সমগ্র সমাজের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গরূপে বিবেচিত হত।

স্বাভাবিক কারণে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার প্রথম দিকে সব জাতির মানুষই সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে অনেকে একাধিক পেশায় দক্ষতা লাভ করত। বিভিন্ন পেশায় পারদর্শিতা লাভের প্রবণতা কৃষক সন্তানদের মধ্যেই ছিল সর্বাধিক। তার কারণ, কৃষিকাজ যতটা যান্ত্রিক ততোধিক সৃজনশীল। জমির মাটির প্রকৃতি, অবস্থান ও উর্বরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান, বীজবপন, চারাগাছের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, ফল ধরা, পুষ্টিলাভ ও ফসল কাটার মরশুমের ক্রমোপযোগী আবহাওয়ার ধারণা এবং প্রতিক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সচেতন থেকেই কৃষককে এমন ফসল নির্বাচন করতে হয় যাতে একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল অধিক পরিমাণে ফলান যায়। সুতরাং কৃষিপ্রগতি প্রযুক্তির উন্নতি ছাড়াও কৃষকের শ্রমকুশলতা এবং বৌদ্ধিকচর্চার মিলনক্ষেত্র বেড়ে ওঠা কৃষক-সন্তানদের অন্যান্য শ্রমকুশল পেশায় নৈপুণ্যলাভের স্পৃহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার ফলে তাদের বহু-কর্মজাত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এবং যুক্তিসঙ্গত কর্মপদ্ধতিসমূহ পরিশীলনধর্মী, সঞ্চয়নের গুণে তাদের এমন বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ঘটিয়ে দিয়েছিল যে তারা নগর পরিকল্পনা, মৌসুমী বায়ুর দিক পরিবর্তন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি দিন-তারিখ সম্পর্কিত জটিল অঙ্কগণনার অর্থাৎ সৌরপঞ্জিকা রচনার দূরহৃদ বিদ্যাকে অধিগত করে ফেলেছিল।

"In ancient agricultural societies, apart from agricultural technology, another factor of ...consequence would be the knowledge of calender...the solar calendar was more efficient in its application to agriculture. The discovery and use of the solar calendar would require more advanced knowledge of mathematics and astronomy. A basis of mathematical knowledge must be assumed in order to explain the construction of the Harapan cities."[Do, p-315]

মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, ধোলাভিরা, লোথাল প্রভৃতি বিশাল বিশাল পরিকল্পিত নগর-বন্দর প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘকালব্যাপী তাদের স্থায়িত্ব, মেসোপটেমিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত নিয়মিত নৌ-বাণিজ্য, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিপুল পরিমাণে বিবিধ প্রকারের শস্যোৎপাদন এবং নগরগুলির পরিপোষণ ইত্যাদি একান্তভাবেই সিদ্ধসভ্যতার অগ্রণী স্রষ্টাদের সৌরপঞ্জিকা রচনার সহায়ক উন্নত অক্ষ ও জ্যোতির্বিদ্যায়

কুশলতার সাক্ষ্য বহন করছে।

সিন্ধুসভ্যতার বিকাশের উচ্চস্তরে দুর্লভ বিদ্যার অধিকারীদের একাংশ তাদের অর্জিত বিদ্যাকে গুপ্তভাবে ব্যবহার করে প্রশাসনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল;

"The appropriation of such knowledge (i.e. knowledge of solar calendar) by certain groups may well have given them access to power and influence:[Do, p-316]

তবে তাদের বৃহদাংশ সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাদের অধিগত বিদ্যাকে প্রয়োগ করার সংকল্পে অটল থাকায় প্রশাসকের দল দুপা পিছিয়ে এক পা এগোনের পথ ধরে। অতঃপর তারা ঋতুগণনা ইত্যাদি কর্ম প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে এনে ফেলে এবং তার ফলে প্রশাসকদের গণ-সংযোগ বৃদ্ধি পায়। যে সব মানুষ কার্য-কারণের নিরিখে সবকিছু বিশ্লেষণ করার চেয়ে কৃষির আদিম স্তরে জমির ফলন ও মানবীয় প্রজননের সাযুজ্যে গড়ে ওঠা তন্ত্রাচারকে অর্থাৎ উর্বরতার দেবীর সন্তুষ্টিতে অধিকতর গুরুত্ব দিত তাদের সঙ্গে এবং স্বভাবত তাদের পুরোহিতদের সঙ্গে এই পর্যায়ে প্রশাসকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক—শোষণের স্বার্থে শাসকও পুরোহিতবর্গের মিত্রতা সর্বকালের এক বিদিত ঘটনা।

"In many cases a leader or a ruler of a privileged class whose position rests on other factors combines priestly functions with its secular authority in order to make the latter more secure; or the political rulers and the priestly caste make common cause in their own interests. [Albert Einstein, Ideas and Opinions:Religion and Science, p-37]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, আলোচ্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অবদান হল তন্ত্রাচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি সাংখ্যদর্শন। [দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন: প্রস্তাবনা, পৃ-১৫] সাংখ্য মূলত বস্তুবাদী দর্শন, কৃষিনির্ভর সমাজের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে বিষয়গতভাবে কিছুটা সদৃশ। সাংখ্যে বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যতা, ক্রমবিকাশ, কার্য-কারণের সম্পর্ক সবই ছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিকৃতিসহ এমনভাবে ছিল যাতে যুক্তিবাদের সাধারণ অনুগামীদের চেতনাকে পশ্চাৎমুখী করে যুক্তিবাদ বনাম সাংখ্যদর্শনের সংগ্রামকে উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় করে তোলা যায়। অষ্টকূলে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষেরা সংখ্যাধিক্যেই ছিল এবং তাই সেই বৌদ্ধিক সংগ্রামে পর্যুদস্ত উপসত্ত্বভোগীর দল ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনের পথেই হাঁটতে বাধ্য হয়েছিল। তাই কটর তন্ত্রাচারীরা চিত্তবৃত্তি নিরোধের পন্থারূপে যোগসাধনার প্রবর্তন

করেছিল এবং আর একদল সাংখ্যের পুরুষের গৌণত্ব এবং বহুত্বকে রূপান্তরিত করে একক পুরুষ-প্রাধান্যের প্রতীক পশুপতিনাথ'কে (অর্থাৎ শিবকে) প্রতিষ্ঠা করেছিল যার ফলে ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের সূচনা হয়েছিল[দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন: সিদ্ধযুগের ধ্যানধারণা, পৃ. ৭৪-৭৫ এবং পৃ. ৮৩-৮৪]। উপসত্ত্বভোগীদের সেই ক্রমিক অবস্থান পরিবর্তনের চিহ্নগুলি মহেঞ্জোদাডো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও ধরা আছে বলে সেখানে প্রত্নবস্তুরূপে অজস্র যোনি, লিঙ্গ, উর্বরতার দেবী(শাকম্বরী), পশুপতিনাথ(শিব) ও যোগসাধকের মূর্তি এবং সিল পাওয়া গেছে।

এ আলোচনার সূত্রে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে, উপসত্ত্বভোগীরা ক্ষমতার অলিন্দে আধিপত্য বিস্তার করলেও একাধিপত্যময় সিদ্ধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে প্রতিটি অঞ্চলের সমাজবিকাশের পুরোধা সেনানীদের বিপর্যস্ত করার ক্ষেত্রে করুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল।

"The Harappa Phase represents the first state level organisation, but no single settlement dominated the region and there is no indication for the emergence of hereditary monarchies or highly centralised temples, palaces and elaborate elite burials that are characteristics of other early urban societies in Mesopotamia, Egypt and China." [Jonathan Mark Kenoyer, 'Cultures and Societies of Indus Tradition' in India: Historical Beginnings and the Concept of the Aryans. N.B.T.(2006), p 56-57]

স্বাভাবিক কারণে সিদ্ধসভ্যতার বহু অঞ্চলের শ্রম-নিপুণ কৃষক, শিল্পী ও কারিগরবর্গ তাদের বিশ্বস্ত নেতৃত্বের পরিচালনায় সবদিকীন প্রগতির পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছিল। তার ফলে তাদের উৎকৃষ্ট পণ্যসম্ভার সিন্ধুরূটের স্থলবাণিজ্যের এবং সমুদ্র-বাণিজ্যের মাধ্যমে তৎকালীন পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই পৌঁছে গিয়েছিল। খ্রিঃ পূঃ ২০০০ অব্দ নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বহু ভাষাভাষী অনেকগুলি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল এবং এই অঞ্চল তখন পৃথিবীর সব সভ্যদেশের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেই জন্য এই আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রের ভাষাগুলি পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ ভাষার শব্দে পুষ্ট হয়ে বাণমুখী লিপিতে (Canananite) মাটির ট্যাবলেটে লিখিতরূপ লাভ করেছিল। সেই ট্যাবলেটগুলি আবিস্কৃত হয়েছে। সেগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে অজস্র প্রাকৃত শব্দের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, সেই শব্দগুলি প্রায় অবিকৃতরূপে অবস্থিত থেকে বর্তমান বাংলাভাষাকে প্রাণচাঞ্চল্য দান করেছে। [ডঃ লীনি শ্রীনিবাসন, মিশর থেকে আসা বাংলা শব্দ। প্রোরেনাটা, হাওড়া-২, (২০০৩)]

এর থেকে এই সত্যটি ধরা পড়ে যে, সিন্ধুসভ্যতায় ‘প্রাকৃত’ অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল, বাণিজ্যে পারদর্শী প্রাকৃতভাষী বণিক ও নাবিকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং পরবর্তীকালে তারা সদলবলে বাংলায় চলে এসেছিল।

সাগোনিদ আককাদ রাজবংশের দীর্ঘকালের রাজত্বে সিন্ধু সভ্যতার এই নৌবাণিজ্যে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল; তারপর লার্সা বংশের রাজত্বকালে তাতে ভাঁটার টান অনুভূত হয়েছিল।

নৌবাণিজ্যের অবনতি ছাড়াও সিন্ধু উপত্যকার জমির উর্বরতা হ্রাস, অরণ্য ধ্বংসের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্ত্বিক কারণে সিউয়ান অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় প্রতি বৎসর মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা প্রভৃতি দুর্লক্ষণগুলি যুক্তিবাদী অগ্রণী ঐষ্টাকুলকে সিন্ধু সভ্যতার পতনের পূর্বাভাস দিয়েই রেখেছিল।

"In the Indus Valley this (i.e. destruction of cities) would be caused by any or all of the following factors: the geological uplift at Sehwan resulting in the excessive flooding of the Indus near Mohenjo-daro, the salination of soil, deforestation causing soil erosion and decrease in natural irrigation and thereby rendering agriculture difficult, and finally, the termination specifically the Harappan trade with Summer in the eighteenth century BC ..." [Romila Thapar, Cultural Pasts: Society in Ancient India: The Formative Period, Note up. 29, p.330]

তার ফলে তীক্ষ্ণদী নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যমী ঐষ্টারা নূতন নূতন উর্বর অঞ্চলে নূতন করে সভ্যতা গড়ার লক্ষ্যে সদলবলে পাড়ি জমিয়েছিল দিকে দিকে এবং অচিরে গড়ে তুলেছিল বেলুচিস্তানের কাচ্চি সমতলে, সিন্ধুর মাকরানে, কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে, মহারাষ্ট্রে বিস্তৃত অঞ্চলে, চম্বল উপত্যকায়, গঙ্গা-যমুনার দোয়ারে, মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিতে এবং নিম্নগাঙ্গেয় সমতলে স্থানান্তর সভ্যতার নানা কেন্দ্র। অনতিকাল পরে সেগুলির বিপুল বিকাশ ঘটেছিল এবং লৌহযুগীয় সভ্যতায় উত্তরিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল, মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার টিবি প্রভৃতি স্থানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষিতে ব্যাপকভাবে লৌহের ব্যবহারের প্রমাণ আছে। [ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত, পৃ: ৪২]

স্থানান্তর সভ্যতার ঐষ্টারা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার পূর্বেই পশ্চিম

এশিয়া, মিশর ও গ্রিস দেশের সঙ্গে নৌবাণিজ্যের পুনঃপ্রবর্তনের সূচনা করেছিল। রাজা সলোমনের (খ্রিঃ পূঃ ১০০০ অব্দ) প্রাসাদে, তৃতীয় সলোমনের স্মৃতিস্তম্ভে, নেকুকাডনেজারের রাজপ্রাসাদে ভারতীয় পণ্যের সাড়ম্বর উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। সোপার বন্দর থেকে পরিচালিত সেই নৌবাণিজ্যে অর্থলাভের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হল সেমীয় লিপির সাযুজ্যে উদ্ভূত ব্রাহ্মী লিপি এবং ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত প্রাকৃতভাষার বাণিজ্যিক কোড। পরবর্তীকালে অ্যারাক্ষীয় লিপির সাযুজ্যে উৎপন্ন খরোষ্টি লিপিও ভারতে গৃহীত হয়েছিল।

"The trade with Ophira (Sopar) during the reign of Solomon, the obelisk of ShalmanesarIII depicting Indian elephants, the evidence of Indian teak at Magheir and in the palace of Nebuchadnezzar and a variety of linguistic evidence ... would attest to the trading contacts between India and the Near East. The brahmi script may have originated in western India as a kind of merchants code partially associated with the Semitic script and in course of time and use in commerce travelled to the Ganga Valley ... where it was perfected for use with ... Prakrit." [Society in Ancient India: The Formative Period, NOte no. 30, p 330-31]

পশ্চিমবঙ্গের বেলটি, নানুর, মঙ্গলকোট, ডিহর, পোখন্যা প্রভৃতি স্থানে কুণ্ডলাকার এবং নকশাযুক্ত রোমান পাত্র, বাংলার সর্বত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্কার্টপরিহিতা আনত দেবীর প্রতিকৃতির সদৃশ কুমারী পুতুল, এবং তার মন্দিরের গায়ে অঙ্কিত সিন্দুরের মঙ্গলচিহ্নের বহুল প্রচলন, হরিনারায়াণপুরে ঢালাই তাম্রের মুদ্রায় উটের প্রতিকৃতি, আটঘড়ায়(বারুইপুর) টেরাকোটার গ্রিকযোদ্ধা মূর্তি ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বঙ্গবাসীরা সেই আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সক্রিয় অংশীদার ছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত বিষয় হল এই যে, বাংলার অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বলে পরিচিত নমোজাতির ["the oldest Hindu caste fgrouop in Bengal" - Sekhar Bandyopadhyaya, caste, Protest and Identity in Colonial India : The Namasudras of Bengal 1872-1974, Second Edition, First Cover Flap] সর্বকর্মে পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী, দলগত কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত, অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী [H.H.Risbyn The Trives and Castes of Bengal, I, p 183-89] এবং দৃঢ়রূপে যুক্তিবাদী মানুষেরা অতীতে বাংলার মাটিতে ব্রাহ্মী, খরোষ্টি এবং তাদের মিশ্র লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় ('কায়থী নাগরী'/'চাষা নাগরী' তে) বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের পুস্তকাদি রচনা করত এবং ঊনবিংশ শতাব্দির শেষপাদেও তা প্রচলিত ছিল।

[দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, পৃষ্ঠা ৩১] এর থেকে এই সত্যটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, সিদ্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকর্মের উত্তরাধিকারী এই জাতির (People, not caste) পূর্বপুরুষেরা অনুরূপ চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অধিকারী অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে দূর অতীতে বাংলার কৃষি সভ্যতার পত্তন করেছিল। তাকে লৌহযুগীয় স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু প্রকৃতি ও স্বার্থপর মানুষদের বিরুদ্ধতায় তারা নিজেদের সামাজিক অবস্থানটি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল বটে তবে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তার রেশ এখনও ধরে রেখেছে।

অপরদিকে যুক্তিবাদী শ্রমশক্তির দেশান্তরের পর মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার পুরোহিত ও শাসকবর্গ সপারিসদ নগর পরিত্যাগ করে হরপ্পার উপান্তে দীন-দরিত্রের জীবনযাপন করতে বাধ্য হল। ঘটনাচক্রে তখন ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ককেসীয় নরগোষ্ঠীর পশুপালন ও জুমচাষে রপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি অর্ধযাযাবর দল ভারতের মধ্যে এসে সাময়িকভাবে বাস করছিল। তারা সুযোগ পেলেই সিঙ্করুটের উত্তরাপথের বাণিজ্যবহর লুণ্ঠ করত এবং যেদিন লুণ্ঠ করতে পারত সেদিন তারা সম্ভার আসর নাচে-গানে মাতিয়ে তুলত। তাদের চারণ কবিতা ছিল সুগায়ক। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার প্রাক্তন কর্তারা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সেই অর্ধ-যাযাবরদেরই শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে খুঁজে পেল।

নির্ভরযোগ্য নূতন মিত্রদের পেয়ে প্রাক্তন শোষকের দল আবার স্বপ্ন দেখার সাহস পেল। এবার তারা দেশীয় ও ককেসীয় ভাষাসমূহের কিঞ্চিৎ বিকৃতিরূপের যথেষ্ট মিশ্রণকে গায়কী ঢঙে প্রাকৃত ভাষার চলনে প্রকাশ করে অনেক গান রচনা করল। সেসব অর্ধজ্ঞাত এবং অর্ধজ্ঞাত শব্দের ঝংকার এবং চারণদের গায়নের গুণ শ্রোতাদের মোহিত করল। প্রতিটি গান ঋগ্বেদের এক-একটি সুক্ত হল, আর তার চরণগুলির প্রত্যেকটি হল এক-একটি ঋক। তাছাড়া, সুক্তের রচয়িতা এবং গায়করা হল ঋষি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ককেসীয় দলপতিরা দেবতা, পশুপালক এবং অন্যেরা ক্ষত্রিয় এবং সমগ্র মিত্রজোট আর্ঘ্য। স্বভাবত এদেশের মানুষরা হল আর্ঘ্যদের শত্রু— দাস, দস্যু, দানব, রাক্ষস ইত্যাদি।

"The claim that the earliest of the Vedic texts, the Rg Veda dating back to the second millenium BC is linguistically purely Indo-Aryan is now under question for it is being argues that the text already registers the presence of non-Aryan speakers. The later Vedic texts show an even greater admixture of non-Aryan and specifically when dealing with certain area of activity, such as a agriculture. The emergent pic-

ture might suggest that the speakers of Indo-Aryan may have been in a symbiotic relationship with speakers of non-Aryan languages, with a mutual adopting of not only vocalulary and linguistic structures in a bilingual situation but also technologies and religious practices and beliefs. The exclusivity of bhahmana ritual does not have to be explained on the basis of a racial segregation, but can be viewed as derived from the will to retain a certain kind of priestly power, which, claiming bestowal by the deties would ensure a separate and special status. Possibly the political hold of priestly power has its roots in the Harappa culture." [Romila Thapar, Cultural Pasts : Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity, p 982]

এদিকে স্থানান্তর সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারিতা ক্ষত্রিয়দের লুণ্ঠনের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই লুটের ধনে, জুমচাষের যবের ছাতুতে, গরু-মোষের দুধে এবং ঘিয়ে, রান্না বাছুরের মাংসে ঋষিদের পেটের ক্ষুধা খানিকটা মিটল। তাদের আদেশে ক্ষত্রিয়রা পরিত্যক্ত মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার এখানে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল এবং ঋষিরা তাদের ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ইত্যাদি নাম দিয়ে শত্রুপুরী ধ্বংসকারী বীররূপে নন্দিত করে অনেক সুক্ত রচনা করল এবং আর্য আগ্রাসনের স্বপ্নের জালটি এইভাবে বোনা হয়ে গেল। জালটির বুনাট অবশ্য জুতসই হল না, তাই এমন সুক্তও রচিত হল যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কৃষকায় শত্রুরা বহুপূর্বে এইসব প্রেতপুরী ছেড়ে স্থানান্তরে চলে গেছে। পরস্পরবিরোধী এমন সব উক্তি ঋগ্বেদে প্রচুর আছে। সে যা হোক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু গবেষকেরা এখন, আসল ঘটনা উদ্ধার করেছেন। তাঁরা আর্য আগ্রাসনের তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছেন এবং আর্যনরগোষ্ঠীর ধারণাকে তাঁরা স্বীকারই করেন না।

"What is curious ... is that in some cases it would appear that Indra and Agni were responsible for the destruction of these cities, whereas in other cases they appear already to have been in ruins. It would seem that most of these cities were in the Saraswati and Punjab region. It is stated that the dark inhabitants fled and migrated. This would agree with the archeological evidence that the cities were deserted and not occupied by the new arrivals. They were regarded as the places of evil and the haunt of sorceresses and therefore to be avoided. This would hardly be the attitude of a conquering people who had actually destroyed the cities. Could the cities have been deserted ...

before the arrival of the Indo-Aryan speakers, who associated the ruins of the cities with evil, perhaps set fire to the remaining ruins and ultimately attributed the destruction to Indra and Agni? This would also explain the chronological gap, i.e., Harappa culture having declined by 1750 BC and the Rg Vedic Aryans being dated to circa 1500 BC.

Recent skeleton analysis of the Harappan culture sites are tending to puncture the theory of the Indo-Aryan speakers representing a large and separate racial group." [Romila Thapar, *Cultural Pasts : Society in Ancient India. The Formative Period*, Note no. 14,p 325]

শুধু ক্ষত্রিয়রা নয়, স্থানান্তর সভ্যতার সমৃদ্ধির ভাগ নিতে আগ্রাসকেরাও ছুটে এসেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে পারস্যের অ্যাকিমিনিদ সম্রাট সাইরাস উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর পুত্র দারিউসও সেই আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

"...the Achaemenids ... claimed the trans-Indus region ... as part of their empire ... The Evidence of Indian soldiers and Indian elephants in the army of Darius III at the famous battle of Arbela would point to some control over Indian territories." [Do : Epigraphic Evidence and some Indo-Hellenistic Contacts, p 453]

অ্যাকিমিনিদদের পর এসেছিল গ্রিকরা। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ঘটনা সুবিদিত। আগ্রাসকদের দাপটে ভারতের স্থলবাণিজ্যের নিঃসন্দেহে মারাত্মক ক্ষতি হল, ব্রাহ্মণদের দুর্গতি সীমা ছাড়িয়ে গেল কারণ তাদের অনুগত ক্ষত্রিয়রা আগ্রাসক বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে সিন্ধুরূটের বাণিজ্যবহর লুট করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলল। সুতরাং ব্রাহ্মণ মৌখিক সাহিত্যে পারসিকরা এবং অন্যান্য আগ্রাসককেরা স্থানান্তর সভ্যতার অধিকারীরা এবং সভ্যতার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীগুলি ‘শ্লেচ্ছ’ নামক একটি মাত্র অভিধা প্রাপ্ত হল [শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪.১.৩.২৬, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.৪.৭.৩. ইত্যাদি]। গোপন শাস্ত্রে এইভাবে গালি দিয়ে ব্রাহ্মণদের কিছুটা স্বস্তি হয়ত মিলল কিন্তু পেটের ক্ষুধা মিটল না। অগত্যা উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের নিকটবর্তী অঞ্চলে খাদ্যসংগ্রাহক শ্লেচ্ছদের ক্ষত্রিয়ে পরিণত করা ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। ‘বিদেষ মাথব’ কাহিনী [শতপথ ব্রাহ্মণ, ১.৪.১.১] এবং ‘অগস্ত্য যাত্রা’ প্রবাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সেই অর্থব ও অঙ্গিরসবংশীয় প্রয়াসের প্রমাণ আছে। বস্তুত ব্রাহ্মণদের প্ররোচিত মালব, সিবি, ত্রিগর্ত এবং যৌধেয় উপজাতির ‘শ্লেচ্ছরা’ লৃণ্ঠনজাত সম্পদের অধিকারী হয়ে

যথাক্রমে জয়পুরে, উত্তর রাজস্থানে, ইরাবতী-শতদ্রু দোয়াব অঞ্চলে এবং হরিয়ানার উত্তরদিকে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

"The Malava tribe, mentioned by the Greek as Malloi, established themselves in the Joipur area having migrated from the Ravi. The Sibi, the Siboi of the Greeks, migrated to north-eastern Rajasthan. The Trigartoo were settled in the Ravi Sutle Dob. The Youdheyas moved from Hariyana northwards." [Romila Thapar, Cultural Pasts: The Image of the Barbarian in Early India, p 246-47]

ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য পারিতোষিকে তুষ্ট ব্রাহ্মণেরা তাদের প্রথমে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রূপে এবং পরে ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে একইভাবে হিমালয় ও বিন্দ্য পার্বত্য অঞ্চলের অনেক উপজাতিই বিভিন্ন স্থানে রাজ্য স্থাপন করে ‘ম্লেচ্ছ’ থেকে ক্ষত্রিয় হয়েছে; তবে তাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সাহিত্যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নামেই থেকে গেছে কিন্তু তাদের রাজাদের মুদ্রার লিখনে এবং প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত প্রশস্তিতে ক্ষত্রিয়ত্ব উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এর অবশ্য নিগূঢ় কারণ আছে। এই কারণটি আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

ইতিপূর্বে জানা গেল যে, কুরু-পাঞ্চালের অথবা তক্ষশিলায় কোন শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ তার মৌখিক স্তরের এক গুপ্ত শাস্ত্রে কোন রাজাকে ‘ম্লেচ্ছ’ অথবা ‘ব্রাত্য’ ইত্যাদি কী অভিধায় ভূষিত করেছিল তা তখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। তার কারণ হল এই, স্থানান্তর সভ্যতার আভিজাত্য প্রত্যাশী উপসত্ত্বভোগী পরিবারের লিখনপটু সন্তানেরা অনেকেই ততদিনে অর্থের বিনিময়ে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিখুঁত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে এসেছিল এবং শাস্ত্রসম্মত উপকথার সূত্র ধরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে যে কোন রাজার ক্ষত্রিয়রূপে প্রশস্তি রচনায় তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। এমন দুই ভাই তক্ষশিলায় পাঠ শেষ হওয়ার আগেই অনবধানতাবশত ধরা পড়েছিল [রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, পৃ ১২৪] ঠিকই কিন্তু অনেকেই সাফল্যের সঙ্গে পাঠ শেষ করে এসেছিল, অন্যদেরও উপযুক্তরূপে গড়ে তুলেছিল। এবং তারা আভিজাত্য-প্রত্যাশী রাজাদের বংশপরিচয়, পুরুষানুক্রমিক বীরত্ব এবং গৌরবময় কীর্তিকলাপের কল্পকথা শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে বর্ণনার শেষে নিজেরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে উপস্থাপিত করে ‘কীর্তিমান’ রাজার কাছ থেকে অঢেল ধন-রত্ন এবং নিক্কর জমি লাভ করেছিল। প্রস্তর অথবা তাম্রফলক উৎকীর্ণ এইসব অভিলেখ অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরত।

"The legal sanction of grant was generally recorded in an inscription on stone or on plates of copper and the preamble to the grant contained the genealogy of the kings ... There instead of being described as mleccha kings, they claim ksatriya status and have had fabricated genealogies to prove the claim." [Romila Thapar, Cultural Pasts: The Image of the Barbarian in Early India, p 252]

এর ফলে এক-একটি নবগঠিত রাজ্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হয়ে উঠত। গুর্জর-প্রতিহার, গুহিল ও চালুক্যদের সূর্যবংশের ও গঙ্গা ও চান্দেলাদের চন্দ্রবংশের এমনভাবে প্রতিষ্ঠার এবং সেগুলির ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠার কথা সকলেই জানেন, কিন্তু যে তথ্য কম প্রচারিত তা হল এই যে, প্রথম পর্যায়ের এমন সব প্রস্তর লিখন অর্থাৎ সংস্কৃত লিখন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 'ম্লেচ্ছ' অঞ্চলেরই অবদান।

"A large number of early Sanskrit Inscriptions came from the mleccha areas of northern and western India." [Do, Note no. 61, p 264]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা বাঞ্ছনীয় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে ব্রিজি-লিচ্ছবি উপজাতিদ্বয়ের মিত্রজোটের নেতা চন্দ্রগুপ্ত মগধে যে শক্তিশালী গুপ্ত রাজবংশের পত্তন করেছিলেন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠাদানের ক্ষেত্রে সেই রাজবংশই প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথা স্মর্তব্য যে, চন্দ্রগুপ্তের ছ'শো বছর আগে মৌর্যসম্রাট অশোক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আদিরূপের সংস্কারধর্মী বৌদ্ধধর্মকে ["We should never forget that Gautama was born and brought up a Hindu and lived and died a Hindu. His teachings, for-reaching and original as it was, and really subversive to the religion of the day, was Indian throughout ... He was the greatest and wisest and best of the Hindu." Rhys David, Buddhism, pp 116-17] রাষ্ট্রীয় পোষকতা দান করে এবং পুষ্যমিত্র সরাসরি ব্রাহ্মণ্য ধ্বজা উড়িয়ে গুপ্তদের পথ অনেকাংশে মসৃণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও অগ্রণী সম্পদস্রষ্টাদের গর্বিত ঐতিহ্যের এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের প্রতীক নন্দবংশের দৃঢ় গণভিত্তির সংগ্রামী চেতনার স্মৃতি শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের মানসলোকে স্থায়িত্বলাভের ফলে গুপ্ত আমলেও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে মগধ 'ম্লেচ্ছদেশ' বলেই নিন্দিত হয়েছে। তা হোক, তবু গুপ্ত সম্রাটরা নিজেদের সাম্রাজ্যে প্রবল উৎসাহে জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের প্রশস্তি রাজকবি হরিসেন অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতে রচনা করে আদিকালের মৌখিক ঘরানার শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতচর্চাকে শ্রদ্ধা করে দিয়েছিলেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'ও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞের

অশ্লীল যৌনতার শিল্পিতরূপই হল কামসূত্র। তার বহু পূর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতের নব্যক্ষত্রিয়দের পুরোধা গৌতম বুদ্ধের ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে নীরবতা, দর্শন-অনীহা, জন্মান্তর, কর্মফল ও নিয়তিবাদ-নির্ভর মধ্যমপন্থী বৌদ্ধধর্ম অর্থে,বিত্তে এবং প্রতাপে বলীয়ান অথচ প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ঈঙ্গিত মর্যাদায় বঞ্চিত উপসত্ত্বভোগীদের অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ী, মহাজন, বণিক এবং ধনী কৃষকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রাধান্যে এবং নির্বাণের লোভে উদ্দীপ্ত করে এক প্রবল ধর্ম-বিদ্রোহের সূচনা করে দিয়েছিল। এই জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র ঘিরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

"Buddhist sacred centres develop along the trade routes and in urban settlements linked to commerce. Inscriptional evidence points to the fact that the establishment of Buddhism in these areas probably owes more to the setthi-gahapatis, the merchants, traders, landowner and the artisanal guilds, who were all dedicated supporters of the religion and the more significant donors to the embellishment of the sacred centres." [Romila Thapar, Cultural Pasts: Asoka and Buddhism as Relected in the Asokan Edits, p 437]

গৌতম বুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে পশ্চিম-উত্তর ভারতে নব্য ব্রাহ্মণদের পুরোধা পাণিনি শুরু করেছিলেন বৈদিক ভাষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান প্রবর্তনের দুরূহ কর্মকাণ্ড এবং লিখন বিদ্রোহ। তার ফলে তিনিই প্রথম বৈদিক ভাষাকে খেয়াল-খুশির অবস্থান থেকে নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত ভাষায় পরিণত করার জন্য ব্রাহ্মীলিপিতে ‘অষ্টাধ্যায়ী’ নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে নব্য ব্রাহ্মণদের আগমণের রাজপথটি খুলে দিয়েছিলেন। তারপর মহাবীর ও বুদ্ধের নির্দেশিত ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং বণিক ইত্যাদি উপসত্ত্বভোগীদের আভিজাত্যের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে বৈশ্য নামে দ্বিজত্ব দান করার জন্য ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ সুক্তটি অনুপ্রবিশ্ট করার কৃতিত্ব কোন নব্য ব্রাহ্মণের তা এখনও সঠিক জানা যায়নি। তাছাড়া, নব্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অপর তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলি যেমন - অর্থশাস্ত্র, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ভাববাদী আত্মিকরণের ফলশ্রুতি গীতা এবং ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, পরাশর, নারদ, পরশুরাম, মনু প্রভৃতি নামীয় স্মৃতিসমূহের রচয়িতা সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা আছে। তা থাক, সেটা বাহ্য। মূল কথা হল এই যে, এগুলি শ্রমঘণার নীতির ভিত্তিতে রচিত এবং তাই সমাজপ্রগতির চূড়ান্ত পরিপন্থী।

ভারতের সম্পদ সৃষ্টি ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের শ্রমোদ্যোগী মতাদর্শের

অনুসারীদের পরস্পর নির্ভরশীল মানবিক সম্পর্ককে শ্রমঘণার বিষে জর্জরিত করার দুরূহ কর্মটি ছিল জটিল এক দীর্ঘপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সুতরাং সুসচ্ছল বিপণনকারীদের দর্শন-নিষ্পৃহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের অবশ্য করণীয় কর্তব্য এবং মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার তাত্ত্বিক ভিত্তিটিও রচনা করে গিয়েছিলেন। তাই ভারতের সমাজ পরিবর্তনে অধোগামিতার সার্থক প্রবর্তক তাঁরাই। ইতিপূর্বে আলোচনার সূত্রে আমরা দেখেছি যে, মৌর্যসম্রাটেরা তার বাস্তবায়নে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জৈন ধর্মে গভীর অনুরক্তি, বিন্দুসার অজীবিক প্রীতি "Chandragupta Maurya is strongly associated with the Jaina tradition and Bindusara ... with the Ajeebikis." [Do [437] এবং অশোক মৌর্যের বৌদ্ধধর্মে আসক্তির আড়ালে 'অর্থশাস্ত্র' অনুসারী তাঁদের স্বৈরতান্ত্রিক নির্মম শোষণ-শাসন-নিপীড়ন কখনও ঢাকা পড়েনি।

"... there is an insistence on the state supervision of all activities. The purpose of this was both to control production and to derive an income from taxation at various stages. Thus not only had the cultivator to pay tax on the land to be cultivated and a percentage of grain he harvested ..." [Do, State-Wearing Shops of the Maurya Perios, p 411]

আর তাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালের দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিন্দুসার খানিকটা সামাল দিলেও অশোক প্রজাপীড়ন তুঙ্গে তুলেও রাজসিক বৌদ্ধদের খাঁই মিটাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছিলেন। একথা না বললেও চলে যে, তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি বলে অনতিকালের মধ্যে 'শূদ্র বিদ্রোহ' ঘনিয়ে এসেছিল এবং তার ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটেছিল। তাছাড়া এই শূদ্রবিদ্রোহে অর্থাৎ ধর্মাচারী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সম্পদস্রষ্টাদের মহাসংগ্রাম পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে চালিত প্রাথমিক নব্য ব্রাহ্মণ্য উত্থানকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, স্থানান্তর সভ্যতার স্বার্থপর উপসত্ত্বভোগীরা আভিজাত্যের মোহে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ এবং বৈশ্যরূপে ধর্মবাদে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে সম্পদস্রষ্টারা ক্রমেই শক্তি হারিয়েছিল এবং অপরপক্ষে বৈদেশিক আগ্রাসক গ্রিক, কুযাণ, শক, হুনদের সাথে ধর্মবাদীদের ঐক্যে ক্ষমতার ভারসাম্য শেষপর্যন্ত তাদের দিকেই ঝুঁকেছিল। বলাই বাহুল্য, অতঃপর ভারতের অবরুদ্ধ সমাজ ক্রমশ অধঃপতিত হয়েছিল তবে তার পূর্বে উপসত্ত্বভোগীদের উত্থানের চরম পর্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যেই লক্ষিত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, স্থানান্তর সভ্যতার ক্রমোৎখান সামাজিক প্রবাহ এই ক্রমোৎখানগামী

খাতে মোড় নিল কেন? যৌক্তিক বিশ্লেষণ-এর পর সম্ভাব্য উত্তর এমনই—

সুদক্ষ শ্রমশক্তির অসাধারণ নৈপুণ্য, অতি বৈচিত্র্যময় কৃষিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, সিল্করুটে স্থলবাণিজ্য আর বারুচ, সোপার, মুজরিস, আরিকামেদু, কাবেরীপট্টিনাম, মাণিকপত্তন, তমলুক, গাঙ্গে প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে নৌবাণিজ্যের সূত্রে তৎকালীন পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির শীর্ষেই ছিল ভারত। আর তার ফলে সুগন্ধী সরু চাল(শালিধানের চাল), বহুপ্রকারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গুড়, চিনি, লঙ্কা, নানাপ্রকার তেল, লবণ, কাঁসা, পিতল, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে ভারতের কুশলী কারিগররা মধ্যম শিল্পের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলেছিল। নলযুক্ত লোহার পাত্রের জলও জ্বলন্ত কাঠের উত্তাপে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে এসে সজোরে ধাক্কা মেরেছিল বারে বারে তাদেরই চোখে-মুখে, কিন্তু তাদের চেতনার দ্বারে সেই দূরন্ত আঘাতগুলি আছড়ে পড়ে তার বদ্ধ অর্গলটিকে খুলে দিতে পারল না। জমির অতি উর্বরতা এবং প্রকৃতির অকৃপণ অবদান তাদের প্রয়োজনের তাগিদটিই হরণ করে ভারতে সেই সুদার অতীতে স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মহৎ কর্মটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং তাই বৃহৎ শিল্পে উত্তরণের সম্ভাবনাকেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তার ফলে স্থানান্তর সভ্যতার বিকাশমান সমাজ উৎপাদন-পদ্ধতির এবং সেই সুবাদে উৎপাদন সম্পর্কের উল্লেখ্যজন্যত কক্ষান্তরের ব্যর্থতায় অগত্যা অধোগমনের পথেই দ্রুত ধাবিত হয়েছিল। বস্তুত বিষয়টি এই যে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অনুত্তর উপসত্ত্বভোগীদের সামাজিক সমৃদ্ধি খটানোর দায় থেকে মুক্ত করে তাদের শেষপর্যন্ত ব্যক্তিস্বার্থের এবং স্বভাবত মোক্ষ, নির্বাণ বা মুক্তির অথবা পরকালে স্বর্গলাভের লক্ষ্যে চালিত করেছিল। সম্পদস্রষ্টারা তখনও মতাদর্শের সংগ্রামে প্রবল ছিল তা ধর্মবাদীদের নিন্দার বন্যার মধ্যে লোকাবাসীরূপে ফুটে আছে। এমতাবস্থায় নব্য ব্রাহ্মণদের মোক্ষম চালে বৈশ্যদের দ্বিজত্বের ও গৌতম বুদ্ধের বিষ্ণুর অবতারত্বের ফলে অন্তর্কলহে দীর্ঘ বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যে অবলীলাক্রমে শাসক-শোষককুলের একক মঞ্চরূপে নব্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে গেল।

স্বাভাবিক কারণে গুপ্ত সম্রাটরা সেই অনুৎপাদক মিত্রশক্তির ঠাঁট-বাট বজায় রাখার জন্য অর্থশাস্ত্রনির্দেশিত পথে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন তুঙ্গে তুলে দিয়ে সম্পদ-স্রষ্টাদের শ্রমফলের অধিকারে বঞ্চিত শ্রমদাসে [“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন” গীতা, ২.৪৭ প্রথম পঙ্ক্তি] পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বস্তুত রাজাদেশে তারা বিনা পারিশ্রমিকে জীবনান্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য ছিল [মনুস্মৃতি, ৭.১৩৮]। তবে স্রষ্টাকুল সেই বাধ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল কিনা অথবা গুপ্তরাজশক্তি তা স্বীকার করে নিতে তাদের বাধ্য করতে পেরেছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ এই দুটি

সংশ্লিষ্ট বিষয় সেই রাজক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রয়োগকে সরাসরি অস্বীকার করেছে— (১) পাটলিপুত্র, বিদিশা, কোশল(অবন্তী), অযোধ্যা, মথুরা, কোশাম্বী, উজ্জয়িনী ইত্যাদি গুপ্ত শাসনকেন্দ্রগুলির প্রত্নসম্ভারের থেকে কোন ঐশ্বর্যের দ্যুতি নির্গত হচ্ছে না। ২। মহাভারতের সভাপর্বের গোড়ার দিকেই ‘শ্রেষ্ঠ স্থপতি ময় দানব’-এর ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা তৈরির জন্য স্থপতি, ভাস্কর, মণিকার, শিল্পী এবং সহায়কবৃন্দের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের শর্ত আদায় সেই ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধানকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছে।

সুতরাং একথা নির্দিষ্টায় স্বীকার করতেই হয় যে নব্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র গুপ্তদের রাজত্বের সুবর্ণ দিনেও রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-পীড়নে অষ্টাকূলের মাত্র একাংশকে শুদ্রে পরিণত করতে পারলেও তাদের অগ্রণী অংশ বিজ্ঞানবিরোধী, সমাজবিকাশের বিরোধী এবং শ্রমঘণী পরজীবীদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে চিরকালই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং প্রত্যাঘাতে ভাস্বর হয়েই ছিল। খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চরম বিরোধী সেই বরেন্য মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে অস্পৃশ্যরূপে ঘোষিত হয়েছিল।

"The exact word 'asprisyā', the Sanskrit equivalent of untouchable, seems to have appeared sometime between the third and sixth century of the Christian era." [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in colonial India, p 13]

এটাই একান্ত স্বাভাবিক। কারণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উদগাতাদের উত্তরাধিকারী সম্পদ-স্রষ্টারা — (ক) প্রয়োজনের প্রবল তাড়নার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ‘নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব’ [গীতা, ২/৪৭] (খ) পতিত ব্রাহ্মণ্য বংশপরিচয় [মনুস্মৃতি, ১০.৪৩] (গ) কদর্য দেশ ও জাতিপরিচয় [মনুস্মৃতি ১০.৪৪] ঘ) বিবাহ-নিষিদ্ধ পিতা-মাতার অবৈধ যৌনমিলনজাত বর্ণসংকর বা জারজ সন্তানের [মনুস্মৃতি, ১০.১২] পরিচয়ের শাস্ত্রীয় প্রলাপ ঘৃণাভরে প্রত্যাখানই করত। যে দেশে এবং যে জাতিতে কালোপযোগী পদ্ধতিতে বিবাহিত পিতা-মাতার ঈঙ্গিত সন্তানরূপে জন্মেও আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়ে সযত্নপ্রয়াসে সম্পদসৃষ্টির বহুবিধ কর্ম সম্পর্কিত বিদ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তারা মানবসমাজকে জড় ও মনন সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলেছে সেই দেশ জাতি এবং মাতা-পিতার পরিচয়ে তারা সঙ্গত কারণেই গর্বিত। পরজীবী ব্রাহ্মণেরা উদ্ভিদ অথবা শিলাবৎ অযোনিজ পিতৃপরিচয়ের গর্বে, অথবা স্বার্থান্ধ ক্ষত্রিয়রা পিতা-পুত্রীর (মনু ও তার কন্যা ইলার) [বিষ্ণুপুরাণ, ৪.১] অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীর (ইক্ষাকুর পুত্র-কন্যার [Mahavastu I, pp 348-52] রমণজাত সূর্যবংশীয় সন্তানের ও পূর্ণিমার রাতের পূর্ণচন্দ্রের ও মনুকন্যা ইলার অথবা অন্য কোন এক সুন্দরী রমণীর অবাস্তব যৌনমিলনজাত সন্তানের [বিষ্ণুপুরাণ, ৫, ৬ এবং ১০] চন্দ্রবংশীয় গর্বে গৌরব অনুভব

করতেই পারে, কিন্তু বিজ্ঞানানুরাগী এবং স্বভাবত সুস্থবুদ্ধির কর্মকুশল মানুষেরা তো এসব ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয় বাতুলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না এবং তাদের বংশপরিচয়ের কোন গ্লানিকে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাই তো ব্রাহ্মণ্যতত্ত্ববিরোধী অবস্থানে তারা ছিল অটল। গীতা-পুরাণ-মহাভারতের খলনায়ক কৃষ্ণকে চিনে নিতে তারা যেমন ভুল করেনি, তেমনই কৃষ্ণও ভুল করেনি তাদের মহাশত্রুরূপে সনাক্ত করতে।

মহাভারতে সমাজপ্রগতির পরিপন্থী ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠাকে স্বার্থপর চক্রের নেতা কৃষ্ণ ‘ধর্মসংস্থাপন’ নামে অভিহিত করেছে। তাই তো সমাজপ্রগতির নায়করাই তার ঘোরতর শত্রু এবং ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বিনাশই তার ‘ন্যায়নীতি’ ছিল এবং অভীষ্টলাভের পর সেই নির্লজ্জ ইতরতা প্রকাশ করতে তার দ্বিরুক্তিও লক্ষিত হয়নি। এমন একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল—

যো হি ধর্মস্য লোপ্তরো বধ্যাতে মমপাণ্ডব।

ধর্মসংস্থাপনার্থ হি প্রতিজ্ঞেযা মমাব্যয়া ॥ [মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১৭৯/২৮]

সকলে বুঝতে পারছেন ঘটোৎকচের বধের পর আনন্দে আত্মহারা কৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্যে বিস্মিত পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রাজ্ঞল উত্তর এটি। জরাসন্ধ বধের পরও এমন উক্তি আমরা শুনেছি কৃষ্ণের মুখে। শম্ভুক হত্যাকারী রামের মুখে একই ধর্মের বুলি আমরা শুনেছি। সেটা ঠিক, তা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ রামায়ণের তাড়কা-বালী-রাবণ-ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলারা দশরথ-রাম-সীতা-লক্ষ্মণদের তুলনায় মানবিক গুণাবলীতে বহু বহুগুণে শ্রেষ্ঠস্থানে রয়েছে। আর মহাভারতের বিশাল পরিসরে অগণিত কলের পুতুলের নাচন-কৌদন-আস্ফালনের মধ্যে গুটিকয়েক সজীব মানুষ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে মানবতাবিরোধী এবং সমাজবিকাশের পরিপন্থী স্বরূপটিকে অনাবৃত করে তুলে ধরেছে। তাদেরই একজন ঘাতকরূপে উপস্থাপিত হয়ে নিরপরাধ এক বালককে হত্যা করার রাজাদেশ প্রত্যাখ্যান করে তার মানবতা বোধকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছে [মহাভারতের কর্ণপর্ব, ১৭/২]। বক, হিড়িম্ব, হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সাক্ষাৎ প্রতিবাদরূপে উজ্জ্বল। আর একজন কীলক। মহাভারতের বিয়োগান্ত পরিণতির পরোক্ষ নায়ক সে এবং বোধকারি, কৃষ্ণের অসহায় মৃত্যুও তার হাতে। ব্রাহ্মণ্য ন্যায়নীতি এবং ক্ষত্রিয়দের সুশাসন এবং সুবিচারের বুলিকে পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে বংশানুক্রমিক ক্ষত্রিয় শাসন নির্মূল করার লক্ষ্যে কালের পথের দিশারী কীলক।

সেইকালে ঘাতক, কীলক, বক, হিড়িম্ব, হিরণ্যকশিপুদের নেতৃত্ব দিয়ে তখনকার ভঙ্গুর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ভারতের সমাজপ্রগতির ধারাকে খরতর

প্রবাহে চালিত করার দায়িত্বে ছিল ভগদত্ত, পৌন্ড্রক, বাসুদেব, কর্ণ, শল্যদেব। স্থানান্তর সভ্যতার এইসব উপসত্ত্বভোগীরাও সেই সময়ে ক্ষত্রিয়ত্বে মোহাবিষ্ট হয়েছিল বলে তাদের উপর ন্যস্ত সেই দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে এল না। বরং শ্রেয়জ্ঞানে তারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদেব এক দলের পিছনে ভিড়ে গেল।

বর্তমানকালেও তার ব্যত্যয় ঘটান কথা নয়। তাই এ যুগের দৃঢ়বদ্ধমূল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে সংগঠিত বৈপ্লবিক তৎপরতায় উৎপাটিত করার মুখ্য দায়িত্ব ঘাতক, কীলক, বক, হিড়িম্ব, হিরণ্যকশিপুদের বংশধরদেরই পালন করতে হবে। ভারতের বৃক্ক কৃষিসভ্যতার ঐষ্টাদের সৃজনশীল ঐতিহ্যের ধ্বজা এখন কেবল তারাই বহন করে চলেছে। সুতরাং ভারতের সমাজবিকাশের অবরুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করার ঐহিত্যসম্মত দায়িত্ব মূলত তাদেরই। আশাকরি, বংশধারায় যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে নিজেদের গৌরবময় সত্ত্বায় উজ্জীবিত হয়ে অচিরেই তাদের ইতিহাস-নির্দেশিত দায়িত্ব তারা সার্থকভাবে পালন করবে।

ব্রিটিশ শাসনে বাংলার ধাঙড় আন্দোলন

নির্বাণ বসু

যে কোন শহরের মতই কলকাতা মহানগরী হিসাবে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের যেসব অপরিহার্য পরিকাঠামোগুলি সৃষ্টি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জনা নিষ্কাশন। ঔপনিবেশিক যুগে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারে সরাসরি হাত দিতে চায় নি। স্যানিটারী প্রিভি শহরময় চালু হবার আগে পর্যন্ত মেথররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাটা-পায়খানা থেকে মাথায় করে মল নিয়ে আসত। এছাড়া ছিল জঞ্জাল নিষ্কাশনের কাজ— বাড়ী ও রাস্তা থেকে জমানো আবর্জনা তুলে শহরের বাইরে ফেলে দেওয়া। এরপরে আধুনিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা চালু হলে ম্যানহোল ও লাইনের ভিতর নেমে তা পরিষ্কার রাখার কাজ সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই, শহর যত বড় হতে থাকে, ধাঙড়-মেথরের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে।

যে কলকাতা অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নব নব ভাবধারার উন্মেষ ও দুর্বার গণ-আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই কলকাতার তিন শত বৎসর পূর্তির উজ্জ্বল আলো সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এই ধাঙড়শ্রেণীর প্রতি তেমনভাবে নিষ্ক্ষিপ্ত হয় নি। যারা না থাকলে কোন শহর বাঁচতে পারে না, যারা তথাকথিত ঘৃণ্য নোংরা কাজ না করলে শহরের জীবন স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য, তাদের দুঃখ-দুর্দশা, দাবী-দাওয়া এমনকি তাদের মানবিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নাগরিকদের তেমন কোন সচেতনতা দেখা যায় না। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধাঙড়দের প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আন্দোলনের একটি আনুপূর্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

শহরের বাডুদার-মেথর-ধাঙড়দের মধ্যে বাঙালী প্রায় ছিলই না। এরা প্রধানতঃ আসত বিহারের তথাকথিত নীচ অস্পৃশ্য জাতিসমূহ থেকে। শহরের ভদ্র সম্প্রদায় এদের মানুষ বলেই ভাবত না। অথচ স্বাধীনতার আগে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে প্রায় আঠারো হাজারের বেশী নিষ্কাশন কর্মী ছিল। প্রথমে এরা ছিল অসংগঠিত। সদারের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল চাকুরী পাবার ও তা রক্ষা করার জন্য। অপরিসীম শোষণ, দারিদ্র ও কুশিক্ষা ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। ভোর রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিল কাজের সময়। অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে অমানবিক জীবনযাপন করতে হত। আকণ্ঠ মদ্যপান, জুয়াখেলা বা নিজেদের মধ্যে মারপিটের মত অসামাজিক কার্যকলাপই ছিল এদের একমাত্র বিশ্রাম বা অবসর বিনোদন। কর্পোরেশনের কাজের বাইরে প্রাইভেট বাড়ীতে কাজ করে অনেকেই কিছু বাড়তি উপার্জনের চেষ্টা করত।

আবার অনেকে কর্পোরেশনের স্থায়ী কাজ না পেয়ে বদলীতে বা শুধু প্রাইভেট বাড়ীতে কাজ করত। এদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও, তা আনুমানিক ৫-৬ হাজারের কম ছিল না। তুলনামূলকভাবে, পুরুষ ধাঙড়ের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কাজে বের হত।

একবারে গোড়ার যুগে শহরের ইউরোপীয় ও সম্ভ্রান্ত কিছু দেশীয় ভদ্রপল্লীর গৃহস্থ বাড়ী থেকে মল সরানোর জন্য হেড সর্দারের অধীনে একদল মেথর কাজ করত। এগুলি ছিল প্রাইভেট ব্যবস্থা। দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা ও আলাপ-আলোচনার পর জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ১৮৭০-এর দশক থেকে শহরে আধুনিক পয়ঃপ্রণালীর ভিত্তি স্থাপিত হতে শুরু করে। নতুন নিয়মে প্রথমতঃ অনেক কমসংখ্যক মেথর লাগবে, দ্বিতীয়তঃ তারা সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নিযুক্ত হবে। এর ফলে স্বভাবতঃই এতদিন যারা মেথরের কাজ করত তাদের কর্মচ্যুত হবার আশকা দেখা যায়। এর প্রতিবাদে ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ককাতায় ধাঙড় ধর্মঘট শুরু হয়। শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থার করুণ অবস্থা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শহরের ভদ্রসম্প্রদায়ও মিউনিসিপ্যালিটিকে সমর্থন করে। ফলতঃ ধীরে ধীরে ধর্মঘট ভেঙে যেতে থাকে। তাহলেও কলকাতার ধাঙড়দের এই প্রথম ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।^১

এর দীর্ঘকাল পরে নতুন আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রথম পৌর নির্বাচনের পরে যখন সর্বপ্রথম নির্বাচিত বেসরকারী পৌরসভা ১৯২৪ সালে গঠিত হয় ও স্বরাজ্য দল ক্ষমতায় আসেন তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধাঙড়দের মাসিক ২ টাকা বেতনবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু তা রক্ষিত হয় নি। এদিকে, কুড়ির দশকে বাংলাদেশে বামপন্থী ও সাম্যবাদী চিন্তার বিস্তার ঘটতে শুরু করে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটা নতুন ধরনের চেতনা দেখা দেয় এবং যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। মূলতঃ বামপন্থীদের উদ্যোগেই যারা তখন ওয়াকার্স এ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি গঠন করেছিলেন, স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল গঠিত হয় এবং কলকাতা ও হাওড়ায় তার শাখা স্থাপিত হয়— এর সভানেত্রী হন ড প্রভাবতী দাসগুপ্তা, সহ সভাপতি মুজফ্ফর আহমদ ও সম্পাদক ধরণী গোস্বামী।

১৯২৮ সালের ৪ঠা থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত ছ'দিন ধরে ধাঙড়রা কাজের শর্তের উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করে। আন্দোলন ছিল এক্যবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। দমনপীড়নের মাধ্যমে ধর্মঘট ভেঙে দেবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর মেয়রের উদ্যোগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর মীমাংসার ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। সাধারণভাবে সংবাদপত্র বা শিক্ষিত ভদ্রসমাজ ধাঙড়দের দাবী-দাওয়া সহানুভূতির চোখে দেখে নি। কর্তৃপক্ষও প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল না। এর ফলে ১৯২৮

সালের জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। শ্রমিক-কৃষক দলের সদস্যরা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ধাঙড়দের সংঘবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হন। ২৫শে জুন ইউনিয়নের দুই প্রধান কর্মকর্তা প্রভাবতী দাসগুপ্ত ও মুজফ্ফর আহমদ গ্রেপ্তার হন। ধরনী গোস্বামীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। এই প্রথম দলমত নির্বিশেষে শহরের মানুষ ধর্মঘট ধাঙড়দের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ২৮শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, খিলাফৎ কমিটি ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে সরকার ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে এলবার্ট হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কিরণশংকর রায়, মৃণালকান্তি বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশ সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও সন্তোষকুমারী গুপ্তের মত তৎকালীন বিশিষ্ট জননেতারা ভাষণ দেন ও ধাঙড়দের ন্যায্য দাবী-দাওয়া মেনে নেবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। শেষপর্যন্ত ধর্মঘট ও জনমতের চাপে কর্তৃপক্ষকে পিছু হঠতে হয় এবং ৬ই জুলাই শ্রমিকদের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শ্রমিকদের কোন শাস্তি না দেওয়া, ধর্মঘটের দরুণ বেতন না কাটা এবং মাসিক এক টাকা বেতনবৃদ্ধির কথা এতে বলা হয়। ঐদিন থেকেই ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়।^{১২} কিন্তু ধাঙড়দের ইউনিয়ন এই সময়ে স্থায়ী হতে পারে নি। সাধারণভাবে ১৯২৯ সালে সারা ভারতে বামপন্থীদের উপর যে দমনপীড়ন শুরু হয়, তার প্রভাবে অন্যান্য বহুক্ষেত্রের মত এখানেও ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন করে জোয়ার এলে, ধাঙড়দের সংগঠিত করার চেষ্টা আবার শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় কলকাতার চাইতে মফঃস্বল শহরগুলিতে যেমন হাওড়া, ভাটপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বহরমপুর, কান্দী, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতিতে ১৯৩৭ থেকে ৪০ সালের মধ্যে ধাঙড় ধর্মঘট হয়। বামপন্থী সংগঠকদের যেমন এতে ভূমিকা ছিল, ঠিক তেমনই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবচেয়ে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর নিজের মধ্যেও এক ধরনের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল যা যা তাদের নিজস্ব দাবীদাওয়া ও অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্দোলন স্বল্পস্থায়ী হয় এবং শ্রমিকদের কাজে ফেরানোর জন্য কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ আংশিক দাবী-দাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিতে বাধ্য হয়।^{১৩}

১৯৩৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হাওড়া পুরসভার প্রায় ২০০ ঝাড়ুদার বেতন বৃদ্ধি, বছরে এক মাস সবেতন ছুটি, ৪ মাসের প্রসবকালীন ছুটি এবং অন্যান্য কিছু দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করে। ক্রমশঃ ধর্মঘটীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮০। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বাড়ীভাড়া বাবদ টাকা কাটার পরিমাণ এক টাকা কমানো, পূর্ণবেতনে এক মাস প্রসবকালীন ছুটি, বদলী ঝাড়ুদারের একটি তালিকা থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পছন্দমত লোককে কাজে নিয়োগের অধিকার মেনে নিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট প্রত্যাহত

হয়। ভাটপাড়া পুরসভার প্রায় তিনশ মেথর বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ৭ই জুন ধর্মঘট শুরু করে। ৮জন ধর্মঘটী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসকের মধ্যস্থতায় মাসিক আট আনা বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিতে ৯ই জুন থেকে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালের ২৪ শে এপ্রিল ময়মনসিংহ পুরসভার ১৮৪ জনের মধ্যে ১৭৫ জন মেথর নিয়মিত বেতন দান, বেতন বৃদ্ধি, উন্নত বাসস্থান প্রভৃতি দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে। পরদিন অপরাহ্নে ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নিয়মিত বেতন দিতে ও বাসস্থানের উন্নতি ঘটাতে প্রতিশ্রুতি দেয়। ৮ই জুলাই শান্তিপুর পুরসভার প্রায় ১৫০ ঝাড়ুদার বকেয়া দু'মাসের বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। পরের দিনই ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। ১১ই নভেম্বর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ পুরসভার ঝাড়ুদাররা অক্টোবর মাসের বেতন না পাওয়ায় ধর্মঘট শুরু করে। বেতন মিটিয়ে দিলে পরের দিনই তারা কাজে যোগ দেয়। ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ভাটপাড়া পুরসভার ৪৫০ জনের মধ্যে ৩৫০ জন ঝাড়ুদার ও মেথর গত মাসের বেতন না পাওয়া, প্রায় প্রতি মাসেই বিলম্বিত বেতনের প্রতিবাদে এবং বছরে ৮ আনা হারে বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে। নিষ্পত্তির জন্য মহকুমা শাসক যে বৈঠক ডাকেন, তাতে তিনি তাঁর নিজের নেতৃত্বে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া বিচারের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গড়ার প্রস্তাব দিলে, ১৮ই ডিসেম্বর থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়।

১৯৩৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী ৬ জন নারী শ্রমিককে বরখাস্তের প্রতিবাদে গৌরীপুর পুরসভার ঝাড়ুদাররা ধর্মঘট করে। ২০শে জানুয়ারী তার কাজে ফিরে আসে। ২৮শে মে বহরমপুর পুরসভার মেথর ও ধাড়ুরা বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে। পুরসভার চেয়ারম্যান বেতন বৃদ্ধির প্রশ্রুতি শীঘ্রই বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিলে ৩০শে মে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়। বেতন বৃদ্ধি, প্রসবকালীন সুবিধা প্রভৃতি দাবীতে ৬ই জুন শান্তিপুর পুরসভার ঝাড়ুদাররা ধর্মঘট করে। দাবীগুলি সহানুভূমিতর সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ৮ই জুন তারা কাজে ফিরে যায়। একই দাবীতে মুর্শিদাবাদের লালবাগ পুরসভার ঝাড়ুদাররা ১৩ই জুন ধর্মঘট করে। দাবী বিবেচনার প্রতিশ্রুতি ও গত দু'মাসের বকেয়া বেতন নিটিয়ে দেওয়া হলে পর দিনই তারা কাজে ফিরে যায়। মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০৭ জনের মধ্যে ৯২ জন ঝাড়ুদার ১০ই জুন ধর্মঘট শুরু করে। ১২ই জুন তারা কাজে ফিরে যায়। ধর্মঘটের জন্য বেতন না কাটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কান্দী পুরসভার ৪৩জন মেথর কম ও অনিয়মিত বেতনের বিরুদ্ধে ৬ই জুন ধর্মঘট করে। মাসিক এক টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলে তারা পরের দিন কাজে ফিরে যায়। বন্যার জলে ঘর ভেসে গেলে বিকল্প বাসস্থানের দাবীতে নবদ্বীপ পুরসভার ঝাড়ুদাররা ৭ই আগস্ট ধর্মঘট করে। কর্তৃপক্ষ সাময়িক বিকল্প ব্যবস্থা করলে ৮ই আগস্ট তারা আবার কাজে যোগ দেয়। ২৬শে আগস্ট

লালবাগ পুরসভার ঝাড়ুদাররা গত জুন মাসের ধর্মঘট নিষ্পত্তির সময় কর্তৃপক্ষ যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন না করার প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। স্থানীয় মহকুমা শাসক হস্তক্ষেপ করেন। তিনি নিয়মিত বেতন, প্রসবকালীন সুবিধা ও পানীয় জলের আসু ব্যবস্থা ও অন্যান্য দাবীগুলি বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলে পরদিন ধর্মঘট শেষ হয়। ১৯৪০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সিরাজগঞ্জ পুরসভার ঝাড়ুদাররা জনৈক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, যাকে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী বলে মনে করা হত তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। স্থানীয় মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে সেদিনই ধর্মঘট শেষ হয়। ইতিমধ্যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অত্যাবশ্যক কাজকর্ম যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়, সেজন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সময়ে আর কোন ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলার বহু মফঃস্বল শহরে ধাঙুদের মধ্যে যখন সংগঠন ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন লক্ষ্যণীয়ভাবে ১৯২৯ সালের পর থেকে কলকাতা শহরের, ধাঙুদের মধ্যে কোন আন্দোলন অনুপস্থিত। কেবলমাত্র ১৯৩৮ সালের ১৫ই অক্টোবর কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চলের ধাঙু পূজার আগে বেতন না পেলে, প্রতি মাসে নিয়মিত বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে। একটি কমিটি তাদের দাবী বিবেচনা করে দেখবে এই প্রতিশ্রুতি দিলে ১৭ই ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়।^{১৩} ১৯৪০ সালের আবার সাধারণভাবে ধাঙুদের মধ্য বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে। তখনও তাদের সংগঠনের নড়বড়ে অবস্থা, কোন স্থায়ী ইউনিট নেই। বামপন্থী ভাবাপন্ন উদারনৈতিক কাউন্সিলর বেগম সাকিনা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসেন। বেতন বৃদ্ধির বহুদিনের দাবীকে কেন্দ্র করে প্রায় ১৮,০০০ ধাঙু ১৯৪০ সালের ২৬শে মার্চ ধর্মঘট শুরু করে। পুর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে এই ধর্মঘট ভেঙে দেবার পক্ষপাতী ছিল। সরকার গোড়া থেকেই উৎকট দমনপীড়ন শুরু করে। শেষপর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ওরা এপ্রিল থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। উৎসাহিত শ্রমিকেরা নতুন ইউনিয়ন গঠন করে। সভানেত্রী হন বেগম সাকিনা। কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিনিধিরা এর কর্মসমিতিতে ছিলেন, কিন্তু প্রাণকেন্দ্র ছিলেন নিঃসন্দেহ সাকিনা।^{১৪} আগেরবারগুলির মত অচিরেই আবার দেখা গেল যে প্রতিশ্রুতি পালনের কোন ইচ্ছাই পুরকর্তৃপক্ষের নেই। বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা ১৯৪০ সালের ২৬শে আগস্ট থেকে আবার ধর্মঘট শুরু করে। কর্তৃপক্ষের তীব্র উৎপীড়ন সহ্য করে বহু শ্রমিকই ছাঁটাই হয়, নেতারা বন্দী হল। এই অবস্থায় ইউনিয়ন শক্তিশীল হয়ে পড়ল ও ধর্মঘট ভেঙে গেল। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শ্রমিকরা আবার কাজে ফিরে যায়।

এই অবস্থা থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করে আবার আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগে। ইতিমধ্যে সবশ্রেণীর শ্রমিক ও কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বমূলক

সংগঠন ক্যালকাটা কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এদের তরফে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে একটি দাবীপত্র পেশ করা হয়। কিন্তু কর্পোরেশনের স্পেশাল কমিটি তা প্রত্যাখ্যান করে। সেই বছরই আগস্ট মাসে লেবার কমিশনার মহার্ষ ভাতার দাবী কিছুটা মেনে নেবার সুপারিশ করেন এবং অন্যান্য দাবীগুলি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না হওয়ায় এসোসিয়েশন ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সক্রিয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহত হয়। সরকার হোতে মহার্ষভাতা ছাড়া আর কোন দাবীই মেনে না নেওয়ায়, সংগঠনের তরফ থেকে অজস্রবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর ১৯৪৫ সালের ৭ই নভেম্বর শ্রমিক-কর্মচারীদের সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, ইতিমধ্যে তাদের দাবীগুলি মেনে নেওয়া না হলে, ২৩ শে নভেম্বর থেকে ধর্মঘট শুরু হবে বলে অবিলম্বে নোটিশ দেওয়া হোক। প্রধান দাবীগুলির মধ্যে ছিল মূল বেতন হারের পরিবর্তন, ছুটির সুযোগ, বাসস্থানের সুযোগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সর্বোপরি অস্বাধীনভাবে নিযুক্ত কর্মী (যেমন ধাঙড়দের) চাকরীর স্থায়ীকরণ।^৭ এই দাবীগুলির সমর্থনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জনসভার আয়োজন করা হয়। মীমাংসার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ২৩ তারিখে ধর্মঘট শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় যে এই প্রথম মেথর-ধাঙড়দের পাশাপাশি কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি “হোয়াইট-কলার” কর্মীরাও একই সঙ্গে ধর্মঘটে অংশ নেয়। বিশ হাজার মানুষের এই ধর্মঘটে জনজীবন প্রায় অচল হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে প্রায় একই সময়ে আই.এন.এ. বন্দীমুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে গণবিক্ষোভে তখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল শহর কলকাতা। ধর্মঘট মীমাংসার পদ্ধতি নিয়ে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ২৫শে নভেম্বর রাতে মেয়র ও এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সভাপতি সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী (যিনি নিজে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী কাউন্সিলর ও কর্পোরেশনের এক প্রভাবশালী উপদলের নেতা ছিলেন)র মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এক মীমাংসা হয়। এর শর্ত অনুযায়ী, ধর্মঘটীদের কোন শাস্তি হবে না বা বেতন কাটা হবে না; অদক্ষ শ্রমিকরা ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০ টাকা করে মূল বেতন পাবে; দক্ষ শ্রমিক ও কেরানীদের বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কমিশনারদের প্রতিনিধি ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে যারা ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেবে। ২৬শে নভেম্বর থেকে ধর্মঘটীরা কাজে যোগ দেবে।^৮

কিন্তু অধিকাংশ ধর্মঘটাই এই মীমাংসা সূত্র প্রত্যাখ্যান করে। এই পর্বে কমিউনিস্টরা প্রাধান্য অর্জন করেন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে ২৬শে নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন গোপাল আচার্য (বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা), প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদক বীরেন রায়। এই সভা এক প্রস্তাবে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির একতরফা

নিৰ্বাণ বসু

ধৰ্মঘট প্রত্যাহাৰে সিদ্ধান্তকে অন্যায় ও অগণতান্ত্ৰিক আখ্যা দিয়ে এই মীমাংসা সূত্র প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জনায়। শ্রমিকরা কখনই কাজে ফিৰে যাৰে না যদি তাদের প্রধান দুটি দাবী মানা না হয়— এগুলি হল, আশু বেতন বৃদ্ধি এবং চাকুরীৰ স্থায়ীকরণ।^৮

এই পৰিস্থিতিতে ২৭ শে নভেম্বৰ ওয়াকার্স ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মেয়রের দীৰ্ঘ বৈঠকের পর স্থির হয় যে, পূৰ্ব ঘোষণার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত দাবীগুলি মেনে নেওয়া হবে—১৯৪৫ সালের ডিসেম্বৰ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পায় এমন সমস্ত দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক, কৰ্মচাৰী নিৰ্বিশেষে ৩ টাকা করে বৰ্ধিত বেতন পাবে (যতদিন পর্যন্ত না আরও বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে বেতনক্রম স্থির হচ্ছে ততদিন এটা বলবৎ থাকবে), এক বছর অন্ততঃ কাজ করেছে এমন সব অদক্ষ শ্রমিক বছরে পনেরো দিন সবেতন ক্যাজুয়াল ছুটি বা অসুস্থতার দৰুণ ছুটি ভোগ করবে, স্পেশাল কমিটি সক্রিয়ভাবে অদক্ষ কৰ্মীদের অবসরের পর স্পেশাল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে। ২৮ শে নভেম্বৰ থেকে ধৰ্মঘট প্রত্যাহত হবে। মীমাংসা আলোচনায় কৰ্পোরেশনে দুই কমিউনিস্ট কাউন্সিলর সোমনাথ লাহিড়ী ও মহঃ ইসমাইল ছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তৰ্ভুক্ত প্রায় সব কটি গোষ্ঠীর নেতারা ই উপস্থিত ছিলেন— সভাপতি মৃণালকান্তি বসু, মৈত্ৰেয়ী বসু, সুরেশ ব্যানাজী (বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন গোষ্ঠী), শিবনাথ ব্যানাজী (সমাজতন্ত্রী), রজনী মুখার্জী (রায়বাদী), সুধীন প্রামাণিক প্রভৃতি এবং বেগম সাকিনা।^৯ নিঃসন্দেহে, এই ধৰ্মঘটের ফলে শ্রমিকরা, বিশেষতঃ ধাঙড়রা, কিছুটা লাভবান হয়েছিল। আর এইবারেই সৰ্বপ্রথম কৰ্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তিকে আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার আগে এটাই শেষ ধাঙড় ধৰ্মঘট।

পৰিশেষ বলতে হয়, সরাসরি শি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত না হলেও এই নিষ্কাশন কৰ্মীরা তাদের বিপুল সংখ্যা ও নগরজীবনে অপরিহার্যতার দণ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক বিশিষ্ট ংগন অধিকার করে আছে। এদের লড়াই দেশী বা বিদেশী কোন শি পতির বিদ্ধে ছিল না, ছিল পৌর কর্তৃপে র বিদ্ধে। সে কর্তৃত্ব অধিকাংশ সময়ই ছিল দেশীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতে। তবু এদের দাবীপূরণ সহজে হয় নি, সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণীর ্রতি মানবিক দায়িত্ব পালনেও কর্তৃপ থেকেছে পরাজুখ। শি তি ভদ্রশ্রেণীর কাছেও এদের আন্দোলন তেমন কোন গু ত্ব পায় নি। একেবারে শেষ পৰ্বে এসে সকল ংস্ৰের শ্রমিক-কৰ্মচাৰী আন্দোলনের সঙ্গে মেথর-ধাঙড়দের আন্দোলন যখন মিলে গেছে কেবল তখনই তা এক নতুন পৰ্বে উত্তীৰ্ণ হতে পেরেছে। অন্য সবাকার হাতে হাত মিলিয়ে ধাঙড়রাও শরিক হয়েছে এক বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনের।

সূত্র নির্দেশ

১. পুলকেশ রায়, দ্য স্টোরী অব দ্য মেথর স্টাইক ইন ক্যালকাটা ইন এইট্রিন সেভেনটি সেভেন(রিভোল্ট স্টাডিজ, ভল্যুম ১, নং ১, জুন, ১৯৮৫) এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।
২. পঞ্চানন সাহা, দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, নিউ দিল্লী, পৃ: ১০২-৪।
৩. গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম (পলিটিক্যালএ) কমফিডেন্সিয়াল ফাইলস নং ৪৮৪/১৯৩৭, ৩৮১/৩৮, ১৩২/৩৯ এবং ৩২/৪০—রিপোর্টস অন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস সিরিজ।
৪. গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম (পলিটিক্যালএ) কমফিডেন্সিয়াল ফাইলস নং ৪৮৪/১৯৩৭, ৩৮১/৩৮, উইকলি রিপোর্ট অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস ডেটেড ২১.১০য় ১৯৩৮ ও ৩১.১০.১৯৩৮।
৫. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার ধাড়ু ধর্মঘট এবং প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও সাকিনা বেগম, ১৯২৮-৪০, ইতিহাস অনুসন্ধান ২, কলকাতা, ১৯৮৭
৬. অমৃতবাজার পত্রিকা — দ.১১.৪৫, ১১.১১.৪৫
৭. ঐ, ২৬.১১.৪৫
৮. ঐ, ২৭.১১.৪৫
৯. ঐ , ২ ৮ . ১ ১ . ৪ ৫



Class - Caste Relations

১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক কর্তৃক ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড (DNA) ও রিবোনিউক্লিক এসিড (RNA) এর গঠন বৈচিত্র্য আবিষ্কারের পর অনুজীববিদ্যা (Molecular Biology) এবং জিনবিদ্যা (Genetics) - এর বিকাশ খুব দ্রুত ঘটেছে। এই দুটি বিষয়ে ত্রুণাগত গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে যে বিশাল জ্ঞানভান্ডার তৈরী হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে কোন জীব প্রজাতির যাবতীয় গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে জিনের মধ্যে। এজন্য আলোচনা এবং চর্চায় জিন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে গবেষণার অঙ্গন ছাড়িয়ে জিন সম্পর্কে কিছু অতিকথনও তৈরী হয়েছে। মেধা - বুদ্ধির মত আচরণগত বৈশিষ্ট্যও জিনের মধ্যে নিহিত' — এরকমই একটা অতিকথন। এরকম ধারণার বিস্তারে কিছু কিছু বিজ্ঞানীরও ইচ্ছা আছে। হাতের কাছে বিজ্ঞানী ওয়াটসনই একজন বড় উদাহরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন কালো মানুষেরা জন্মগতভাবেই সাদা মানুষদের চাইতে কম বুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থাৎ বুদ্ধি-মেধা-নামক বৈশিষ্ট্যটি জিনের মধ্যে নিহিত। বাস্তবে এরকম ধারণার সমর্থনে জিন সম্পর্কিত তথ্য ভান্ডার থেকে কোন তথ্য বা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জিন কি?

জিন মূলতঃ DNA অণু। অতএব জিনের পরিচয় জানতে হলে জানতে হবে DNA এর পরিচয়। DNA অন্যান্য রাসায়নিক যৌগের মত নয়। এটাকে বলা যেতে পারে অনেকগুলি যৌগের অণু দিয়ে তৈরী একটি বৃহৎ অণু। প্রথম ধাপে একটি ফসফেট (মূলক), একটি ডিঅক্সিরিবোস সুগার অণু ও একটি নাইট্রোজেন ক্ষার অণু একত্র যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অণু তৈরী হয়। একে নিউক্লিওটাইড বলে। নাইট্রোজেন ক্ষার যৌগ পাঁচ রকমের, যথা অ্যাডেনাইন (A), গনাইন (G), সাইটোসাইন (C), থায়ামিন (T) ও ইউরাসিল (u)। এদের মধ্যে A,G,C ও T DNA তৈরীতে প্রয়োজন এবং RNA তৈরীতে প্রয়োজন A,G,C ও u। অতএব DNA এর ক্ষেত্রে চার রকমের নিউক্লিওটাইড হতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে দুটি নিউক্লিওটাইড (A-T অথবা C-G) আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিওটাইড জোড়া গঠন করে। তৃতীয় ধাপে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড জোড়া লম্বালম্বিভাবে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড - জোড়ার একটি শৃংখল (Chain) তৈরী করে। এটাই DNA অণু।

জিন কোথায় থাকে ?

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র জীবকে বাদ দিলে এই পৃথিবীতে যত জীব প্রজাতি রয়েছে তাদের প্রত্যেকেই জীবকোষ দিয়ে তৈরী। ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে যেমন একটি বাড়ী তৈরী হয় তেমনি অসংখ্য জীবকোষ সজ্জিত হয়ে একটি জীবদেহ তৈরী হয়। একটি জীবকোষের প্রধানত: তিনটি অংশ, যথা কোষপ্রাচীর, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার ঘন অংশ থাকে। একে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াসের চারপাশে জেলির মত পদার্থকে সাইটোপ্লাজম বলা হয় যা কোষপ্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সর্ব সূতোর মত এক ধরণের পদার্থ থাকে। একে ক্রোমোজোম বলা হয়। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের অবস্থান। মরুভূমি ও বালুকণার মধ্যে যেমন সম্পর্ক, ক্রোমোজোম ও জিনের মধ্যেও ঠিক তেমন সম্পর্ক। ক্রোমোজোম একটি নাম মাত্র। অসংখ্য জিন পরপর লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত হয়ে একটি আকার তৈরী করে। এই আকারটাই ক্রোমোজোম। আকারের কোন নির্দিষ্টতা নেই। বিভিন্ন রকম ক্রোমোজোম হতে পারে।

জিন কীভাবে থাকে ?

জিন ক্রোমোজোমে সুনির্দিষ্ট নিয়মে অবস্থান করে। বস্তুত: ক্রোমোজোম এবং জিনই একটি প্রজাতির পরিচয় বহন করে। কোন একটি প্রজাতির যে কোন জীবদেহের যে কোন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই সংখ্যাটিই উক্ত প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা। উদাহরণ - হিসেবে মানুষ প্রজাতির কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে কালো-সাদা, লম্বা-খাটো, রোগা-মোটা, হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি মানুষ যেখানে যত থাকুক না কেন প্রত্যেকের শরীরে প্রতিটি জীবকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এটা মানুষ প্রজাতির একটা পরিচয়। কিন্তু শুধু এই সংখ্যা দিয়ে পরিচয় যথেষ্ট নয়। পৃথিবী অসংখ্য জীবপ্রজাতির বাসভূমি। অতএব প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যাকে যদি অন্য সবার চাইতে পৃথক হতে হয় তাহলে কোন কোন প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা দাঁড়াবে লক্ষতে বা কোটিতে। জৈব বিবর্তন এভাবে হয়নি। একটি প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেও জৈব বিবর্তনের পথে অন্যান্য প্রজাতি থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য সূচিত হয়েছে ক্রোমোজোমের গঠন ও আকৃতিতে এবং জিনের সংখ্যা ও গঠনে। অতএব একাধিক প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা একই রকম হতে পারে, কিন্তু ক্রোমোজোমের গঠনও আকৃতি এবং জিনের সংখ্যা ও গঠন একই রকম হবে না। বিষয়টি আমরা উদাহরণের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করব। ধরা যাক, মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের কথা। জোড়া ক্রোমোজোমের গঠন, আকৃতি ও জিন সংখ্যা একই। জোড়ার একটি

মায়ের থেকে আসে অপরটি পিতার থেকে আসে। ক্রোমোজোমে জিনগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট। ধরা যাক, ৩নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রত্যেকটিতে পরপর দশটি অবস্থান আছে এবং প্রথম অবস্থানে যে জিনটি আছে তার জিন A। অতএব প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কোষে ৩নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রথম অবস্থানে A নামক জিন থাকবে। এভাবে প্রতি জোড়া-ক্রোমোজোমে অবস্থান সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং প্রতিটি অবস্থানে একটি নির্দিষ্ট জিনের আশ্রয়। অন্যান্য প্রজাতিতেও বিষয়টা একইরকম, অর্থাৎ ক্রোমোজোমের গঠন, আকৃতি, অবস্থান সংখ্যা ও প্রতিটি অবস্থানে আশ্রিত জিন — এই সব মিলিয়ে কখনই দুটি ক্রোমোজোম সদৃশ হয় না। জৈব বিবর্তনের পথে এভাবেই একটি প্রজাতি অন্যায় প্রজাতি থেকে পৃথক হয়েছে।

জিন কেন অন্য সকল রাসায়নিক যৌগ থেকে পৃথকঃ

জিন তথা DNA অনু অন্য যে কোন রাসায়নিক যৌগ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক। একটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে বলা যেতে পারে জিনের স্ব বিভাজন (Self replication) প্রক্রিয়া। একটি DNA অণু যদি তার গঠনগত উপাদান তিনটির সরবরাহ ঠিক ঠিকভাবে পায় তাহলে একটি DNA অণু স্ববিভাজন প্রক্রিয়ায় নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে সক্ষম। প্রথমে DNA অণুটি লম্বালম্বিভাবে একসারি নিউক্লিওটাইডের শৃংখলে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি শৃংখল তার চারপাশ থেকে ডিঅক্সিরিবোস সুগারের অণু, ফসফেট মূলক এবং নাইট্রোজেন ক্ষারের অণু সংগ্রহ করে একটি পরিপূরক শৃংখল তৈরী করে নিজের সাথে যুক্ত করে নেয়। এভাবে একটি DNA অণু থেকে দুটি DNA অণু তৈরী হয়। DNA অণু স্ববিভাজন বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমোজোমে বিভক্ত হতে পারে এবং একটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমোজোমে বিভক্ত হতে পারার জন্য একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হতে পারে। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব না থাকলে একটি জীব দেহ থেকে আর একটি অপত্য জীবদেহের জন্ম এবং জন্মের পর অপত্যের পরবর্তী পরিবর্ধন (Growth) সম্ভব হোত না।

জিন কি করে ?

কোষবিভাজন ছাড়া জিনের একটিই নিয়মিত কাজ এবং তা হোল প্রোটিন তৈরী করা। একটি জীবদেহে অসংখ্য শারীরবৃত্তীয় কাজ আছে। প্রতিটি কাজে প্রোটিনের প্রয়োজন। কাজ ও প্রয়োজনের ধরণ অনুযায়ী প্রোটিনের বিভিন্ন নাম। কোন শ্রেণীর নাম উৎসেচক (Enzyme), কোন শ্রেণীর নাম হরমোন, কোন শ্রেণীর নাম নিউরো প্রোটিন ইত্যাদি। মানুষের শরীরে সব মিলিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। অনেক প্রোটিনের খবর এখনও জানা নেই। যাই হোক, একটি জিন একটিই

প্রোটিন তৈরী করে। ২০ রকমের অ্যামাইনো এসিড এবং ৬৪ টি জিন - সংকেত (Genetic Code) - এর সাহায্যে কোষস্থ জিনসমূহ এই প্রোটিনগুলি তৈরী করে। এখন প্রশ্ন হোল সব কোষেই তো ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম সহ সব জিন থাকে। তাহলে কি প্রতি কোষেই সব প্রোটিন তৈরী হয়? অবশ্যই নয়। এ ব্যাপারে কোষেদের মধ্যে বেশ সুশৃংখলভাবে দায়িত্ব ভাগ করা আছে। যেমন অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ শুধু ইনসুলিন হরমোন তৈরী করবে বা থাইরয়েড গ্রন্থীর কোষ থাইরয়েড হরমোন তৈরী করবে ইত্যাদি বিটা কোষে বা থাইরয়েড গ্রন্থীর কোষে অবশিষ্ট জিনগুলি নিষ্ক্রিয়। এভাবে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রোটিন তৈরীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট এবং তার জন্য জিনও নির্দিষ্ট। কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

জিন কীভাবে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে :

আমরা পূর্বেই বলেছি জীবদেহের যাবতীয় গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য জিনের মধ্যে নিহিত। জিন যে কোন বৈশিষ্ট্যকেই নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে। রক্তে কতটা গ্লুকোজ থাকবে জিন তা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন নামক প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে। এটা একটা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য। একইভাবে গায়ের রঙ কেমন হবে, শরীরের দৈর্ঘ্য কেমন হবে, চোখের মণির রঙ কেমন হবে — প্রভৃতি গঠনগত বৈশিষ্ট্যও জিন প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই দুধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা (Variation) প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। যেমন ইনসুলিন উৎপাদক জিনের কথাই ধরা যাক। রক্তে গ্লুকজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ শুধু মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। কোটি কোটি বছর ধরে জিনটি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একইরকম রয়েছে, এর কোন মিউটেশন ঘটেনি বা যদি কোন প্রজাতির কোন জীবদেহে কখনও এই জিনে মিউটেশন ঘটেও থাকে তাহলে সেই জীবসদস্যটি জন্মের পর অচিরেই তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনের মিউটেশন প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী (Lethal)। বিপরীতে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে চিহ্নটা ভিন্ন। একই গঠনগত বৈশিষ্ট্য একাধিক রকমের হতে পারে। যেমন মানুষের গায়ের রঙ — সাদাও হতে পারে কালও হতে পারে। এভাবে বিভিন্ন গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা দেখা যায়। অতএব একই গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিনের অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। তবে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের যে অবস্থানটি বরাদ্দ সেই অবস্থানেই সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সব জিন থাকবে। তাহলেতো মানুষের মধ্যে অথবা অন্য কোন জীবদেহে একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য জোড়া ক্রোমোজোমের সমঅবস্থানে দুটি জিন একইরকম নাও হতে পারে। হ্যাঁ, গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব। কিন্তু দুটি জিনের মধ্যে একটি জিন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। অপরটি

নিষ্ক্রিয় থাকবে। কখনও যদি একই বৈশিষ্ট্যের দুটি জিনই একই রকম হয় তাহলে দুটির যে কোনটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

জৈব বিবর্তনের পথে গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত জিন গুলিতে যে সব মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটেছে তার সবগুলি প্রাণঘাতী ছিল না। এজন্যই অনেক মিউটেশন টিকে গেছে। যে কারণে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনীয়তা দেখা যায়।

মানব জেনম

মানুষের যে কোন কোষে মোট যে পরিমাণ DNA বা জিন থাকে তাকে একত্রে জেনম বলে। মানব জেনমের সমস্ত জিনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট কার্যকরী জিনের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০ এবং অকার্যকরী বা Pseudo জিনের সংখ্যা ২০,০০০ এর বেশী। কার্যকরী জিনের দ্বিতকরণ বা Duplication ঘটান ফলে সিউডো জিনের জন্ম। একটি সিউডো জিন অবশ্যই কোন না কার্যকরী জিনের প্রতিলিপি। একটি কার্যকরী জিনে গড়ে প্রায় ২৭০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। জিনেরও আবার পুরো অংশটা কার্যকরী নয়। একটা জিনের যে যে অংশ কার্যকরী, অর্থাৎ যে যে অংশের নিউক্লিওটাইড জোড়া প্রোটিন উৎপাদন করে তাকে এক্সন বলে। একটি জিনে গড়ে এক্সনের সংখ্যা ১০.৪ এবং একটি এক্সনে গড়ে ১৪৫ টি জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে, অর্থাৎ একটি জিনে গড়ে ২৭০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকলেও প্রোটিন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে মাত্র ১৫০০ এর মত জোড়া নিউক্লিওটাইড। অতএব সব মিলিয়ে মানুষের একটি কোষে ৩৭৫০০০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড প্রোটিন উৎপাদনে সক্রিয় হতে পারে, কিন্তু হয় না। একটি প্রোটিন উৎপাদনের জন্য যে কটি জোড়া নিউক্লিওটাইড প্রয়োজন সেই ক'টি জোড়াই একটি কোষে সর্বদা সক্রিয় থাকে।

একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ সাধারণত একটিই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে এবং এজন্য অঙ্গটি যত কোষ দ্বারা গঠিত তারা সবই একইরকম হয় এবং কোষগুলির প্রত্যেকটিই একটি প্রোটিন তৈরী করে। অর্থাৎ কোষগুলিতে - ২৫০০০ জিনের মধ্যে একটি জিনই সক্রিয়। বাকী ২৪৯৯৯ টি জিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু অঙ্গ আছে যাদের শারীরবৃত্তীয় উদ্দেশ্য একই রকম হলেও উদ্দেশ্য পালনে একাধিক প্রোটিন প্রয়োজন। ফলতঃ অঙ্গটি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর কোষের সজ্জা থাকে এবং এক এক অংশের সজ্জায় এক এক রকম প্রোটিন তৈরী হয়। মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি এধরণের যৌগিক অঙ্গের উদাহরণ।

জিন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য (Behavioural Character)

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা থেকে জিন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জেনেছি তা

থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে একমাত্র শারীরবৃত্তীয় ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সাথেই জিনের সম্পর্ক। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে জিনের কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তবেও এটা যুক্তিযুক্ত। জিন যদি প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত তাহলে অভিযোজন শব্দটি অর্থহীন হয়ে যেত। বিবর্তিত হওয়ার পর একটি প্রজাতি তার অভিযোজন তৈরী করে। অভিযোজন তৈরী এবং তা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটি প্রজাতির আচরণগত বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়। যদি কোন প্রজাতি তার বিবর্তনের সাথে সাথে অথবা অব্যবহিত পরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজন তৈরী করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই প্রজাতির কাছে একমাত্র বিকল্প পথ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া। এভাবে অসংখ্য প্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বিপরীতে অভিযোজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি জিন থাকত তাহলে অভিযোজন তৈরীতে কখনই ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্ন উঠত না। অতএব আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে জিনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে না। কোন প্রজাতি তার গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই অভিযোজন নির্মাণ করে, কিন্তু অভিযোজন কখনই গঠনগত বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়।

এ বিষয়ে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। একবার অভিযোজন তৈরী হলেই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন প্রজাতির সদস্যরা অনুশীলন করতে পারে না। প্রজাতির প্রতিটি সদস্যকে অভিযোজন নির্মাণ পদ্ধতি অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে শিখতে হয়। বাসা তৈরী করতে পারে এমন পাখীর ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথেই যদি সেই বাচ্চাকে পৃথক পরিবেশে বড় করা হয় তাহলে পরিণত বয়সে সেই পাখীর পক্ষে আর বাসা তৈরী করা সম্ভব নয়। কোন জিন সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের সাথে যদি পাখীর বাসা তৈরীর বিষয়টি সম্পর্কিত হোত তাহলে বাসা তৈরী করা শেখার দরকার হোত না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাখী বাসা তৈরী করতে পারত।

মেধা তথা বুদ্ধি ও জিন

আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি মেধা, বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আচরণগত বৈশিষ্ট্য। এটা মেনে নিলে আর ব্যাখ্যা বা আলোচনার কোন প্রয়োজনই থাকে না। অতএব সহজ পথে বিচরণ না করে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদিকে গঠনগত বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য চলা যায় কিনা। গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ এই শব্দগুলির নামে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। অতএব ভেবে দেখতে হবে এগুলি শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য কিনা। যে কোন শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু শর্তের অধীন। প্রথমত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের কাছে সমানভাবে প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যকে চলমান রাখার জন্য

কোন চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজন থাকে না। তৃতীয়ত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান শরীরের মধ্যেই সংশ্লেষিত হয় এবং এজন্য শরীর নিরপেক্ষ পরিবেশের কোন ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। মেধা ও বুদ্ধির অবস্থান এই শর্তগুলির ঠিক উপরে। প্রথমত: সব মানুষের বুদ্ধি ও মেধা সমান নয়, অর্থাৎ সব মানুষের কাছে বুদ্ধি ও মেধা সমানভাবে প্রয়োজনীয় নয়। দ্বিতীয়ত: চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটে না। তৃতীয়ত: মেধা ও বুদ্ধি যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয় তার সবগুলির অবস্থানই শরীর নিরপেক্ষ পরিবেশে। অতএব মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভার মত বিষয়গুলিকে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখারও কোন সুযোগ নেই এবং অনিবার্যভাবেই মেধা ও বুদ্ধি মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

বুদ্ধি, মেধা — শব্দগুলি শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য প্রাণী প্রজাতিতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে যে সব প্রাণী প্রজাতির প্রকৃতি-পরিবেশের উপাদানকে পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের অভিযোজন গড়ে তুলেছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও মেধার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কোন প্রজাতি এ ধরনের অভিযোজন গড়ে তোলে প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। মানুষও একই ভাবে তার অভিযোজন গড়ে তুলেছে। তবে মানুষের এটি একটু পৃথক। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি এজাতীয় উৎপাদন মূলক অভিযোজন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিল যেখান থেকে ত্রৈলোক্য পরিবর্তনশীল এক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছিল। এইজন্য মানুষের মেধা ও বুদ্ধি আরও বেশী আলোচ্য হয়ে উঠেছে। অন্যান্য এজাতিদের মত যদি মানুষের অভিযোজন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যেত তাহলে মেধা ও বুদ্ধির প্রয়োজন হোত না। অতএব অন্যান্য এজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি মেধা কেন বেশী এবং মানুষের মধ্যেও আবার কারো কারো মেধা-বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী তার কারণ - নিহিত রয়েছে মানুষের পরিবর্তনীয় (Variable) সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে। পরিবর্তে জিন বা মস্তিষ্কের ঘাড়ে বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার মত বিষয়গুলির দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারলে মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন বিভেদগুলিকে সামাজিক ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরা অনেক সহজ এবং পাশাপাশি শ্রেণী শোষণকে মান্যতা দেওয়া আরও সহজ।

একটি অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে এই আলোচনার মূল প্রশ্নগুলির সূত্রপাত। অনুষ্ঠান একজন দলিত লেখকের একটি বই প্রকাশ হবে, সঙ্গে গান, লেখকের পরিচয় ইত্যাদির আয়োজন। যেখানে আমাদের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধার, ভালোবাসার গায়ক তাঁর গানের আগে যে কথাগুলি বলেছিলেন, প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল তখনই। ওই গায়ক-কবির বক্তব্য, লেখকের আবার দলিত বা উচ্চবর্ণ এই পরিচয় থাকবে কেন। তাঁর রচনা বিচার করতে হবে দৃষ্টিশীলতার মাপকাঠি দিয়ে। খারাপ বা অপাঠ্য রচনা, কিংবা উৎকৃষ্ট বা সুপাঠ্য রচনা - বিভাজন তো হওয়া উচিত মাত্র এই দুটি ভাগে। আমরা মাঝেমাঝেই দলিত বা প্রান্তিক বিশেষণের ভেতর দিয়ে সেই লেখকের প্রতি কি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আকাঙ্ক্ষা করি! শিল্পের ক্ষেত্রে, দৃষ্টির জগতে এই প্রত্যাশা কি লেখকের সক্ষমতাকেই কিছুটা করুণা-র চোখে দেখার একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয় না। একজন পরিশ্রমী দরদী লেখকের পক্ষেও এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সম্মানের। - বেশ কিছুদিন আগের অনুষ্ঠান তো, ফলে যা যা ওই সম্মানীয় গায়ক বলেছিলেন, তা একেবারে সেইরকমই মনে নেই, তবে বক্তব্যের নির্যাস যে এই, সে বিষয়ে নিশ্চিত।

এখন শি দৃষ্টি র জগতে ভালো বা মন্দের একটা সোজা-সাঁটা বিভাজন করে নেওয়াটাও খুব যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। সেটা নির্ভর করে তো পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের অবস্থানের উপর। এটীন সব উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকে, শোনা যায়, মঞ্চের মাঝখানে বা পাশে একটা লাঠি জর্জর পুঁতে রাখা থাকতো, যাতে ওই নাটকের রস আত্মদানে অম অনার্য বা একুতজনেরা কোনো গোলমাল বাধালেই ওই দিয়ে শায়েশ করতে হতো। যেটা বোঝাতে চাইছি, সেটি হচ্ছে, ওই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকও কারো কারো কাছে, বা কোনো জনগোষ্ঠীর কাছে কোনো, আবেদনই নিয়ে আসে না। ওই অনুষ্ঠানে একুত অর্থেই ব্রাত্যজন তাঁরা। আবার এই প্রান্তিক, জনগোষ্ঠীর শি চর্চাও আমাদের মতো চিবান উচ্চবর্ণীয়দের কাছে অশিষ্ট, কুৎসিত বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য লোকশিল্পে কে নানাভাবে ও ত্ব নিজেদেরই মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমাণের হাস্যকর এচো ও ওই চিবান উচ্চবর্ণীয়দের মধ্যে লয় করা যায়। এ বিষয়ে আখতা জ্জামান ইলিয়াস-এর সংস্কৃতির ভাঙা সেতু এক অত্যন্ত এমাণ্য সুপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

তবে ওই শ্রদ্ধেয় গায়ক যেভাবে ভালো-মন্দের বিভাজন করতে চাইছিলেন, সেটা যতটা না ব্যাখ্যার, তার চেয়ে অনেক বেশি, বিবেচনার। ভালো বা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের কতগুলি চিহ্ন যদি লেখকের রচনায় থাকে, তাহলেই তার সর্বজনগ্রাহ্যতা, আর সেই চিহ্নসমূহ কী কী, সেইসবই সাহিত্যের তত্ত্ব মীমাংসার বইতে সুন্দর করে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের বিবেচ্য বিষয়, একজন শ্রষ্টার আগে কেনই বা ওই দলিত বা তৃতীয় বিশ্বের লেখক ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হবে। সাহিত্য তো সাহিত্যই, ওই উৎকৃষ্ট বা অপার্য।

বিষয়টি একটু অন্যদিক থেকে দেখা যাক। এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার পর কোনো একজন সুস্থ সবল মানুষের প্রতি আমাদের যতটা সম্মান শ্রদ্ধা, একজন শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষেরও সেই শৃঙ্গর্য কি তার চেয়েও বেশি বিস্ময় উৎপাদন করে না। হিমালয়ের শত সহস্র বাধা তো আছেই, সেই শৃঙ্গ দখলকারী তার সঙ্গে জয় করেছেন নিজের অক্ষমতাজনিত সীমাবদ্ধতাকেও - এ কী কম বড়ো কথা! ওই দলিত বা প্রান্তিক লেখকের কথা প্রসঙ্গে এই তুলনা নেহাৎ প্রক্ষিপ্ত নয়। সামাজিকভাবে ওইসব প্রান্তিক দলিত মানুষদের প্রতিমুহুর্তে শারীরিক মানসিক দিক থেকে পঙ্গু, অথর্ব করে দেবার প্রক্রিয়া এই সমাজে বিদ্যমান। আমরা যারা উচ্চবর্ণের ঘর-বসতিতে অভ্যস্ত, আমাদের পক্ষে প্রতিদিনের ওই অপমান, নির্যাতন ধারণাতে নিয়ে আসাও আদৌ সহজ না। মৃত্তিকা প্রকাশনী-র দলিতের আখ্যানবৃত্ত বইতে লেখক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই উল্লাসিকতার একটি অসামান্য উদাহরণ দিয়েছেন। প্রগতিপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক একজন শিক্ষক কী অনায়াসে বলেন, ‘...মুড়ি মিছরি সব এক হয়্যা গেছে। সাঁওতাল বাউরি-খয়ারদের ঘর থিক্যা ছেলে আসছে। রেজান্টটি ভালো হব্যা কেমন করে? ইদের ঘরে কি শিক্ষা আছে? শিক্ষাটি পাবে কুথাকে? (পৃ:১৮৪) ওই শিক্ষা দেবার দায়িত্ব যে তাঁর উপর, এবং ওইজন্যেই যে উনি মাস গেলে হাত ভর্তি মায়না পান, সেটি সহজেই বিস্মৃত হন ওই শিক্ষক। এবং তারও পরে ওইসব দলিত, প্রান্তিক মানুষদের উঠে আসার ক্ষেত্রে তাঁরা, ওই শিক্ষকেরা যে নির্মম, কঠিন বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়ান, তা এক কথায় অবর্ণনীয়। আমরা যারা চুণী কোটালের মৃত্যুতে মোমবাতি জ্বলাই, বা গান বাঁধি, প্রতিদিন যে হাজারো চুণী-র আলো মুছে যাওয়া, সামাজিক সেইসব ব্যবস্থাপনার হাজারো নিমর্মতা সম্পর্কে আমরা কিন্তু নিঃশব্দ, নির্বাক! এবং হয়তো প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে আমরাও কি ওই অবদমনের সহায়ক নই!

একজন দলিত লেখককে যে কতরকম বাধা ঠেলে হটিয়ে উঠে আসতে হয়, সে জানেন একমাত্র তাঁরাই। তার মানে এই নয় যে, কেবলমাত্র দলিত বলে, প্রান্তিক বলে যে কোনো রচনা বা যে কোনো সৃষ্টকর্মকেই মহত্তম বলে প্রচারের একটা চেষ্টা নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইক্ষেত্রে প্রয়োজন দুই ভিন্ন প্রকার লালনের। কিংবা, হয়তো একই

লালনের দুটি পাঠ। প্রথমত: যখন এই স্রষ্টাদের সৃষ্টিকে তথাকথিত সমালোচনা-র সামনে নিয়ে আসা হবে, তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাঁদের উঠে আসার সেই অবর্ণনীয় অধ্যায়গুলিকে। তাতে কোনো কন্সিডারেশন্ - এ গ্রেস্ নম্বর দিয়ে দেওয়া নয়, কিন্তু ভিন্নতর হতে হবে আমাদের সমালোচনার পদ্ধতিটি। তাঁর দৃষ্টির উৎকর্ষ নিয়ে অবশ্যই কথা হতে পারে, কিন্তু তার আগে প্রয়োজন, ওই স্রষ্টাকে তাঁর, অদমিত চেষ্টার জন্য যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন। বাক্যে, বা পুরস্কারে, বা গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়ার বাইরে, এ আমাদের একেবারে মননগত শ্রদ্ধা। ওই, বাহ্যিক সম্মান - শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের হাজারো পন্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকলেও আজও লোক শিল্পমেলার অসামান্য পাট চিত্রকর আর কোলকাতার অসামান্য জলরঙের শিল্পী-র প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের যে মননগত বৈষম্য, পরিশুদ্ধির প্রয়োজন সেইখানে। আর ওইখান থেকেই উঠে আসে লালনের দ্বিতীয় পাঠ - ওইরকম দলিত বা প্রান্তিক স্রষ্টাদের সামনে নিয়ে আসার প্রয়াস। এই সৃষ্টির জগতেও যে তাঁদের সমান অধিকার, আবারও বলা প্রয়োজন, কেবল দলিত হিসাবে না, একজন স্রষ্টা হিসাবেই, সেটাও তাঁদের কাছে বার বার তুলে ধরতে হবে আমাদের - আমরা যারা কেবলমাত্র বর্ণের ভিত্তিতে অনেক কিছু অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম।

এবং এই প্রক্রিয়ায় আরেকটি ঘটনাও ঘটে। একজন দলিত স্রষ্টার এই পরিচিতি ওইরকম পেছনে ফেলে রাখা মানুষদের কাছে এই বার্তা-ও নিয়ে যায়। আমরাও পারি — হয়তো এই উচ্চারণ আরো হাজারো জনের ভেতর একটা প্রত্যয়ের শেকড় পরিয়ে দেবে। এবং সেটা যে দেয়ও, সে উদাহরণও অনেক। আসামে অখ্যাত ঢোলবাদক মঘাই ওঝা বা ওজা একটি কিংবদন্তি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেই শু আসাম রাজ্য সম্মে লনে ঢোলবাদক হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন তিনি। এর আগে জেনে নেওয়া যেতে পারে, ওই অঞ্চলে ওজাদের সামাজিক অবস্থান। উচ্চবর্ণের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে এঁরা ঢোল বাজাতে আসেন, তাঁরা দাওয়ায় ওঠার অধিকারী নন, থাকা-খাওয়া সবই বাড়ির পেছন দিককার গোয়ালঘরে। ওঁদের খাবার-দাবারও বিছোনো কলা-পাতায় বেশ উঁচু থেকে ঢেলে দেওয়া হতো। এদের প্রতি বাকি আর সব সামাজিক ব্যবহার সহজেই অনুমান করা যায়। ওই সম্প্রদায়ের ছেলে মঘাই অসামান্য ঢোল বাজিয়ে হিসেবে যখন আমন্ত্রণ পেলেন, শোনা যায়, সেই ঢোল বাজানোর অসামান্যতায় মুগ্ধ বলরাজ সাহনী পরদিন একাশ্য মিছিলে গৌহাটির রা শ্য মঘাই-কে কাঁধে করে নিয়ে হেঁটেছিলেন। অবশ্যই, অবশ্যই মঘাই-এর গলা থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল, আমি মঘাই, মঘাই ওঝা, দ্যাখো, আমরাও পারি। আজ যখন যোরহাটের কাছে মঘাই ওঝা-র নামে বাদ্যযন্ত্র চর্চা-র একাডেমি গড়ে তোলেন ওইখানকার মানুষেরা, তখন সেখানেও একটা অদৃশ্য লড়াই বাঁধেই। এটা হচ্ছে একটি অবদমিত শ্রেণীর

আত্মপরিচয়, এতি আর লড়াই, আর এর উদ্দেশ্যে, আমরা যারা এতেকদিন এত - অত্যন্ত ভাবে তাঁদের দমন করে চলেছি, আমাদের এতিমুহূর্তে পিছু হটার, হেরে যাবার পালা। যে সামাজিক সুযোগ সুবিধায় আমার সশ্রম সমাজে এতি পাওয়া যায় বিনা আয়াসে, সেইখানে কেবলমাত্র আমি এই ... এই উচ্চারণের জন্যই আজীবন ঘাম-রক্ত ঝরাতে হয় তাঁদের, ওই দলিতদের। কোনো অনুকম্পা নয়, তাঁদের কাছে নতজানু হয়ে একদিকে যেমন মা চাইবার এয়োজন, অন্যদিকে তাঁদের আত্মপরিচয় এতি পাওয়া আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আর তখনই কারো পরিচয় এদানে ইনি দলিত সম্প্রদায়ের লেখক এই উচ্চারণ অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও থাকে। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'-র অনুবাদ অনেকেরই হাতে হাতে ঘুরতো। শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের প্রতিনিধিসম ওইসব লেখকেরা ওঁদের দেখা জগৎকেই প্রকাশ করেছেন তাঁদের সাহিত্যে - আমরা জানতে পারতাম, ওই দেশবাসীর জীবনযাত্রা-র হাজারো কাহিনী-কে। ওইসব দেশগুলির সংগ্রামরত মানুষদের জীবন আমাদের ভেতরে এক বোধের জন্ম দিত, কেউ কেউ ভবিষ্যত জীবন চর্চাতেও সেই বোধের বাস্তব প্রকাশ ঘটাতেন। তখন কিন্তু প্রশ্ন ওঠেনি, সাহিত্য তো সাহিত্যই, তার আর তৃতীয় সপ্তম কী! সেটা যে কী, তার উপলব্ধি ঘটতো ওইসব সাহিত্য পাঠেই। আমাদের সমাজেই আমাদের পাশেই রয়েছে যে বিশাল একটি জগৎ, যার দিকে নজর দিয়ে সময় নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের প্রায়শই থাকে না, সেই দলিত সমাজের আখ্যানই ফুটে ওঠে তাঁদের রচনায়। আবার অনেক উচ্চবর্ণের মানুষও আপন তাগিদে ওই সমাজের জীবন্ত দলিল প্রকাশ করেছেন তাঁদের সাহিত্যে। শ্রদ্ধেয় তাঁরাও। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা একজন দলিতের, প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা আর অসম্মানে পিষ্ট হতে থাকা একজন মানুষের, তার প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে শুধু বিষয়ের দিক থেকে না, ওই মানুষটির ব্যগ্র প্রচেষ্টাকে অনুধাবণ করতে পেরেও, আর তখন প্রায় সারাজীবনই ওই মানুষটিকে বলে যেতে হয়, 'আমি তাদেরই লোক' এবং সেটাই তাঁর প্রথম পরিচয়।

এই উচ্চারণ, এই কিছুটা রক্ষণ প্রচার তো ওই উচ্চবর্ণীদের বিপরীতে দলিতদের একটি প্রতিভাষাও তৈরি করে। আমার পরিচয়ই, আমার প্রতিবাদ - এই বিবৃতি যে প্রয়োজনকে নির্দিষ্ট করে তার জন্যে লজ্জিত হতে হয় আমাদের। সাহিত্যের ব্যাকরণগত উৎকর্ষের বিচার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা বোধ হয় দ্বিতীয় পাঠের।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি — কমলা মুখোপাধ্যায়

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

চিন্তা এবং মননে যেমন, কর্মধারায়ও ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ছিল তাঁর।
শুরু করবো কিভাবে, তাঁর কোন দিকটা নিয়ে!

আমাদের পরম শ্রদ্ধার কমলা মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। প্রথম এবং প্রধান
পরিচয় অবশ্যই এই যে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। পরাধীন ভারতবর্ষে কেটেছে তাঁর
অনেকখানি সময়। নির্যাতন, আত্মগোপন, কারাবরণ - সবই সহ্য করেছেন তিনি।
সময়ের পরিমাপে দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়টা তিনি উপযুক্তভাবেই
ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, নানারকম কাজে, মানুষের প্রয়োজনে।

কমলা মুখোপাধ্যায় (তখন চট্টোপাধ্যায়) জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৩ সালের ২৪
শে মে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া সংলগ্ন বানীবন গ্রামে। তাঁর পিতৃভূমি ছিল হাওড়ার
মুন্সীরহাটে। কমলা চট্টোপাধ্যায়ের পিতা প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে কাজ করতেন। বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে
যুক্ত ছিলেন তিনি। বারবার ইংরেজ সরকারের পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, শেষে দেশ
ছেড়ে ঘরসংসার ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেন প্রমথ নাথ। তারপর আর তাঁর কোনও খোঁজ
পাওয়া যায় নি। পুলিশের রিপোর্টে জানা যায় তিনি বিদেশেই মৃত্যুবরণ করেন। কমলার
তখন মাত্র তিন মাস বয়স। তিনটি সন্তানসহ কমলার মা অসহায় অবস্থায় পড়ে যান।

ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন সমাজসেবী কমলার মা হরিমতী দেবীর জন্য
মৈমনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুলের ছাত্রী আবাসে একটি কাজের ব্যবস্থা করে দেন। ১৯১৭
সালে মা হরিমতী দুটি কন্যা এবং পুত্র অমরেন্দ্রকে নিয়ে সেখানে চলে যান এবং ওই
বোডিং - এ কাজ করে ছেলেমেয়েদের লালন পালন করতে থাকেন। তাঁর দুটি কন্যাই
মেধাবী ছিলেন। দুজনেই কুড়ি টাকা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

কমলার পুরো পরিবারই ছিলেন স্বদেশী ভাবাপন্ন। বড় ভাই অমরেন্দ্র ১৯২১
সালেই ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এক পর্যায়ে গ্রেফতার
হয়ে পুলিশের হাতে প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হন। ছাত্র অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।
১৯২৯ সালে কমলা বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তখন
সেই ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার আহ্বানে ধর্মঘট হয় বেথুন কলেজে।

বিদ্যাময়ী স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্রী কমলা স্কুলে ধর্মঘট পালন করার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করেন। দুজন ছাড়া কোনও ছাত্রী বিদ্যালয়ে সেদিন আসেনি। ওই কাজের জন্য কমলাকে বোডিং থেকে বহিস্কার করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে কমলা যুক্ত হয়েছেন মৈমনসিংহে বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে। তাঁর যোগাযোগ হয়েছে বিপ্লবী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে। ক্রমে তিনি তাঁদের কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন।

ম্যাট্রিক পাশের পর কমলা চলে আসেন কলকাতায়, ভর্তি হন স্কটিশ কলেজে আই. এ ক্লাসে। কলকাতায় তাঁর রাজনৈতিক কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের রাজনৈতিক কাজকর্মে টেনে আনা ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তখন দেশ জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। তার আগে মৈমনসিংহে থাকতেই তিনি গান্ধীকে দেখেছেন সেখানে। গান্ধিজির আহ্বানে মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে দিয়েছে দেশের কাজে, কমলাও ছিলেন তাদের দলে। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ আসেন ময়মনসিংহে এবং বিদ্যাময়ী বিদ্যালয়ে এসেও বক্তৃতা দেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী গান গেয়ে অনুপ্রাণিত করেন সেখানকার মানুষদের। নজরুল ছাড়া মুকুন্দ দাসের গানও স্বদেশীদের মনে উন্মাদনা জাগাতো। এঁরা সকলেই প্রভাবিত করেছিলেন কমলার ভাবনা চিন্তা এবং কাজের ধারাকে।

কলকাতায় কমলা ইংরেজ বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, ইস্তাহার প্রচার, ছাত্রীদের নিয়ে সভা সমাবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি বিপজ্জনক কাজ শুরু করেন। বিপ্লবীদের পোস্ট বক্স হিসাবে চিঠিপত্র, অস্ত্রশস্ত্র বা রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া নেওয়া বা লুকিয়ে রাখার মতো কঠিন দায়িত্ব পালন করতেন কমলা। তিনি তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার পরিকল্পনার নেতানেত্রীদের সঙ্গে কাজ করতেন। প্রীতিলতা ওয়াদেদার বা কল্পনা দত্ত ছিলেন তাঁর সহযাত্রী বন্ধু। প্রীতিলতা আর কল্পনা বেথুন কলেজের ছাত্রী আর কমলা ছিলেন স্কটিশে। চট্টগ্রামের বিপ্লবের সমর্থনে সংগঠনের নানা কাজের সঙ্গে নিষিদ্ধ দ্রব্য সেখানে পাঠাবার পরিকল্পনার কাজেও গভীরভাবে জড়িত ছিলেন কমলা। ১৯৩১ সালে অনন্ত সিংহ সহ কয়েকজন বিপ্লবী চট্টগ্রাম জেলের সুড়ঙ্গ কেটে ডিনামাইট বসিয়ে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে আসার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কল্পনা দত্ত সেই ডিনামাইট অভিযানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে চট্টগ্রামের বাড়িতে বসে গান কটন তৈরী করতেন কল্পনা। কমলা চট্টোপাধ্যায় কলকাতা থেকে সেইসব বিস্ফোরক পদার্থ চট্টগ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ ডিনামাইট পাতার সময় ধরা পড়ে যান বিপ্লবী অর্ধেন্দু গুহ।

এইসব বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অপরাধে স্কটিশ হস্টেল থেকে

বিতাড়িত হলেন কমলা। ১৯৩১ সালে আই. এ পাশ করলেন, এবারও ২০ টাকা জলপানি সহ। তারপরে বিদ্যাসাগর হোস্টেলে এসে উঠলেন কমলা। স্বদেশী আন্দোলনের নানা কাজকর্ম তাকে অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসকে হত্যা করে দুই নাবালিকা শাস্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী, এদের তো গ্রেপ্তার করা হলো-ই, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার, ধরপাকড় বেড়ে চললো। কমলাও গ্রেপ্তার হন। প্রথমে হিজলী ও পরে দিনাজপুর জেলে রাখা হয় তাঁকে, সঙ্গে ছিলেন কল্পনা দত্ত। ছ বছর কারাবাসের পর মুক্ত হন কমলা, কল্পনা ও আরো কয়েকজন ১৯৩৮ সালে। তারপরেও ছ মাস তাঁকে গৃহে অন্তরীণ বন্দী থাকতে হয়। ইতিমধ্যে হিজলী জেলে বন্দী অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে কমলা ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছেন ১৯৩৩ সালে। তাছাড়া হিজলী থেকেই প্রিলিমিনারি ল পরীক্ষা দিয়েও ফার্স্ট ক্লাস পান।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কমলা ‘মন্দিরা’ নামে মহিলাদের মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রী সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার কাজকর্মের সঙ্গে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট সঙ্গীর সাথে তাঁর মেলামেশা চলতে থাকে। ক্রমে কমলা কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে অবিভক্ত বাংলায় কমলা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সম্ভবত দ্বিতীয় পার্টি সদস্য।

প্রথম মহিলা পার্টি সদস্য লতিকা সেন, যিনি ১৯৪৯ সালে বন্দী মুক্তির দাবীর মিছিলে কংগ্রেস সরকারের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী রূপে শুরু হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় গ্রাম থেকে ছুটে আসা, না খেতে পাওয়া মানুষের মৃতদেহের স্তুপ। সেই সময় কমলা মণিকুন্ডলা সেন, রেনু চক্রবর্তী, কণক মুখার্জি, এলা রীড ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহিলাদের সঙ্গে একত্র হয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের ত্রাণের কাজে নেমে পড়েন। লঙ্গরখানা খুলে ক্ষুধার্তদের খাদ্য বিতরণ করা থেকে শুরু করে বস্তিবাসীদের পাশে থেকে খাদ্যের দাবীতে সরকারের কাছে ধরণায় যাওয়া। আত্মত্যাগের পাশে দাঁড়ালেন মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন “মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। পরবর্তী সময়ের মহিলা সমিতির উত্তরসূরি এই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

ইতিমধ্যে কমলা এম. এ পাশ করেছেন অর্থনীতিতে। বি.টি-ও পাশ করেছেন। ১৯৪৪ সালে বিবাহ করেছেন অধ্যাপক নীরদ মুখোপাধ্যায়কে। কমলার ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু কখনোই তাঁর কাজকর্মে ব্যাঘাত করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত

হলে কমলাকে কারারুদ্ধ করা হয়। শিশুপুত্র সমেত কমলা সেইসময় কণক মুখার্জি, বেলো লাহিড়ি, পঙ্কজ আচার্য, বানী দাশগুপ্ত প্রমুখ কমিউনিস্ট নেত্রীদের সঙ্গে কারাবাস করেন। কমলার স্বামী তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের একান্ত সচিব ছিলেন। তখন তাঁকে সেই পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৫১ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে পার্টির নির্দেশে বিভিন্ন গন সংগঠনে কাজ করতে থাকেন কমলা। প্রধানত নারী আন্দোলনে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। বৃত্তি হিসাবে তিনি শিক্ষিকার কাজ বেছে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট সূত্রের কারণে কর্মজীবনে বারেবারেই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। হিন্দী মাধ্যম মাড়োয়ারি স্কুল, বালিকা শিক্ষা সদন, শ্রীসদন, বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন স্কুলে শিক্ষকতার পর দমদম মতিঝিল উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগ দেন। এখান থেকেই অবসর নেন ১৯৭৮ সালে। আমার প্রতিবেশী স্কুল হওয়ায় শিক্ষিকা কমলাদির ভূমিকাও দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর পড়ানো, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা অন্যান্য শিক্ষিকাও ছাত্রীদের কাছে ছিল উদাহরণস্বরূপ। তাঁর সহকর্মী, ছাত্রীরা যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা, সমীহ করতো, তেমনি ভালও বাসতো। আমরা - যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তাদেরও কমলাদি সম্পর্কে একইরকম মনোভাব।

কমলাদিকে কাছ থেকে দেখা, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পত্রিকা ‘চলার পথে’ প্রকাশিত হয়। কমলা মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার প্রথম সম্পাদিকা। তখন কমলাদির সঙ্গে নিয়মিত কাজ করেছি। কমলাদি সম্পাদিকার পদ ছাড়ার পর আমাকেই পত্রিকার অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়, তখন তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ খুবই মূল্যবান ছিল আমার কাছে।

এইসময় থেকে কমলার মনে রাজনীতি নিয়ে নানা দ্বিধা প্রশ্ন জাগছিল। তাঁর নিজের ভাষায় — “পার্টি ভাগ হয়ে গেল ১৯৬৪ সালে — তখন তো দিশাহারা। পার্টিতে আসার ২/৩ বছরের পর থেকে আমার মনের নীতিগত, তত্ত্বগত বিভেদের জন্য, গঠনমূলক কাজগুলিই বেশি করেছি। যেমন ১৯৪৩ ময়মতুর ও ১৯৪৬ দাঙ্গায় (কমিউনিস্ট পার্টি প্রশংসনীয় কাজ করে), ১৯৬৮ তে জলপাইগুড়ি বন্যায় (তিন মাস জলপাইগুড়ি ছিলেন)। ১৯৬৭-৬৯ খরার সময় পুরুলিয়া জেলায়। পার্টি ছাড়িনি। পুরানো বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল।” (মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত “অপরাজেয়া” পৃ: ১৪)।

তাঁর পুরনো সঙ্গীসাহী, সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা। সহযোগিতা ছিল একইরকম। বিভিন্ন ঘটনায় তিনি পথে নেমেছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারী

আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ সমাবেশ — সর্বত্রই বয়সের বাধা অস্বীকার করে উপস্থিত থেকেছেন কমলাদি।

আর্ত নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন তিনি। সে কাজের জন্য নিজের সুখ সুবিধা আরাম, শারিরীক অসুবিধা - সবই উপে া করেছেন। ছুটে ছুটে গেছেন বাংলাদেশ, সংগ্রহ করেছেন অর্থসাহায্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি সৈন্য মণিপুর পর্যন্ত এসে দখল নিয়েছিল। মণিপুরের মানুষ, বিশেষত মেয়েদের দুর্দশা তখন এবং তারপরেও ছিল অবর্ণনীয়। সেই সময় কমলাদি মণিপুরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তারপর থেকে কমলাদি বারবার মণিপুরে গেছেন। সেখানকার মেয়েদের হাজারো সমস্যা তো আজও জ্বলন্ত। শুধু মণিপুর নয়, অণাচল, সিকিম, নাগাল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ানে সেখানকার গারো, হাজং, চাকমা উপজাতি, ও আদিবাসীদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছেন। সেগুলি জনসম্মে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন সে সম্পর্কে। উত্তর পূর্বাঞ্চল ও কচ্ছ অঞ্চলের আদিবাসীদের সমস্যার বিষয়ে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞই বলা যায়। এইসব লেখাগুলি একত্র করতে পারলে সমাজতত্ত্বের াত্ম্য দলিল হতে পারে।

দুস্থ মেয়েদের স্বয়ংভর করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন কমলাদি। চল্লিশের দশকের শেষে সীতা চৌধুরী, রেণু চক্রবর্তী, প্রতিমা মিত্র, শিল্পী ইন্দুসুধা ঘোষের সঙ্গে মিলে কমলাদিরা গড়ে তোলেন নারী সেবা সংঘ। এখন শিল্পসামগ্রী সৃষ্টি, বিপণন ও প্রচারে, মেয়েদের স্বয়ম্ভরতায় কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠন এই নারী সেবা সংঘ। অন্য একটি প্রসিদ্ধ শিল্পবিপণি বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্রেও কমলাদি তাঁর বন্ধু গীতা মল্লিকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বর্ধমানের কাছে পাল্লা রোডে কলানব গ্রাম শিক্ষা নিকেতন, তৃপ্তি চৌধুরী স্থাপিত অনাথ আশ্রম, বীরভূমের বনলক্ষ্মী ও আরও কত সংগঠনের কাজে কমলাদির ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

মানুষের নিকটাত্মীয় কমলা মুখোপাধ্যায় সত্য অর্থেই ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। ছাত্রীদের ক্লাসে ভূগোল পড়িয়েছেন, নিজেও সারাজীবন ভূগোলের পাঠ নিয়েছেন দেশভ্রমণ করে। ভারতের নানা স্থানে, বিশেষ করে হিমালয়ের নানা প্রান্তে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন অদম্য উৎসাহ নিয়ে, কঠিন শীত কি বয়সের বাধা গ্রাহ্য না করেই। তিনি ছিলেন হিমালয় প্রেমিক। বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী ভক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ঘুরেছেন গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, নন্দনকানন। এছাড়া

তরুণতর গোষ্ঠীর সঙ্গে হিমালয়ের তুঙ্গনাথ, মনিমহেশ, শেষ নাগ, পিডারী, লাহল, সপিত্তি, ভূটান লেহ, লাদাক। অনেক ক্ষেত্রে পদব্রজে ঘুরতে হয়েছে। হিমালয় যাত্রী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কমলাদি। হিমালয় প্রসঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, অজস্র লিখেছেন হিমালয়ের নানা প্রান্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। হিমালয় বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত লেখক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কমলাদির বন্ধু। ২০০৩ সালে তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, কমলাদির হিমালয় ও তিব্বতে সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী সাহিত্যকীর্তিকে স্মরণ করে।

শুধু পর্বতাঞ্চল নয়, সমতলও তাঁর নাগালের বাইরে ছিল না। শুধু ভ্রমণ নয়, তিনি ঘুরে ঘুরে জেনেছেন নানানরকম মানুষজন, তাদের মেলা সমাবেশ। দেখেছেন রান অব কচ্ছ, ভুজ, পুষ্কর, শ্রীকাকুলাম, শবরীমালা (তিনি যখন আয়্যাপ্পার মন্দিরে যান, তখন এই স্থানে জনসাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল না)। প্রবালদ্বীপকে তিনি বিশেষভাবে দেখেছিলেন এবং সেখানকার নানা তথ্য জানিয়েছেন সকলকে একটা কথা এখানে বিশেষভাবে বলতে হবে। বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ শি ও তার সংলগ্ন বিষয়ে কমলাদির বিশেষ পড়াশোনা ও আগ্রহ ছিল। বারবার তিনি গেছেন অণাচল, পর্যবে গ করেছেন সেখানকার মন্দির মনস্ী, পূর্ব ও পশ্চিম ভূটান, তাকসাঙ মনস্ী, সিকিম, নেপাল ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। ইনা টিউট অব টিবেটোলজীতে তিব্বতী ভাষা ও শাস্ত্র বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ১৫ দিন ছিলেন তিব্বতে। সিকিমে কয়েকটি সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতায়ও মহাবোধি সোসাইটি ও তার সঙ্গে সংযুক্ত অনেক বৌদ্ধ মানুষজনের সঙ্গে কমলাদির সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। নিম্নবর্গের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাঁর কিছু কাজকর্ম ছিল। চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতিদের নিয়ে কমলাদির অনেক মূল্যবান তথ্য সম্বলিত লেখা আছে।

নিজের দেশকে শুধু দেখা নয়, কমলাদি বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন মানুষকে, প্রকৃতিকে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে আমার মনে হতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এ দেশ, তার জল, মাটি, পাহাড় - সবই যেন আমার, আমাদের। কমলাদির আত্মনিমগ্ন ভৌগোলিক সত্ত্বা আমাকেও অনুপ্রাণিত করতো।

ছোটখাটো চেহারার সহজ এই মানুষটি কত কাজ যে করে গেছেন এক জীবনে। সাহিত্য পরিষদের 'ভারতকোষ' রচনার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত পুত্রের বা অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের আহ্বান সত্ত্বেও একা থেকেছেন সারাজীবন। বেশ কিছুদিন প্রাচী সিনেমার পাশে তিনতলার এক ফ্ল্যাটবাড়িতে ছিলেন। ভাঙা সিঁড়ি, বারান্দা খসে পড়ছে। তারপরে কিছু বন্ধুবান্ধব অনুরাগীর উদ্যোগে সি.আই.টি রোডের একঘরের একতলার ফ্ল্যাট, দরকার পড়লেই কোনও ছাত্রী বা গবেষক আশ্রয় পেয়েছে কমলাদির

কাছে। তাঁর ঘরে খাটের ওপর, টেবিলে সর্বত্রই ছড়ানো বইপত্র, খাতা। ওর বাড়িতে গেলে বইয়ের তাক থেকে কোনও ভাল বই এগিয়ে দিতেন, “নিয়ে যাও এগুলো - পড়বে’। আমিও কমলাদিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে আসতাম সেইসব বই। তাঁর বাড়িতে যে কেউ যাক, একটা মিষ্টি অথবা একটা ছোট ফল না খাইয়ে ছাড়তেন না। নিজে কখনো ভাতে ভাত রুঁধে, কখনো হোম ডেলিভারিতে খেতেন।

বাড়িতে গিয়ে দেখেছি তিনি লিখছেন বসে। স্কুলের বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন তাঁর পক্ষে ছিল অনেক। কত লোককে টাকা পয়সা দিয়ে দিতেন। আমাকে দিয়েছিলেন মণিপুর থেকে আনা গরম সুন্দর শাল। সময়ে রেখে দিয়েছি সেটি।

দলমত নির্বিশেষে কত মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা যে কমলাদি পেয়েছেন। ১৯৯৪ সালে কমলাদির ৮১ তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি হলে। সেইখানে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি বিনয় চৌধুরী, ফুলরেণু গুহ, রেণু চক্রবর্তী, বিজয় সিং নাহার বা সরোজ মুখোপাধ্যায় — সকলের কাছেই তিনি শ্রদ্ধেয়া কমলাদি।

অনুষ্ঠানের পরে কমলাদির একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম - “কি কান্ড করলে বল তো তোমরা এত সব আয়োজন অনুষ্ঠানের কি যোগ্য আমি?”

এই ছিলেন কমলাদি — সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ। বিনম্র এবং আত্মমগ্ন হয়ে নিজের কাজ করে গেছেন, শুধু দেশের কথা ভেবে, আর্ত মানুষের কথা ভেবে। কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নি।

কমলাদির জীবনাবসান হয় ২০০৫ সালের ১লা মে। আমরা কি এর মধ্যেই তাঁকে বিস্মৃত হয়েছি। ২০১৩ সাল তাঁর জন্মশতবর্ষ — নিঃশব্দে চলে গেল। জীবনের কাছে, দেশের কাছে কোনও দায়বদ্ধতা আমাদের নেই কি! এমন একটি বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষকে শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ?

তিন নক্ষত্র পুরুষ : আশ্বেদকর, গ্রামশি ও মাও সে তুং

মনোহর মৌলি বিশ্বাস

সূচনা : এই পৃথিবী বর্তুলাকার। মেধা ও মননে সমৃদ্ধ মনুষ্য প্রজাতি এর প্রধান বাসিন্দা। বর্তুলাকার এই পৃথিবীর তিন প্রান্তের তিনজন নক্ষত্র পুরুষদের নিয়ে আমার এই আলোচনা। এমন তিনজন মানুষের কথা আলোচনা করব যারা যুগপৎ ধরাধামে এসেছিলেন এবং নিপীড়িত জনসত্তার মুক্তির সাধনায় জীবন পাত করেছিলেন। সেই তিন নক্ষত্র পুরুষ হলেন ড.বি.আর.আশ্বেদকর, আন্তোনিও গ্রামশি এবং মাও সে-তুঙ। ড. বি. আর. আশ্বেদকর ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের মৌ-নামের এক অতি ছোট শহরে ১৮৯১ সালের ১৪এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেছিলেন।^১ আন্তোনিও গ্রামশি ইতালি দেশের সার্দিনিয়া দ্বীপের এলেস নামক এক ছোট শহরে ১৮৯১ সালের ২২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।^২ ভীমরাও রামজি আশ্বেদকরের পিতৃদেব রামজি শকপাল সেনাবাহিনীতে একজন একান্ত নিম্নবেতনের কর্মচারী ছিলেন। ঠিক প্রায় একই প্রকারেই আন্তোনিও গ্রামশির পিতৃদেব ফ্রান্সিসকো গ্রামশি সামান্য বেতনের চাকরি করতেন এবং তাঁর মা ছিলেন একেবারে ছোট কৃষক পরিবারের মেয়ে।

তাদের পাশাপাশি প্রায় সমকালে, মাত্র দু-বছর পরে, চীন দেশে জন্মেছিলেন মাও সে তুং ১৮৯৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর। হুনান প্রদেশের শাওশান গ্রামের এক দরিদ্র চাষী ছিলেন ওঁর বাবা ইয়াই চাঙ।^৩ কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ন ব্যক্তিত্ব এবং এতটা কাঠোর মানুষ ছিলেন ইয়াইচাঙ যে, পারিবারিক শৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে চার পুত্রের শাস্তিবিধান করতে তার এতটুকুও আটকায়নি। নিজের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রম সম্বল করে ইয়াইচাঙ নিজের সংসারের আর্থিক অবস্থার বদল ঘটাতে পেরেছিলেন। দারিদ্রমুক্ত হয়ে পরিণত হয়েছিলেন শাওশান গ্রামের সব থেকে ধনী চাষীতে। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনা শেষ হতেই তিনি মাওকে পাঠিয়েছিলেন তুংশান শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে। তুংশান ছোট শহর হলেও ছিল শাওশান গ্রামের তুলনায় অনেক কর্মচঞ্চল। এখানে আসার পরে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন আসে। তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সাহসী সত্তা হয়ে ওঠে তার শিক্ষক। মাও সে তুং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলোকে যতটা নিজেকে আলোকিত করেছেন, তার থেকে তাঁর নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শিক্ষক-সত্তা তাকে আলোকিত করেছিল বহুল মাত্রায়।

ড. বি.আর. আশ্বেদকর ভারতের বর্ণবিভাজিত সমাজের দরিদ্র ও অস্পৃশ্য

মাহার ঘরে জন্মলাভ করলেও বিদেশের আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরীয় পঠ যেমন তাকে নতুন মনন ও চিন্তনের জগতে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি করে লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের পাঠ তাকে দিতে পেরেছিল এক অকুতোনির্ভীক জ্ঞান-সত্তা।

ভারতের আশ্বেদকর, ইতালির গ্রামশি, চীনের মাও সে তুং— তিনজনেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসাবে উনিশ শতকীয় জার্মান দেশীয় ইহুদি চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসকে হাতের কাছে পেয়েছিলেন ওষধির মত; এবং নিজের নিজের দেশের সমাজ ও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিচার করেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। আর সেই পথ খোঁজার অন্তর্দর্শে প্রবেশের নামই হল এক নতুন ইতিহাসের পাঠ। সেই নতুন ইতিহাস কি?

ইতিহাসের পাঠ : সারা পৃথিবীতে ইতিহাস পাঠের প্রক্রিয়া এবং কৌশল (Historiography) কি তা একবার আত্মস্থ করে নেওয়া খুব জরুরী। ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার উত্তরকালে ঐতিহাসিকেরা প্রথম ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করেছেন। সেই কাজের মধ্যে দুটি বিশেষ ভাগ লক্ষ্য করা যায়। অতীতকালে দেশীয় রাজা-মহারাজারা শাসন করতেন দেশ। সে কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব সমরকৌশল ও শাসনপ্রণালী ছিল তাদের। সেকালে তারে যুদ্ধের জয়-পরাজয় কাহিনী বিধৃত করাই ছিল ইতিহাস বিদ্যার বড় কাজ। স্বাধীনতার উত্তরকালে সেই চর্চায় বড় রকমের বদল আসে। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে কে কতটা অবদান যুগিয়েছে, কোনজন কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে সেটা তুলে ধরাই ইতিহাসবিদদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এই ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা এলিট সমাজ থেকে উঠে আসা শিক্ষিত সম্প্রদায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরাও ছিলেন এলিট সমাজ থেকে আসা মানুষ। সেই ইতিহাস-কৃত বিদ্যাকে ‘এলিটিস্ট হিস্টোরিওগ্রাফি’ বলেই আখ্যায়িত করা হয়। এই এলিটিস্ট হিস্টোরিওগ্রাফি মূলত জাতীয় ধারা হিসাবে স্বীকৃত। এর জনকদের বলা হয় ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ান। ভারতবর্ষে মার্কসীয় ধারায় দীক্ষিত ঐতিহাসিকেরা অনকটা পরিবর্তন এনেছেন সেই চর্চার অন্দরমহলে। তারা শ্রেণী-চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ। তাদের কাছে জনগণ হয়ে উঠেছিল আলোচনার মূল বিষয়। রাজা-মহারাজারা যতটা আলোচনার বিষয় তাদের থেকে প্রজাকুল হয়ে উঠেছিল আরও বড়। এই হিস্টোরিওগ্রাফি মার্কসিস্ট হিস্টোরিওগ্রাফি নামে পরিচিত। এই ঐতিহাসিকরা আরও এক ধাপ বিবর্তন এনেছেন ইতিহাসের আলোচনায়। তাদের একটা নতুন দল গড়ে একত্রে মিলে চালু করেছেন সেই ধারার। তার নাম ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ ইতিহাস নিজের থেকে দেখা একটা বিষয়। একে বলা হলো ‘হিস্ট্রি ফ্রম বিলো’।

ভারতবর্ষে দলিত সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে অতি সাম্প্রতিক কালে। ‘মেইনস্ট্রিম’ সাহিত্যের ধারায় যুক্ত হয়েছে ভারতীয় সমাজের নতুন ‘ন্যারেটিভ’। সেই ন্যারেশনের মধ্যে আছে দলিত সমাজের ভিতর বাড়িতে লুকিয়ে থাকা নানা দুঃখ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও শোকগাথা। এ বিষয়ে ইতিহাসে গতি সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্ন মাত্রা সহযোগে। জন্ম হয়েছে দলিত হিস্টোরিওগ্রাফির।

সারা পৃথিবীতে ইতিহাসে চর্চার যে হিস্টোরিওগ্রাফি আছে— হেগেলিয়ান স্কুল, ফ্রেঞ্চ স্কুল, ন্যাশনালিস্ট, মার্কসিস্ট, সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রভৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে স্কুল অব দলিত হিস্টোরিওগ্রাফি। আশ্বেদকর, গ্রামশি ও মাও সে তুংকে নিয়ে আমার আলোচনা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। এরই ব্যবহার করে।

ইউরোপীয় সমাজ ও কার্লমার্কস : সারা ইউরোপ জুড়ে অস্টাদশ শতকে দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক শ্রম ব্যবহার করে যে বিশাল সাফল্য এসেছিল তাই-ই ইউরোপের শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। এর প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ডে। তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশে তা প্রসারিত হয়। শ্রমের যোগান, মূলধন ও ঔপনিবেশিক বাজার থাকার কারণে ইংল্যান্ড সবার আগে উঠে এসেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আঠেরো শতকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে দেয়। সমগ্র ইউরোপে এই সময়ে প্রজাতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে।

ইউরোপের প্রধান চারটি দেশ ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের স্বৈরাচারিতার প্রভাব খাটিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপ পরিবর্তন করে। ছোট ছোট কুটির শিল্পের জায়গায় গড়ে ওঠে বড় বড় কল কারখানা। উৎপাদন বিপণনের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় উপনিবেশ গড়ে তোলার কাজে। এই উপনিবেশ গড়ার কাজে ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্স ও স্পেনের চলল দীর্ঘ লড়াই। নৌশক্তিতে ইংল্যান্ড প্রবল শক্তিধর ছিল বলেই অর্ধেক পৃথিবীতে উপনিবেশ গড়ে ফেলল তারা একাই কেবল।

সারা ইউরোপের সমাজ জীবনে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ছায়া পড়ল বড় করে। সমাজ জীবনে এতদিন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত যে সামন্ত শ্রেণী— বাণিজ্য আর শিল্প উৎপাদনের প্রসার ঘটিয়ে নতুন নতুন সম্পদ জমা হতে থাকল আরও বহু মানুষের হাতে— এবং তাদের দিয়ে গড়ে উঠল একটা শ্রেণী— যাদের ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণী। সমস্ত কিছুর আধিপত্য জড়ো হল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে।

শিল্প শহরে জীবন ও জীবিকার টানে গ্রামীণ কৃষকেরা হতে থাকল জড়ো। কলে-কারখানায় অত্যল্প বেতনে কাজ করত তারা, থাকত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। কোনওমতে দিনাতিপাত করা হয়ে উঠল তাদের জীবনের ব্রত, বস্তিতে থেকে অশিক্ষা আর দারিদ্রের কষাঘাত পড়ল তাদের মাথার উপরে। ঐতিহাসিকরা একে বলেছেন প্রলেতারিয়েত, সর্বহারা।

কোনও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে প্রলেতারিয়েতদের একনায়কতন্ত্র—ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেতারিয়েত। একথা প্রথম শুনিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস, ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে। তারই পুনরুচ্চারণ শোনা গিয়েছিল মাওয়ের রচনাবলীতে। “প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট বারবার স্টেড (Robert Bierstedt) -এর ভাষায় 'Sociology has a long past but only a short history'. কারণ সমাজতত্ত্ব শব্দটি ১৮৩৯ সালে অগাস্ট কঁোত (August Conte) ও ব্যবহার করার পূর্বে অজানা ছিল। অগাস্ট কঁোত, হারবার্ট স্পেনসার, ইমাইল ডুর্কহাইম, ম্যাক্স ভেবার প্রমুখই হলেন আধুনিক ধনতাত্ত্বিক সমাজতত্ত্বের পথিকৃৎ। সমসাময়িক সময়েই অপর এক স্বতন্ত্র সমাজতত্ত্ব বিকশিত হয় যা মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব নামে পরিচিত”।^৪

১৭৮৯ থেকে ১৮১৪ সাল অবধি পঁচিশ বছর ধরে সংঘটিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব। ইউরোপের সমস্ত দেশগুলিতে সেই ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলি শিল্পের প্রতিযোগিতায় চরম অবস্থানে পৌঁছেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে তখন কৃষি জমিতে কাজ করা মজুরদের সংখ্যা ৬ থেকে ২০ ভাগ কেবল এবং শিল্পে শ্রমিক শ্রেণী ছিল প্রায় নব্বই শতাংশ। পশ্চিমা দেশগুলির সেই বহুজন সংখ্যার শিল্প শ্রমিকদের সমস্যা ও তার সমাধানকল্পের আন্দোলন এবং যে আন্দোলন কার্ল মার্কসকে সবথেকে বেশি করে আন্দোলিত করেছিল, তাই-ই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব হুবহু নকল করে ফেললেন এবং যেখানে শিল্প-শ্রমিক মাত্র ১০-১৫ শতাংশ, তা যে কখনোই ইউরোপীয় দেশের মার্কসীয় শ্রমিক শ্রেণীর ভাবনার সাথে মিল খায় না। অথচ তাই-ই গৃহীত হল এদেশে। ভারতীয় মার্কসবাদীরা একটা কৃষিপ্রধান দেশকে পশ্চিমের শিল্পপ্রধান দেশের মত করে নিয়েই ভাবলেন তা।

দলিত হিঃারিওগ্রাফি ও তিন ন ত্রপু ষঃ সামান্য আগে যে কথাটি বলতে প্রয়াস পেয়েছি, ইতিহাস চর্চাগত প্রক্রিয়ার সর্বশেষ এবং বলা যায়, একেবারে আধুনিকতম হল দলিত হিস্টোরিওগ্রাফি। মাও সে তুং জন্মলাভ করেছিলেন প্রান্তিক ছোট চাষী পরিবারে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিবারের আর আর্থিক প্রান্তিকতা

ছিল না। সেই সময় চীনের রাজধানী পিকিং শহর ছিল চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নীবভূমি। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মেধা ও মনন চর্চার কেন্দ্র। বহু পণ্ডিতজনের আনাগোনা। মাও সে তুং ছোট শহর তুঙস্তানে নিজেকে আটকে না রেখে চলে গেলেন পিকিংয়ে। রাজধানীতে গিয়ে কোনও একজন অধ্যাপকের বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কাজ পেলেন একটা। তিনি প্রথম দিকে ছিলেন চীনা ধ্রুপদী সাহিত্যের পাঠক। আস্তে আস্তে বদলে গেল মন। নামী-দামী মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যান জুটতে লাগল তার। সহজে বুঝলেন, ধনবৈষম্য মানুষের মধ্যে যে স্তরবিন্যাস করে দেয় আধিপত্যবাদ স্তর ভাগ করে বড় করে। ধ্রুপদী সাহিত্য ছেড়ে বিপ্লবী সাহিত্য পাঠে মন দিলেন। বিপ্লবী সাহিত্য পড়তে পড়তে এ-ও বুঝলেন তিনি, চীন দেশে মার্কসবাদ প্রয়োগ করতে গেলে অধিপত্যবাদ ভাঙতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেই করতে হবে তা।

ভারতবর্ষে যারা মার্কসবাদী তত্ত্বের পাঠ নিয়ে তা প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন, তারা যদি ভারতীয় সমাজে আধিপত্যবাদ কীভাবে তৈরি হয়েছে এবং কোথায় তার শিকড়, তা আবিষ্কার করতেন এবং সেই আধিপত্যবাদ ভাঙার প্রক্রিয়াটি মাও সে তুং-এর মত করে অবলম্বন করতেন, তাহলে সমতা নির্মাণের ভূমি প্রস্তুত হত। মাও সে তুং-এরও অনেক আগে ড. বি.আর. আম্বেদকর কীভাবে বুঝেছিলেন এবং একান্ত ভাবে ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, সে এখন শুধু ইতিহাস মাত্র। ১৯১৬ সালে ভারতবর্ষের বর্ণব্যবস্থার বিলোপ প্রয়োজন এবং সমতা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই প্রয়োজন তা; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানী ড.এ. এ. গোল্ডেন উইজার স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বর্ণব্যবস্থার উৎস সন্ধান যেমন করেছিলেন— তেমনি করে জাতিকে উন্নয়ন করতে হলে কী করা প্রয়োজন তাও বলেছিলেন তিনি।^৫

ইতালী দেশের গ্রামশিও আম্বেদকরের সমকালের হলেও বয়সে মাত্র মাস তিনেকের বড় ছিলেন। নিজের দেশে মার্কসবাদ প্রয়োগ করতে গেলে আধিপত্যবাদ সবার আগে ভাঙা প্রয়োজন সেকথা বলেছিলেন। তথ্যপূর্ণ বইও লিখেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তার জুটেলি কারাবাস। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মানুষের সমাজ আধুনিকতা গড়ে ওঠার প্রারম্ভ কাল থেকে আধিপত্যবাদকে নিখাদ স্বচ্ছ শরীরে রেখে সযত্নে লালন-পালন করে আসছে। অনন্তকাল ধরে অধিকার বর্তেছে সেই ভোগদখলের সংসারে। যা থেকেছে দীর্ঘকালের ইউনিটারিসংসার, তা যৌথসংসারে পরিণত করতে চাওয়াই না কোন যুক্তিতে? একা ভালো থাকা, ভালো খাওয়ার আনন্দ অনেক। সেই আনন্দের সংসারে ভাগ দিতে গিয়েই ব্যথা জাগে মনে। সেই ব্যথার ভূমি থেকে উদ্গত হয় যে চারা গাছটি, তার নাম সমাজতন্ত্র না করে, আসুন আমরা অন্য কিছু করি। অথবা

সমাজতন্ত্রের নাম করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখি। সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বলে একটা বালখিল্য খেলা খেলি।

পৃথিবীতে যা ঘটার তা ঘটেই ঘটে। ঘটার বলেই ঘটে ব্যাপারটা এমন নয়। ঘটনার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারলে প্রকৃত কারণ নিকিষিত হয়। প্রতিটি দেশে আধিকারিকেরা অধিকারে নিয়ত প্রবৃত্ত মানুষ। অইধকারকে ছোঁয়ার বাইরে পাঠাতে গেলেই মনন বলে ‘নৈব নৈব চ’। এই প্রবৃত্তি ভাঙার কাজ করে কমিউনিজম। আর করে বলেই মাও সে তুং তিন বছর ধর যেমন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, গ্রামশি সেই ভাবনায় বিশ্বাস করতেন বলেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন। গ্রামশি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন কেবল অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতরা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পার না। সাংস্কৃতিকর আধিপত্য ভাঙতে পারলেই সমতা নির্মাণের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হয়। আর তা না করতে পারলে সমতা গড়ার কাজ ব্যর্থ হয়।

উপসংহার : ভারতবর্ষে বর্ণভেদ ব্যবস্থা আসলে শিলীভূত শ্রেণীব্যবস্থা। শ্রেণী আর বর্ণ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ড. বি. আর. আশ্বেদকর ভারতের সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন যেভাবে তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একথা যে এদেশের সর্বহারার সুবৃহৎ অংশই দলিত। তারা দুভাবে লাঞ্চিত। প্রথমত, উচ্চতর জাতের অন্তর্ভুক্ত সর্বহারাদের মত অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত। দ্বিতীয়ত, দলিত হওয়ার কারণে সামাজিক ভাবে লাঞ্চিত ও নিপীড়িত। ফলে তারা সর্বহারারাও সর্বহারা, দীনের হতেও দীন। তাদের ব্যথা উপেক্ষা করে, তাদের বাদ দিয়ে সমস্ত সর্বহারার মুক্তি অসম্ভব।

জার্মান দার্শনিক হেগেল সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। হেগেলের কথা দারুণভাবে মনে রেখাপাত করেছিল কার্ল মার্কসের। কার্ল মার্কসের সেই ভাবনা তিন নক্ষত্র পুরুষ— আশ্বেদকর, গ্রামশি, মাও সে-তুং কেও সমানভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে সমতা-সমাজ গড়তে গেলে তার প্রধান অন্তরায় হল বর্ণভেদ ব্যবস্থা। আশ্বেদকর বললেন, এটা হল ‘থিসিস’। তিনি তার একটি থিসিস রচনা ককরলেন ‘এনাইহিলেশন অব ক্যান্টস’ লিখে। সামাজিক এই ‘এন্টিথিসিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং সমাজের একেবারে তলানির স্তর অবধি প্রতিষ্ঠিত হলে তাই-ই নির্মাণ করবে সামাজিক ‘সিনথেসিস’। তখনই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ‘সোস্যালিজম’ মেনে নেওয়ার মত একটা অবস্থা পাওয়া যাবে।

গাঁয়ের মানুষ মাও সে তুং পিকিং শহরে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এক নতুন জাত। অভিজাত মানুষ ও অনভিজাত মানুষ। ধন বা অর্থ-সম্পদ দিয়ে অভিজাত-অনভিজাত

তৈরি হয় না। অভিজাত আর অনভিজাতের মধ্যকার যে ফারাক সে বড় বিশাল ফারাক। এই ফারাকের নাম হল ‘থিসিস’। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পকিঙ্গনা করে তিনি নির্মাণ করলেন তার ‘এন্টিথিসিস’। সেই এন্টিথিসিস প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে চীন দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। মার্কসবাদকে নিজের দেশের সমাজ-সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে, কী করে তা প্রয়োগ করতে হবে, তা মাও সে তুং নিজের মত করে রচনা করেছিলেন। সেই বিচারে সারা পৃথিবীর মার্কসবাদীদের মধ্যে মাও সে তুং সব থেকে সফলতম ব্যক্তি।

গ্রামশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ—অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। তিনি আবিষ্কার করলেন অভিজাত শ্রেণীর মনন ও মানসিকতা। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ মনন ও মানসিকতায় প্রভুত্ববাদী— সব কিছুর অধিকার নিজের ভোগ-দখলের রেখে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করাই তাদের কাজ। এই মনন ও মানসিকতা হল ‘থিসিস’। ‘হেজিমনি’কে ভাঙটাই তার কাছে হয়ে উঠল ‘এন্টিথিসিস’। সে কাজ করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হতে হল তাকে। কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি তার ভাবনা-চিন্তা থেকে দূরে সরে যাননি। মার্কসবাদ মানুষের মূল্যবোধের সবথেকে বড় সম্পদ তিনি তা আজন্ম বিশ্বাস করতেন।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. Dhananjay Keer, Dr. Ambedkar: Life and Mission, Popular Prakashan, Bombay, ed.1995, Page 9

২. সৌরীন ভট্টাচার্য, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামশি পরিচয়, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, সং ১৯৯৩, পৃ-৫

৩. ড. অমিত ভট্টাচার্য, চীনের রূপান্তরের ইতিহাস, সেতু প্রশনী, কলকাতা-৬, ১ম সং. ২০০৪, পৃ-১৩৭

৪. টম. বকোমোর, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, ১ম সং ১৯৯৩, পৃ ৩১-৩২

৫. ড. বি. আর. আম্বেদকর, রাইটিং অ্যান্ড সিপসেস, ভলুম ১, ১ম সং ১৯৪৯, পৃ ৫-২২ এবং ইন্ডিয়ান

এন্টিকোয়ারী, মে ১৯১৭, ভলুম XLI

৬. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ১ম সং ২০০৪, পৃ-১৮৭

মূল সমস্যা কে চমৎকার ভাবে এড়িয়ে যাওয়ার নীতিই হচ্ছে উন্নয়ন। যখন তুমি জনগণকে আমূল ভূমিসংস্কার দিতে পারছ না, তখন তাদের হাইব্রিড গরু দাও। যখন বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছ না, তখন স্বাস্থ্যবীমার কথা বলো। চাকরির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না? চিন্তার কিছু নেই। শুধু ‘কর্মসংস্থানের সুযোগ’ এভাবে কথাটাকে পাল্টে দাও। দাসশ্রম হিসাবে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করতে চাও না? কিছু মনে করার নেই। শ্রমিক-শিশুদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নের কথা জোরালো ভাবে বলো। খুবই হৃদয়গ্রাহী শোনাবে। এমনকী এইসব মহতী ঘোষণা থেকে বেশ কিছু নিংড়ে নিতেও পারো।

গত চার দশকে ভারতীয় উন্নয়নের এ এক অকৃত্রিম কায়দা। আর এই নীতির কেন্দ্রীয় দর্শনটা হচ্ছে—যে গভীরতম বেদনা, ত্যাগ আর রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে একটা সমাজ সংস্কৃত হয়, বদলে যায়, সেই বিশাল, গভীর অনিবার্য সামাজিক আলোড়নকে এড়িয়ে যাওয়া।

অথচ আমাদের দেশেই কয়েকটি রাজ্যে যথার্থই ভূমিসংস্কার হয়েছে। তার বেশির ভাগটাই হয়েছে মাত্র চারটি রাজ্যে। যদি জম্মু-কাশ্মীরের মত একটা রাজ্যে ভূমিসংস্কার হতে পারে, তবে দেশের অন্যত্র কেন সম্ভব নয়?

সমগ্র দেশকে এক ধরলে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে। মোট চাষযোগ্য জমির এক শতাংশের সামান্য বেশি পুনর্বন্টন হয়েছে। অঙ্কের হিসেবে ৪৫ কোটি ৫০ লাখ একরের মধ্যে ৪৫ লক্ষ একর জমি দরিদ্র কৃষক, খেত মজুরদের মধ্যে বিলি বন্টন হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ২৬ লক্ষ একর জমি এখন পুনর্বন্টন করতে বাকি। যদি এই জমি পরিষদের মধ্যে বিলি করা হয়ও, তাহলেও ভারতবর্ষের চাষযোগ্য জমির মাত্র দুই শতাংশ বিলি করা হবে। কিন্তু ইতিহাসের এই যন্ত্রণাদীর্ঘ পথ এড়িয়ে ভূমিসংস্কারের অসহনীয় পীড়নের পাশ কাটিয়ে মানুষের জীবনধারণের সুস্থ সবল সংস্থান করা যায় কি? না, ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় এই পথ পরিক্রমার কোনো শর্টকাট পথ নেই। কিন্তু পরাক্রান্ত বেশ কিছু মানুষ আছেন ক্ষমতার দর্পে অন্ধ। তাঁরা মনে করেন যে, ইতিহাসের এই অনিবার্যতার সঙ্গে আপোস করে, ইতিহাসকে পোষ মানিয়ে সেই উন্নতি আনা যায়।

আর এখন এই বিশ্রান্তির দর্শনই তো চলছে, যার গাল ভরা নাম ‘বিশ্বায়ন’। ভারতবর্ষের এলিট সম্প্রদায় এই নতুন দর্শনের অভিঘাতে দারুণ উত্তেজিত এবং রোমাঞ্চিত। তাঁরাই তো জোরালো ভাবে প্রতিপক্ষের সব যুক্তি আর বিশ্লেষণকে তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে বলছেন— কোনো বিকল্প নেই। অন্য সকলেই এই পথে হাঁটছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে তাকান।

নিশ্চয়ই, এখন সকলেই এই পথে হাঁটছে। আর এরা সকলেই এই পথে এগোতে গিয়ে আরো কিছু করেছে। যদি কেন্দ্রীভূত শাসনের এই দেশগুলিকে মডেল হিসাবে ধরা হয়—তবে এটাও তো বলতে হবে যে, এরা প্রত্যেকেই ভূমিসংস্কারের পথ অতিক্রম করেই এখানে এসে পৌঁছেছে। এই প্রত্যেকটি দেশই তার জনগণকে সাক্ষর করেছে, শিক্ষাকে বিস্তৃত করেছে জনজীবনের গভীর পর্যন্ত। সাধারণ মানের হলেও স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পুষ্টি দিয়েছে তার জনগণকে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সব প্রসঙ্গকে নস্যং করে দিয়ে ভারতবর্ষের এলিটরা সামনে এগিয়ে দেন তাঁদের অত্যাশ্চর্য অবিস্কার বা এক এবং অদ্বিতীয় ভারতীয় সংস্কৃতিকে। শিশুশ্রমের ক্ষেত্রেও আবার এই সংস্কৃতি সত্যি। যদিও বহু আধুনিক সমাজ শিশুশ্রমের অভিশপ্ত সংস্কৃতি থেকে বহুদিন মুক্ত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে ‘ভারতবর্ষ তো অদ্বিতীয়, সম্পূর্ণ আলাদা’। সুতরাং এই এক এবং অদ্বিতীয় ভারতবর্ষ বিশ্বায়নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়নি।

ভূমিসংস্কার, জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এসব কিছুর সামনেই অদ্বিতীয় ভারতীয় সংস্কৃতি হিমালয়ের মত প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে। আর ঐ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতবর্ষের নিজস্ব নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করে দিচ্ছে বিদেশী এজেন্সীগুলি এবং বলাই বাহুল্য বিনা বাধায়। এই অভিন্ন সংস্কৃতির ভারতবর্ষই আবার শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার যে কোনো প্রয়াসের সামনে অলঙ্ঘনীয়, প্রায় অগস্ত্য পর্বত হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের উন্নয়ন এই অকৃত্রিম ভণ্ডামিই প্রত্যক্ষ করে চলেছে গত সাড়ে চার দশক ধরে। সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে এবং অবশেষে পুরনো অপ্রাসঙ্গিক বলে বাতিল করেছে অনায়াসে। কেউই সেই সব অমীমাংসিত মৌলিক সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু মানুষ গ্রাহ্য করেছে, মাথা ঘামিয়েছে গভীরভাবে। জমি, অরণ্য আর জলের উৎস এখনও প্রকৃত উন্নয়নের মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এইসব মৌলিক প্রয়োজনীয়তাবোধে দরিদ্র মানুষ গভীরভাবে সংলগ্ন, গভীর উদ্বেগে তাড়িত হয়। কেননা, ভারতীয়দের ৮৫ শতাংশই তো ভূমিহীন কৃষিমজুর কিংবা প্রান্তিক চাষি।

তারা জানে জীবন এত দুঃসহ কেন। প্রকৃত উন্নয়ন শুধু সমস্যাকে জানা আর এলিটদের পরিকল্পনা নিয়ে বাগাড়ম্বর নয়, তার চাইতে আরও অনেক বেশি কিছু। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে যে উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য তারা নিজেই।

॥ দুই ॥

ধরা যাক, আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে একটা সেমিনার আহ্বান করলাম। এই সেমিনারে একজন ডাক্তার, নার্স, রুগি কিংবা চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ কাউকেই ডাকা হল না। বেশিরভাগ মানুষই এই ভাবনাটাকে উদ্ভট বলে মনে করবে। সঠিকভাবেই করবে। ঠিক এরকম উদ্ভট অসংখ্য সব আলোচনা, বিতর্ক প্রতি মুহূর্তে ভূমিসংস্কারকে অর্থহীন প্রমাণ করছে। সেই সব আলোচনায় নিজের সমস্যা বলার জন্য একজনও ভূমিহীন খেত-মজুরকে ডাকা হয় না। এলিটদের কাছে এটাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ সত্যি অদ্বিতীয় এক আজব রাজার দেশ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুধুমাত্র কাজের সন্ধানে দেশান্তরী লক্ষ লক্ষ মাইগ্রান্ট মজুরকে জিজ্ঞাসা করুন—তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনে জমির সমস্যাটা কত গভীর, সে কথাই বলবে। কিন্তু কী-ই বা তারা জানে। তারা কেউই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার স্কুলে যায়নি। তারা, আমাদের দেশের জমি কিংবা যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানের মৌরসিপাট্টা নিয়ে যাঁরা বসে আছেন, সেই প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদের ধারেকাছের কেউ নয়।

চূড়া স অগণতান্ত্রিক এক আগ্রাসী, সর্বভূক শক্তি ভারতবর্ষের উন্নয়ন এগ্রিয়ার এগশক্তি কে গিলে খায়। জনস্বার্থ শুধু বাতিল হয় না, কৃষকদের জীবন থেকে জমির এসঙ্গকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয় নিঃশেষে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জলসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। গ্রামীণ সমষ্টি গত সম্পদের সম স উৎস থেকে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। উপজাতির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় আবহমান কালের অরণ্য। এত কিছুর পরেও দরিদ্র মানুষ এবং তাদের জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই এলিটদের কাছে।

প্রকৃত উন্নয়ন মানবিক সত্তা আর জীবনধারণের ক্রমোন্নতিকে জড়িয়ে রূপান্তরের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। উন্নয়নের সবরকম তত্ত্বেই এ সত্য স্বীকৃত। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ আর তাদের মতামতের মূল্য দেওয়া অপরিহার্য শর্ত। তেমনই অপরিহার্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের সংলগ্নতা। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাদের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত, সংস্কৃতি, জীবনযাপন এবং ঐতিহ্যের মধ্যে

তথাকথিত সভ্যসমাজের অনুপ্রবেশের দূষণকে কাটানো যায়।

এসবই বড় বেশি বাগাড়ম্বর বলে মনে হয়। সুতরাং এই উন্নয়নের নাটুকে চেহারাটা একটু পালটে দিতে হবে। যারা দর্শক হিসাবে নাটকের নাটকীয়তায় বিবশ হয়ে আছে, তাদের মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকায় টেনে আনো, অবশ্য আদৌ যদি তারা উন্নয়নের এই নাটকে দর্শকের সুযোগটা পায়।

যদি বাস্তবে এই সম্ভাবনা থাকে, তবে নাটকের কাহিনী আর সংলাপকে নতুন করে লেখো। এখন যাদের মুখে সমাজটাকে বদলে দেওয়ার ফুলঝুরি ছোটো, তাদের চেপে ধরো। এলিটদের মধ্যে যারা সমাজ পরিবর্তনের বাগাড়ম্বর করে চলেছেন, তারাই তো বিগত চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে এই দেশটা চালাচ্ছেন। যদি সর্বব্যাপী নৈরাজ্য আর অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে, তবে তার দায় তো এঁদেরই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে অর্থনীতির বিতর্কটা পরিবর্তন নিয়ে নয়। কার্যত বহু উপাদানের বিষ্ময়কর পারস্পর্য আজ এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে। আর এই লক্ষ্যে ১৯৯১-এর জুন-কে এক দিকে দিয়ে এক আচম্বিত উল্লম্বন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তবে এই অভিঘাতটা প্রগতির লক্ষ্যে নয়।

একজন নরসীমা রাও এবং একজন মনমোহন সিং পুরনো দুর্গন্ধযুক্ত একটা ব্যবস্থার প্রতিনিধি। আবার কী আশ্চর্য, তাঁরাই এই অপরিবর্তিত ব্যবস্থার পরিবর্তনটা চান। অথচ এরা ঐ পুরনো পচনশীল ব্যবস্থার অবিভাজ্য অংশ, এমনকী তাঁরাই এর রচয়িতা, যে পুতিগন্ধময় অতীতের পারস্পর্য এরাই বহন করছে, যা এখন অস্বীকৃতি আর পশ্চাদপদতায় চূড়ান্ত ভাবে বিকৃত। অথচ প্রবল সমালোচক গণমাধ্যম এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য, কোনো অর্থহীনতা খুঁজে পায় না।

যদি পরিবর্তন আনতে হয়, তবে সেই পরিবর্তনের স্থপতিদের অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আর মাটিতে, মানুষের জীবনে, জনজীবনের গভীরে তাদের স্বাক্ষর রাখতে হবে। গণমাধ্যমের গর্ভে জন্ম নেওয়া উচ্চনাদের প্রচারে প্রায় মহানায়ক হয়ে উঠতে থাকা কোনো ফড়ে কিংবা ফাঁপা সঙ সাজা মানুষ নয়, দেশের লক্ষ-কোটি জনতার ভাবনার সঙ্গে যোজনব্যাপী দূরত্ব নিয়ে যারা সংবাদপত্র আর গণমাধ্যমের পৃষ্ঠার মহান জননেতা হয়ে ওঠে।

জনগণ থেকে গণ-মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান এই বিচ্ছিন্নতা, বাস্তবতা থেকে অনতিদ্রুত দূরত্বে চলে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশ।

অমীমাংসিত সমস্যা

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সব সময়ই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। তেমনই নিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রে অর্থনৈতিক বিষয়ে নির্দেশাত্মক সম্পাদকীয়গুলি দরিদ্রদের কাছে প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে। অর্থনীতি বিষয়ে এলিটদের আলোচনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র জনগণের জন্যই যে সংগঠিত হয়।

বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, নীতি নির্ধারক সকলেই একটা বিষয়ে একমত পেয়েছেন যে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতেই হবে। আর একইসঙ্গে সকলেই একমত হন যে—সত্যিই, যতটা করা দরকার ততটা করা যাচ্ছে না।

অনেকে আবার তীব্র আক্রোশের সঙ্গে দুটো প্রয়াস একই সঙ্গে চালাবার কথা বলেন। সে দুটি হল, গরিবি কমানো, দ্বিতীয়ত, আর্থিক সংস্কার (এলিটদের বিবেচনায় যা সংস্কার) এবং বিকাশ। সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে সবসময় এই দুটি বিষয় থাকে। এই বিতর্কের বিন্যাসটি এরকম হলে সকলেই খুশি। সকলেই খুশি, কেননা প্রগতি অব্যাহত আছে। সংস্কারও চমৎকার। তবুও মুদু অতৃপ্তির একটা ভঙ্গি রেখে দেওয়া হয় যে, দারিদ্র্য নিয়ে অবশ্যই কিছু করা দরকার।

অমীমাংসিত সমস্যার তালিকার মধ্যে আছে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। এইসব নিয়ে আলোচনা শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীরা যে যার কর্মক্ষেত্রে যেভাবে চলছিল সেই ভাবে কাজ করতে ফিরে যায়। এটা হচ্ছে এজেন্ডার দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশটি গাভীরূপে এক ভগুামি, সবাই জানে সেটা। কিন্তু যথার্থ কিছু করার এক ধরনের আত্মসন্তুষ্টি আছে এতে।

নরসীমা রাও সরকার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভীষণ এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯৯৫-এর মার্চ মাসে। সেই মাসেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দারিদ্র্য দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু নতুন দপ্তর গঠনের ঘোষণাও হয়েছিল। ৯ মার্চের বেশিরভাগ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

সরকারি প্রগতির সেই বিজ্ঞপ্তি পড়াও এক বিশ্ময়কর অভিজ্ঞতা। যদিও সংবাদপত্রগুলি সেই চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উঠতে পারেনি।

নবগঠিত দপ্তরগুলির মধ্যে খাদ্য দপ্তরের কাজকর্মের দায়িত্ব এবং অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম নির্দেশিকা ছিল : ‘খাদ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও বিদেশে আহৃত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নানাবিধ চুক্তি করা।’ অগ্রাধিকারের এই নির্দেশিকাই তো আমাদের প্রায় সবকিছু জানিয়ে দিচ্ছে। বাকিগুলির উল্লেখ করার

এতো সব সাফল্য, সমস্যার সমাধান, তার জন্যে কৃতিত্ব দাবি—এ সবই যদি উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হয় তার একমাত্র কারণ একটা বিরাট শূন্য নিয়ে এত আড়ম্বরপূর্ণ নাড়াচাড়া উন্মাদ ছাড়া আর কে করতে পারে?

দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে যে বিতর্কগুলি হয়—এটা তার সামান্য নমুনা। এই আলোচনা, প্রকল্প রূপায়ণ, তারপরে তার সাফল্য দাবি—একটা পর্যায়ের পর কিছু সংখ্যা ছাড়া আর কিছু পড়ে থাকে না।

দারিদ্র্য সম্পর্কে ক্যালোরির পরিমাপে একটা ধারণা পাওয়া যায়। অথচ যারা দরিদ্র নন তাঁরা এসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে চান না। আর এই কারণেই অর্থহীন, তাৎপর্যহীন পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে নজর দেওয়া উচিত। কেননা দাবি করা হচ্ছে যে— দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা জনসংখ্যাটা নাকি নাটকীয়ভাবে কমছে। ১৯৮৭-৮৮ তে যা ২৫.৫ শতাংশ ছিল, ১৯৯৮ সালে তা কমে হয়েছে ১৯ শতাংশ।

জানুয়ারি ১৯৯৬-এ পরিকল্পনা কমিশন এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করার আগে সংবাদপত্রে প্রাসঙ্গিক একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, দারিদ্র্য স্পষ্টভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং এটাই সর্বকালীন রেকর্ড। কোন সূত্রে এটা জানা গেছে? সংবাদ-সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারি সূত্র’ থেকে এ সংবাদ জানা গেছে।

সরকারি সূত্র, তাও আবার সর্বোচ্চ পর্যায়ের! দারিদ্র্য নিয়ে উচ্চস্তরের রসিকতার একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এ কথাটার মধ্যে? দারিদ্র্য দ্রুত হারে কমছে। সেই কৃতিত্বটা নিজেরা যেন কিছুতেই নিতে চাইছে না উচ্চ পর্যায়ের সরকারি আমলারা। ভণ্ডামি কিংবা নষ্টামিরও একটা সীমা আছে। এ যেন কিছুতেই জনসমক্ষে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্বটা আইনস্টাইন নিতে চাইছেন না।

দারিদ্র্য কি রাষ্ট্রের অত্যন্ত গোপন কোনো কিছু, যেটা জনসমক্ষে আনার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারি সূত্রের প্রয়োজন পড়ে? গ্ল্যানিং কমিশন তারই নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ফেলে দিয়ে নতুন এক সম্ভাব্যতার সংখ্যাতত্ত্বে পৌঁছেছেন। ১৯৯৩ সালে তাদের রিপোর্টে দারিদ্র্যসীমার নীচে ৩৯ শতাংশ মানুষ আছে; হিসেবটা এমনিই দিয়েছিল। যদি আমরা তর্কের খাতিরে পুরনো, বাতিল পদ্ধতি, কমিশন এখন যার ভিত্তিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করতে চলেছে, তাকে মেনে নিই, সেই পদ্ধতিতেও আর্থিক সংস্কারের বছরগুলিতে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার কোনো উজ্জ্বল চিত্র দেখা যাবে না। বরং উন্টোটাই বাস্তব। সমীক্ষার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে দেখা গেছে

যে, আশির দশকে গ্রামীণ গরিবি ক্রমশ কমেছে আর শুধু আর্থিক সংস্কারের প্রথম আঠারো মাসে দরিদ্র তীব্রভাবে বেড়েছে। ভূমিহীন কৃষিমজুর যারা প্রান্তিক চাষি, যারা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ, তাদের জীবনের শোচনীয় অবস্থা থেকে এইসব সংখ্যাতত্ত্বের ভণ্ডামি আর মিথ্যাচারের বিষয়টাকে বোঝা যায়। এই ৮৫ শতাংশ খাদ্যশস্যের মূল ক্রেতা খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি এদের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নকেই চূড়ান্তভাবে বিপন্ন করে। আবার মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যক্ষভাবেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে দরিদ্র অংশের মধ্যে এর প্রভাব সবচেয়ে শোচনীয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং ব্যবহারজীবীরা শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় তাদের আয়ের অনেক কম অংশ ব্যয় করে খাদ্যে। খেত-মজুর এবং ছোট চাষিদের তুলনায় এদের খাদ্যের ব্যয় অনেক কম। ফলে যখন খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এই দরিদ্র অংশ। আক্রান্ত হয় শিল্প-শ্রমিকরাও।

যদি লক্ষ-কোটি মানুষ অর্ধাহারে থাকে, তাহলে কাদের নিয়ে সংস্কার হবে? ভারতবর্ষের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের যোগান কমছে। মাথাপিছু চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, মকাই আর ডালের দৈনিক যোগান ১৯৯১ সালে ছিল ৫১০ গ্রাম। ১৯৯৫-৯৬ সালে সেটা দাঁড়িয়েছিল ৪৬১ গ্রামে। সরকারি পরিসংখ্যানেই এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। অথচ আমাদের ও কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উদ্ভূত আছে, যার জন্যে আমরা গর্ববোধ করি। এখানেও শুধু শোবার জায়গা দেখিয়ে বাসস্থানের সমস্যা সমাধান করার মতো ব্যাপার আর কী!

গণ-বন্টন ব্যবস্থা

গণ-বন্টন ব্যবস্থাও দ্রুত ক্ষয় পাচ্ছে। চার বছরের বেশি সময় ধরে গণ-বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য কেনার পরিমাণটাও দ্রুত কমছে। কেন এমনটা হচ্ছে? কারণটা স্পষ্ট। সরকার ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ৮৫ শতাংশ। ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তর কালের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির পরিমাণটাও কমানো হয়েছে ২ কোটি টন। দেশের খাদ্যশস্যের বিপুল মজুত ভাণ্ডারের কথাটা সরকারের পক্ষ থেকে খুব জাঁক করে এই সময়েই বলা হত।

১৯৯৫-এর মার্চ থেকে জুনের মধ্যে মহারাষ্ট্রের ধুলেতে উপজাতি পরিবারের ১৯টি বাচ্চা অনাহারে মারা যায়। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা যেখানে ঘটে সেখান থেকে সরকারি খাদ্যশস্যের গোড়াউনটা খুব কাছে। গোড়াউনের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের বিপুল সম্ভার। অথচ প্রাণপ্রাচুর্যের এত সমারোহের এত কাছে থেকেও

উনিশটি শিশু কতদূরে চলে গেল।

১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী নতুন Revamped Public Distribution System (RPDS) চালু করেন। এই প্রকল্প চিহ্নিত হয় 'strictly targeted region' বলে। গণবন্টন ব্যবস্থায় যে 'অপচয়' হচ্ছিল, কঠোরভাবে তা বন্ধ করতে এই প্রকল্প চালু হয়। দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ১৭৭৮ টা ব্লকে চিহ্নিত করে RPDS চালু করা হয়। নিরঙ্কুশভাবে দরিদ্রদের জন্যই বিশেষভাবে এই প্রকল্প কাজ শুরু করে। বিগত পাঁচ বছরে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা যেসব ব্লকগুলিতে ঘটেছিল, এই প্রকল্প সেই ব্লকগুলির ক্ষেত্রেই চিহ্নিত ছিল। ভারতবর্ষের অন্যতম ধনী সমৃদ্ধশালী রাজ্য মহারাষ্ট্রের থানে, ধুলে, অমরাবতী জেলা, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলা এই প্রকল্পের আওতায় আসে।

বাস্তবে RPDS প্রকল্পের সংক্ষেপে বিশেষত্ব হচ্ছে, দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় প্রতি কেজি ৫০ পয়সা কম দামে খাদ্যশস্য বিক্রি করা।

গণ-বন্টন ব্যবস্থায় RPDS খাদ্যশস্যের দাম ছিল প্রতি কেজি ৮ টাকা। ১৯৯৪ সালে সরগুজার জেলা কালেক্টর জানিয়েছিলেন যে—জেলার দরিদ্র মানুষেরা বছরে সাকুল্যে ১২৫ দিন কাজ পায়। তারা কীভাবে RPDS -এর সুযোগ নেবে— প্রধানমন্ত্রী বা প্রকল্পকাররা তা বলেননি।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরি তখন ঠিক করা হয়নি। ঐ প্রকল্পের অধীন এলাকাগুলিতে ন্যূনতম মজুরিরও রকমফের আছে। ২০ থেকে ২২ টাকা। আর বাস্তবে গরিব অসংগঠিত শ্রমিকরা ১৫/১৬ টাকার বেশি কোথাও পায় না।

১৯৯৫ সালে দেশের দারিদ্র্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কে. আর বেনুগোপাল তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন—PDS বা RPDS যে নামেই প্রকল্প চলুক না কেন, দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে কোনোটাই প্রাসঙ্গিক নয়।

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাপনের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি শহরের এলিটরা। অনেকে আবার আন্তর্জাতিক মূল্যে খাদ্যশস্য রপ্তানির কথাও বলেছেন। অথচ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ কৃষিজীবীই খাদ্যশস্যের মূল ক্রেতা। দেশের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে ভারতীয় কৃষক কিংবা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কথা তো সেই পরগাছা এলিটরা বলে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক মূল্যে তাদেরই শ্রমের ফসল রপ্তানি করা হবে অথচ সেই সঙ্গে তাদের মজুরির কথা ভাবা হবে না। এটা হচ্ছে সংক্ষেপে অত্যাব্যশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যের

বিশ্বায়ন। আর মজুরির স্বদেশীকরণ।

মিড ডে মিল চালু করে মাথাপিছু প্রতি শিশুর মিলের খরচ ধরা হয়েছিল ৫০ পয়সা। বাসস্থানের প্রকল্পের বিপর্যয়কর প্রহসন তো আগেই দেখা আছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কারের নয়া দৃষ্টিভঙ্গির ছোঁয়ায় অনান্য সংক্রামক রোগসহ ম্যালেরিয়ার যেন ভয়াবহ পুনরুত্থান ঘটলো। এই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ৭০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি বিশাল গ্রামীণ উন্নয়নের বাজেটে দুটি প্রধান ফার্টিলাইজারের জন্য অনুদান হিসাবে ধার্য করা হলো (যে দুটি সার ব্যবহার হত প্রধানত, ‘তেমন দরিদ্র জেলা নয়’ বলে চিহ্নিত জেলাগুলিতে)।

এভাবেই মানুষের অধিকার, মানবাধিকার, শ্রমহীন শৈশবের অধিকার, শিক্ষার অধিকার—সমস্ত প্রশ্নেই ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতিটি নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

সরকারের সম স দায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলারও কত কায়দাকৌশল! তার মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ের এখান কৌশল হচ্ছে এন.জি.ও.দের কাঁধে সবকিছু চালান করে দেওয়া। দেশের কোটি কোটি মানুষের মৌলিক সব গভীর এবং বিপুল সমস্যার পাহাড় এন.জি.ও.-রাই সামলাতে পারবে এমন একটা বিপজ্জনক ধারণাও দেওয়া হচ্ছে যে সমস্যা নিবাচিত একটি সরকার রাষ্ট্র যন্ত্রের সম স মতা কেন্দ্রীভূত করেও মেটাতে পারছে না।

দায় চালান

আর এই পরিণতিতেই এন.জি.ও. কর্মী এবং সংগঠনগুলি কাজ করে। এদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা খুবই পরিষ্কার যে, বেশিরভাগ গুণত্বপূর্ণ সমস্যার দায় সরকারেরই নেওয়া উচিত। অথচ সরকার নিজের দায়টা এন.জি.ও.দের ঘাড়েরে চালান করে দিতে চাইছে। আবার এন.জি.ও.দের বড় একটা অংশ যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে সরকারি সম স দায়ই যেন বেসরকারী দাতব্য আর স্বৈচ্ছাসেবীদের মহানুভবতার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও, দুর্নীতি আর অপরাধমূলক নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, যে এন.জি.ও. গুলির সঙ্গে করপোরেট সেক্টরের যোগাযোগ আছে, তাদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ঘনিষ্ঠতা যেন এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মতই আঠালো, এক ধরনের ধর্মীয় আনুগত্যের মতই নিবিড়ভাবে গাটছড়া বাঁধা।

উন্নয়নের বিষয়গুলি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সংবাদ পরিবেশনের কায়দা

আসল সমস্যাকে কখনও ছোঁয় না। প্রধানত দুটি ধারায় এই সাংবাদিকতা চলে। তার গালভরা নাম ‘উন্নয়ন সাংবাদিকতা’। একটি ধারা সরকারি উদ্যোগকে কেন্দ্র করে হাততালি পরিবেশন করে। অন্যটা এন.জি.ও. মুখ্য বিহুলতার বিবশ অবস্থা। দুটোই সমানভাবে ব্যর্থ। প্রথমটি সরকারকে আড়াল করতে গিয়ে নিজেরাই নগ্ন হয়ে যায়। আবার এন.জি.ও. গুলিকে আমলাতান্ত্রিক বিলম্বিত ব্যবস্থা থেকে মুক্ত, প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তনের জায়গায় গতির অপরিমেয় প্রাণশক্তি, আদর্শে আর সৃজনক্ষমতায় পুষ্ট, দ্রুত সাড়া দেওয়ার মত গতিময় এক নাটুকে সংগঠনের চেহারা দিতে গিয়ে সাংবাদিকতা নিজেই ছিদ্রময় হয়ে পড়ে, সরকারি এবং বেসরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে গিয়ে নিজেরাই অন্ধকার সব মিথ্যাচারের কারণে হাস্যকর হয়ে যায়।

এটাই আর্থিক সংস্কার আর বিদায়নের নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। এন.জি.ও. রা জনগণের প্রতি সরকারি দায়বদ্ধতার ত্রুটি দেখবে এক ধরনের স্বেচ্ছাসেবী দাতব্যের দৃষ্টি ভঙ্গিতে। আর অন্যদিকে সরকার দেখবে জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের সম্পদ কীভাবে কত কম সময়ে দ্বিগুণ, চারগুণ, বহুগুণ বাড়ানো যায়। এই দৃষ্টি ভঙ্গি র এখান এবং খুবই উত্তেজক উৎসাহ আবার আসছে বিদ্যায় থেকে।

১৯৯৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর, বিদ্যায়ের বুলেটিনে বলা হয় যে, বিদ্যায়ের একে এন.জি.ও.দের অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। ব্যা এজেন্টে এন.জি.ও.দের অংশগ্রহণ ৩০ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। আর আমরা, তৃতীয় বিশ্বের জনগণ, এন.জি.ও. এবং বিদ্যায় কী পবিত্র সন্ধি কিংবা সাধুর মত চরিত্র নিয়ে কাজ করে চলেছে, তা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

জমির উর্বরতা গিলে খাবার ফার্টিলাইজার, ক্ষতিকর কনট্রাসেপটিভ, বাতিল প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক তহবিলের পেশীশক্তির জোরে কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এন.জি.ও.গুলি জমা করছে সেই রুদ্ধশ্বাস অভিযান আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এমনকী কর্পোরেট মার্কেট রিসার্চ, তার জন্যও এন.জি.ও. গুলিকে ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে অনেক সংগঠনই, যেখানে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যে মাটি সবসময় সরস, সেখানে শুখা, মরুজমির ড্রিপ-ইরিগেশন চালু করতে চাইছে। যে প্রযুক্তি ইজরায়েলের মরুভূমিতে চলে সেই প্রযুক্তিই ভারতবর্ষের আর্দ্র মাটিতে ব্যবহারের জন্য মেশিনপত্র বিক্রি করছে ঢালাওভাবে। কেননা এই প্রযুক্তির কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে তাদের মাল বিক্রি করতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারি বহু প্রকল্পের ঠিকাদার হিসাবে কাজ করছে এন.জি.ও. গুলি।

তারা হোয়াইট কলার কর্মীদের কর্মসংস্থানও করছে। আমাদের পাশের দেশ

নেপাল। ১০ ল -এর বেশি এন.জি.ও. সেখানে কাজ করে। তার মানে এতি দু হাজার জনসংখ্যায় একটা এন.জি.ও.। তুলনা কন, এতি দু হাজার মানুষপিছু কতজন শি ক, ডাক্তার, নার্স আছে সেখানে। ১৫০টি বিদেশি এন.জি.ও.-র মাধ্যমে বিদেশ থেকে যে অর্থ আসে, তার পরিমাণ নেপালের জি.এন.পি.-র ১২ শতাংশ। এই বিপুল অর্থে কার কোন পরিক না চালাবার চেষ্টা করা হচ্ছে? ভারতবর্ষে এই তহবিলের অংশটা কত, এটা বার করাও শক্ত। আরো কঠিন ক না করা। তবে এটা নিশ্চিত যে, বিপুল অর্থে ডলার কুল বাবী জলোচ্ছাসের মত ঢুকে আসছে আমাদের জীবনযাপনের এতিটি ত্রে।

বেশকিছু সরকারি কর্তব্যক্তির আত্মীয়রা এন.জি.ও. চালাচ্ছে, কেউ আবার অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এন.জি.ও. খুলে বসছেন। এ এক আশ্চর্য দায়হীন মহানুভবতা! দানহীন দাতব্য!

ভারতবর্ষের অধীনে বিদেশি অর্থসাহায্য পেতে গেলে এন.জি.ও. গুলির 'Foreign Contribution Regulation Act' (FCRA) এর সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। যদি আবেদনকারী নিজে পদস্থ সরকারি কর্মচারী হয়, তবে এই সার্টিফিকেট পেতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। কেউ কেউ চাকরি জীবনের শেষ সময়ে পৌঁছে অবসর নেওয়ার আগেই প্রক্রিয়াটা চালু করে দেয়। এই গড়ে ওঠার প্রস্তুতি পূর্বে অন্য একজন এন.জি.ও.র শীর্ষে অবস্থান করে। সবচেয়ে ওপরের চেয়ারটি খালি হয়ে যায় ঠিক সময়ে অবসরের পর, সার্টিফিকেট হাতে এবার জাঁকিয়ে এসে বসেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবল কর্মী-প্রজাতির দেশভক্তটি। প্রাক্তন কর্মচারী, বিশেষ করে প্রশাসনের ওপরের দিকে থাকলে আরো সুবিধা আছে। তাঁর জানেন কোন রক্তপাথে বিদেশি অর্থ আসে, তাঁরা এও জানেন সরকার কাদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সুতরাং সেই মত প্রকল্প তৈরি করাটা তখন শুধু কাগজ ভরাবার ব্যাপার। তাদের সঠিক জায়গায় যোগাযোগটাও আগে থেকে মসৃণভাবে তৈরি থাকে। ফলে তারা খুব দ্রুত সরল হয়ে ওঠেন ঠিক যেভাবে প্রাক্তন সেনা অফিসাররা চমৎকার অস্ত্র-বিক্রেতা হয়ে ওঠেন।

শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাজকর্মের প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু জেলায় অসংখ্য এন.জি.ও. হঠাৎ রাতারাতি গজিয়ে ওঠে।

১৯৯২ সালে USAID চুক্তির পর মাত্র দশটা জেলায় শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের তহবিল আসে।

শহর ভারতবর্ষে বহু এন.জি.ও. শুধুমাত্র AIDS কে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠেছে। কেননা AIDS বিরোধী যে কোনো কর্মসূচী মানে টাকার ঝনঝনানি। ওড়িশার কান্ধামাল জেলায় একটি উপজাতি গোণী ১৫টা এন.জি.ও.-র বি দ্ধে কার্যত যুদ্ধ

ঘোষণা করেছিল। তাদের মধ্যে বিখ্যাত কিছু এন.জি.ও. ছিল। সশ্রী লিভভাবে বিপুল অর্থ চুরি করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল তাদের বি দ্বে।

উপজাতিরা ছ'মাসের মধ্যে তল্লিতল্লা গুটিয়ে তাদের জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় দিয়েছিল। তারা সংবাদপত্রে ওই এন.জি.ও.গুলির কর্মী-সংগঠকদের এক নামের তালিকাও প্রকাশ করেছিল। বহু দুর্নীতি আর নিকৃষ্ট অপরাধের অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে। কেউই সেই অভিযোগ অস্বীকার করেনি।

CAPRAT একটি সরকার-প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। উদারভাবে এন.জি.ও. দের তহবিলের যোগান দেয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে তাদের ৩৫০ এন.জি.ও. কে কোটি কোটি টাকা তহরূপের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। CAPRAT কর্তৃপক্ষ খুবই অর্থবহভাবে বলেছিলেন যে,— 'এতো সবে শুরু'।

তবে এটা কোনো একমুখী সমস্যা নয়, বেশ কিছু এন.জি.ও.র আবার এমনই বহু অভিযোগ আছে CAPRAT -এর বিরুদ্ধেই।

কালো তালিকাভুক্ত করাটা পাথরে খোদাই করা কোনো অনুশাসন নয়। এটা করে সব এন.জি.ও. কে চিহ্নিত করাও যাবে না। কিন্তু যেটা অস্বীকার করা যাবে না, তা হলো, দুর্নীতি তার সর্বগ্রাসী থাবা নিয়ে এন.জি.ও.দের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

কিন্তু এন.জি.ও.দের হাত ধরেই একমাত্র প্রকৃত উন্নয়ন আসতে পারে, প্রায় সংস্কারের মত এই বিশ্বাস এখনও অটুট আছে। যদিও কিছু এন.জি.ও. অসামান্য কাজ করছে। তবুও এই সংগঠনগুলিকে কেন্দ্র করে যে রোমান্টিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়াস, তা এখন হাস্যকর মুখামির মত হয়ে গেছে।

একটি ব্রিটিশ এন.জি.ও. ভারতবর্ষে 'Change makers' নামে মান্টি-এপিসোডের একটি টিভি প্রোগ্রাম শুরু করেছিল। বিপুল ব্যয়ে নির্মিত এই কর্মসূচীতে পরিবর্তন নিয়ে আসার কাণ্ডারী গ্রামীণ জনগণ নয়, এন.জি.ও. কর্মীরাই পরিবর্তনের বীরনায়ক; এভাবেই দেখানো হোতো। সংক্ষেপে অসভ্য, বর্বর, হিংস্র এক দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক সংস্করণ। যেখানে মানুষ নয়, এন.জি.ও.রাই দিন বদলের নায়ক। অতীতে ঠিক এভাবে মিশনারিদের মহিমায়িত চেহারা দেওয়া হত।

উন্নয়ন যেন টাকা বোনার শিল্প। এতখানিই এর মূল্য যে, বছরে ২৬ গুণ হারে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক জার্নালে একে অভিহিত করা হয়েছে 'ডেভেলপমেন্ট বিজনেস' বলে। সারা বিশ্বে উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ, যোগাযোগ এবং নানা ধরনের সুবিধা যোগানের তথ্যসম্বলিত একটি পাক্ষিক পত্রিকা এই জার্নালটি।

এই ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাক্সি এন.জি.ও.দেরই বেছে নেয়। একই সঙ্গে তাদের ঢাক পেটাবার জন্য উৎসাহিত করে ‘উন্নয়ন সাংবাদিকতাকেই’।

সরকারি কর্মকাণ্ডের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণে এন.জি.ও.গুলি ভালো কাজ করতে পারে। সীমিত পরিসরেও তারা চমৎকার কাজ করতে পারে। কিন্তু তারা সরকারের বিকল্প হতে পারে না। সরকারের দায়-দায়িত্ব পূরণ করতে পারে না তারা। এই দেশের সবচেয়ে অপদার্থ সরকারটিকেও পাঁচ বছর অন্তর জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আর এন.জি.ও.রা শুধু দায়বদ্ধ তাদের তহবিলের যোগানদারদের কাছে।

দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাও

সংবাদমাধ্যমের কাছে কী প্রত্যাশা থাকতে পারে? যখন উন্নয়নের খবর শোনাবে তখন যেন সেই কাহিনীর কেন্দ্রে জনগণ আর তাদের প্রয়োজনটা থাকে। গ্রামীণ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে সংবাদ যেন পরিচ্ছন্ন হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক সংগ্রাম— রাজনীতির নামে যে ইতরামি চলে, তা নিয়ে নয়।

সামান্য কিছু সং সাংবাদিক এভাবেই সংবাদকে বিচার করেন। আবার তাঁদের রাজনৈতিক, বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতির পক্ষাবলম্বী বলে চিহ্নিত হবারও ভয় থাকে। সে যাই হোক, বাস্তবকে এড়িয়ে চললে কারোরই ভালো হয় না। যে সমাজ নিজেকে জানে না, তার উন্নয়নের জন্য সে কিছু করতেও পারে না। আর উন্নয়নের কেন্দ্রে তো রাজনীতিই আছে। কীভাবে ভারতবর্ষের জনগণ বেঁচে আছে সেই নিদারুণ বাস্তবতাকে জানানোও তো সংবাদপত্রেরই কাজ।

চার দশকের পরে, উন্নয়নের চিত্রটা একই রকম বিবর্ণ, পাণ্ডুর। পরিশুদ্ধ এবং এয়োজনীয় পানীয় জল পায় না, সারা পৃথিবীর তেমন এতি তিনজনের একজন ভারতীয়। সারা বিশ্বের এতি দু জন নির রের একজন ভারতবর্ষের নাগরিক। এই বিশ্বের যে শিশুরা স্কুলে ঢোকার সুযোগ পায় না, তাদের এতি তিনজনের একজন ভারতবর্ষের। বিশ্বের চরম দরিদ্র মানুষের বৃহত্তম অংশই এদেশে বাস করে। পৃথিবীর স্ব তম পরিসরে যাদের মাথা গোঁজার ঠাই, তাদের সিংহভাগই ভারতবর্ষের নাগরিক। সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে কম কাপড় ব্যবহার করে ভারতীয়রাই। OECD ভুক্ত চব্বিশটা দেশের সন্নি লিত বেকার সংখ্যার চাইতে বেশি ভারতবর্ষের কর্মহীনের সংখ্যা। এরপরও আছে বিশ্বের বৃহত্তম শিশুশ্রমিকদের বাহিনী চার কোটি চল্লিশ ল শিশু শ্রমিক। গত পাঁচ বছরে UNDP-র Human Development Index- এ সামান্যতম উন্নতি হয়নি ভারতীয় জীবনযাত্রার মানের। বরঞ্চ অবনমন ঘটেছে। সারা বিশ্বের এতি তৃতীয়

কু রোগী ভারতীয়। এই পৃথিবীতে জলবাহিত রোগে যারা এতিমুহূর্তে মরছে তাদের এতি চারজনের একজন ভারতীয়। সারা বিশ্বের যে কোনো সময়ের হিসেবে টিবি রোগাত্র ১ নদের পাঁচত্তর শতাংশ ভারতীয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি হীন মানুষ, সবচেয়ে বেশি পুষ্টি হীন মানুষ ভারতীয়।

প্রায় একযুগ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক এটর্নি মার্কিন সংবাদপত্রের বিকৃত ভূমিকা সম্পর্কে বলেছিলেন—মার্কিন সংবাদপত্র সমাজের অভ্যন্তরের দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে না।

পরিচ্ছন্ন সংবাদমাধ্যমের ন্যূনতম কর্তব্য সম্পর্কে এই মন্তব্য একটা চমৎকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়। আর এই কাজটাই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রমবর্ধমান হারে পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সে মণ্ডল কমিশন হোক, অযোধ্যা কিংবা অর্থনীতি যাই হোক না কেন, সেই সংজ্ঞার ন্যূনতম মানেও এদেশের সংবাদমাধ্যম পৌঁছতে পারছে না। দরিদ্র জনগণের অধিকার আর সচেতনতার ইঙ্গিতবাহী সংবাদগুলি সেই সংজ্ঞার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দিতে পারে সংবাদপত্র। ভারতবর্ষে সংবাদমাধ্যমের খোঁচাখুঁচিতে সরকার নড়েচড়ে বসে। কিছু কিছু বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অনন্য ভূমিকা পালন করে, যেমন ভারতবর্ষে নানা ঘটনা সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনা আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি। এমনকী ৮০-র দশকেও কালাহান্ডির কাহিনী দেশের দু'দজন প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করেছিল সেখানে ছুটে যেতে।

কিন্তু ব্যবস্থার গভীরে যাওয়া, তার সীমাবদ্ধতার কারণগুলি তুলে ধরা—এই প্রশ্নে তাদের ব্যর্থতা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হাজারো রক্ত পথের সন্ধানে তাদের স্বেচ্ছা দৃষ্টিহীনতা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। অথচ এই ক্ষেত্রেই তাদের পারদর্শিতা অতুলনীয় ছিল। সেই ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশনার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা বাড়ছে।

মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা থেকে ক্রমশ স্বেচ্ছা নির্বাসনে সরে যাচ্ছে সংবাদজগৎ। রাজনীতির মৌলিক প্রশ্নগুলি থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে খেলাধুলা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্র, ফ্যাশান ডিজাইন, গ্ল্যামার কলাম, এমনকী সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার এবং তার প্রস্তুতি পর্যন্ত অনেক বেশি জায়গা দখল করছে এখন।

সামাজিক ক্ষেত্রের সংবাদগুলি স্বল্প হলেও জায়গা পায়। তবে সেই সংবাদেও বিশেষ অগ্রাধিকার আছে। জেলে রাজেন পিল্লাই-এর মৃত্যু না ধুলেতে উনিশটি শিশুর অনাহারে মৃত্যু, কোন সংবাদটি প্রাধান্য পাবে? ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ সাময়িক পত্রিকাটি

অন্যভাবে শিশু মৃত্যুর চাইতে অনেক অনেক বেশি জায়গা নিয়ে পরিবেশন করে ইমরান খানের বিবাহ সংবাদ কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ।

কটা পত্রিকা গ্রামীণ দারিদ্র্যের কার্যকারণ আর ঘটনা নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে? বেশিরভাগ সংবাদপত্রেই যে সাংবাদিক শিক্ষাক্ষেত্রের সংবাদ পরিবেশন করেন, তিনিই আবার অন্যান্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী খবরের সন্ধানে ছোটেন। সামাজিক অন্যান্য সমস্যাকে কেন্দ্র করেও একই সমস্যা। তাহলে ভারতবর্ষের অমীমাংসিত সব সমস্যার প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমের ন্যায়বিচার কীভাবে সম্ভব?

অথচ ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সমাজ-সচেতনতার গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা এই অমোঘ হাতিয়ারটির অন্তর্ভেদী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজসচেতন সাংবাদিকতা—এই দুই মহতি দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে নিজেরাই বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন।

২০, ৩০ কিংবা ৪০-এর দশকের সাংবাদিকদের ক্ষমতা অনেক সীমিত ছিল। কেউ কেউ তাঁদের ইস্তহার লিখিয়েও বলতে পারেন। এতদসত্ত্বেও খুব ছোট ছাপাখানা থেকে অনেক বড় আর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হত তাঁদের কলমে।

১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাঠানোর জন্য রয়টারে এফ.এইচ. এস. মিয়ার ওয়েদারকে দায়িত্ব দেয়। তাঁর রিপোর্ট ছাড়া A Tour through the Famine Districts of India গ্রন্থও রচিত হয়ে যায়, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতে সংবাদ সংগ্রহের সূত্রে। সেই গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে তিনি এই দায়িত্ব নেন। অন্য নানা বিষয়ের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির নোংরা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, প্রকাশ্যে তিনি এটা চেয়েছিলেন। ভারতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ লিখতে এসে দুর্ভিক্ষের শ্রমীদের সপক্ষেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থার এই বীরপুরুষটি।

ভারতীয় প্রেসকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে আক্রমণ করে তিনি বলেছিলেন যে, এদের বিরুদ্ধে কঠোর সেন্সরশিপ দ্রুত প্রয়োগ করা শুধু নয়, এটা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

এর থেকেই তো বোঝা যায় যে, মাক্কাতার আমলে পশ্চাদপদ অতি সাধারণ ক্ষুদ্র ছাপাখানা জাতীয় জীবনে কী অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। তার একশো বছর পর

এখন অনেক বড় অত্যাধুনিক মুদ্রণ ক্ষমতা নিয়ে সেই উজ্জীবনের ধারে কাছে আমরা নেই। দেশের লক্ষকোটি মানুষের জীবনের সব গুরুতর সমস্যা কী গভীর দায়বদ্ধতা দাবি করছে! অথচ সরকারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন করছে না কেউ।

আর এখন তো আরো আগ্রাসী কায়দায় আত্মবিলোপের কৌশল দ্রুত আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই গিলে খাচ্ছে। ভারতীয় সংবাদজগতের বিদেশীকরণ চলছে বিপজ্জনক দ্রুততায়। জাতীয় জীবনচর্যা, তার জনজীবনে নিদারুণ সব সমস্যাগুলিই ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে।

এখনও সর্বোচ্চ দক্ষতার সৎ এবং বিবেকবান বহু সাংবাদিক আছেন যাঁরা সমাজের অন্তর্গত দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত দিতে পারেন। আর এখন সেই দিশাকে ফলবতী করার প্রযুক্তিও ক্রায়াস্ত।

এখন প্রশ্ন হলো যে- কঠোর সত্য বলা উচিত, সংবাদমাধ্যম সেটা বলবে কী না?

অস্পৃশ্যতা - আশ্বেডকরের কথা

অশীন দাশগুপ্ত

আশ্বেডকরকে আমরা দুটি কারণে মনে করি। এক, তিনি ১৯৩০-এর দশকে গান্ধীর সুবিদিত উপোসের সময় (১৯৩২ সাল) তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন। গান্ধীর বক্তব্য আমরা অনেক জায়গাতেই পাই। কিন্তু আশ্বেডকরের বক্তব্য যেন হারিয়ে গিয়েছে। সেকথা এখন মনে করা দরকার। দ্বিতীয় যে কারণে আমরা আশ্বেডকরকে মনে রাখি তা হলো, এই তীক্ষ্ণদী বাস্তববাদী পুরুষটি গান্ধীকে অনেক অনর্থের মূল কারণ বলে মনে করতেন। এবং তিনি জওহরলাল হেরুকে সহ্য করতে পারতেন না। তিরিশ চল্লিশ দশকের এই বক্তব্য এখন খুঁজে পাওয়াই কঠিন। কিন্তু আশ্বেডকরের সমাজ-সচেতনতা আমরা মনে রেখেছি। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। তাঁর সেই নির্মোহ সামাজিক সুবিচারের নির্দেশ ভারতবাসী স্মরণে রেখেছে। এখন অসুবিধে এই যে, গান্ধী ও নেহরু দুজনেই সামাজিক সুবিচার চাইতেন। আশ্বেডকরও চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তিনজন তো তিনরকম পথনির্দেশ করে গেছেন। তফাটটা কোথায় হল, আশ্বেডকরের কথায় একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করছি। তবে বলা ভাল যে জওহরলালের কথা আশ্বেডকর বিশেষ কিছুই বলেন নি। উদ্ঘাটুকুই রয়েছে, বক্তব্যটুকু নেই। বক্তব্যে শুধুই গান্ধী।

প্রথম যে পুস্তিকাটির কথা ভাবছি সেটা আশ্বেডকর প্রকাশ করেন ১৯৪৩ সালে। সেটির নাম *Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables*. কানাডার কুইবেক শহরে একটি সভা হয়েছিল, তাতে আশ্বেডকর একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেই প্রবন্ধ থেকেই এই পুস্তিকাটির উৎপত্তি। তাঁর প্রথম বক্তব্য হল যে, ১৯৪১-এর আদমশুমারিতে অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে অনেক অনর্থ ঘটে গেছে। এই আদমশুমারিগুলি একসময় ছিল শুধু জনসংখ্যার ব্যাপার। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এগুলি জনগোষ্ঠীর প্রতাপের ব্যাপারে দাঁড়াল। যে জনগোষ্ঠী যত বড়, তার রাজনৈতিক ক্ষমতা তত বেশি। আশ্বেডকর বলছেন— হিন্দু, মুসলমান, কি শিখ, কোনও সম্প্রদায় এর থেকে বাদ নয়। শুধু অস্পৃশ্যরা আর খ্রিস্টানরা কিছু করতে পারে না। তারা তো এই আদমশুমারির মধ্যে নেই। যেমন একটি উদাহরণ আশ্বেডকর দিয়েছেন : পাঞ্জাবে শিখরা অস্পৃশ্যদের উপর অনেক উৎপীড়ন করেছিল। তার ফলে ১৯৪১-এর আদমশুমারিতে শিখদের সংখ্যা বেড়েছে, অস্পৃশ্যদের সংখ্যা কমেছে। একিইভাবে, অস্পৃশ্যদের বলা

হল যে, লোকগণনার সময় তাদের জাতি ঘোষণা করতে হবে না। তারা যে হিন্দু এটুকু বললেই চলবে। এর ফলে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ল, অস্পৃশ্যরা কমে গেল। লোকগণনার সংখ্যাগুলিতে সেজন্য আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তবে কিনা, ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায়, আশ্বেদকর বিশ্বাস করেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে অন্তত ছ'কোটি মানুষ অস্পৃশ্য। তাঁর এই বিশ্বাসের কি ভিত্তি, এই পুস্তিকায় সেকথা আলোচনা করেননি।

প্রত্যেক সমাজেই এরকম নীচের তলার মানুষ থাকেন। রোমানরা তাদের সোজাসুজি ক্রীতদাস বলত। তারও আগে স্পার্টানরা এই লোকগুলিকেই 'Helor' বলে গেছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই লোকগুলিকে বলা হয়েছে 'Villain'। মার্কিনদের সমাজে এদের নাম 'Negro', জার্মানদের মধ্যে এরা 'ইহুদি', হিন্দুসমাজে এরাই 'অস্পৃশ্য'। আশ্বেদকর বলেছেন যে ক্রীতদাসপ্রথা উঠে গেছে, সার্বদের দিয়ে বা ভিলেনদের দিয়ে কাজ করানো আর চলে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা রয়েছে। ভেবে দেখলে, এই অস্পৃশ্যদের অবস্থা জার্মান সমাজে ইহুদিদের চেয়ে অনেক বেশি করুণ। ইহুদিদের লোকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু তাদের সমাজে উঠে যাওয়ার বারণ নেই। অস্পৃশ্যরা অবজ্ঞায় থাকে, তাদের ওঠাটাও বারণ। স্বাধীনতা যদি আসে, তাহলে অস্পৃশ্যদের জন্যই আসবে। এরাই তো সত্যকারের স্বাধীনতার প্রয়োজন বোধ করে। হিন্দুরা এবং মুসলমানরা যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সেটা স্বাধীনতারই নয়। তারা মুখে বলছে 'স্বাধীনতা', আসলে তাদের লড়াইটা ক্ষমতা দখলের। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস যাকে বলা হয়, সেই প্রতিষ্ঠানটি মধ্যবিত্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। সেই দলটি চায়, ইংরেজকে সরিয়ে ইংরেজের জায়গায় বসতে। স্বাধীনতার পরে, অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্যই থাকবে। কংগ্রেস এ-সম্পর্কে কিছুই করবে না। সেজন্য আশ্বেদকরের ধারণা যে, ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ইংরেজ ও মার্কিন জনমত ভুল করছে। হিন্দুরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে না। স্বাধীনতা অস্পৃশ্যদের সমস্যা। রাষ্ট্র পরিবর্তন হবে, কিন্তু অস্পৃশ্যরা সেই তিমিরেই থাকবে। যে সমস্ত বিদেশি স্বাধীনতার লড়াইয়ে কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছেন, তাঁরা এই সামান্য তথ্যটুকুও জানেন না।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে, নাগপুরে একটি সভা হ। সেই সভাটির নাম নিখিল ভারত তফশিলি জাতি সম্মেলন। আশ্বেদকর এই সম্মেলনের প্রতিবেদনগুলি খুব মূল্যবান মনে করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের সংবিধান যাই হোক না কেন, সেই সংবিধানে তফশিলি জাতির সম্মতি থাকতে হবে। এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে, তফশিলি জাতিগুলি হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক। তারা ভারতীয় জীবনে আলাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। সংবিধান যা হবে তার মধ্যে যেন তফশিলি জাতিগুলি নিজেদের নিরাপত্তার আশ্বাস খুঁজে পায়। কী করলে এই আশ্বাস পাওয়া যাবে

সেটাও সম্মেলন বলে দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল, প্রত্যেক প্রদেশের সরকার প্রতিটি বছর তফশিলি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে কিছু টাকা সরিয়ে রাখবে। আইনে বলা থাকবে যে, তফশিলি জাতির লোকদের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের আসন নির্দিষ্ট করা হবে। কতগুলি আসন নির্দিষ্ট থাকবে সেটা নির্ভর করবে তফশিলি জাতির সংখ্যা কত এবং তাদের গুরুত্ব কত তার ওপর। একইভাবে, প্রশাসনেও এদের জন্যে আসন নির্দিষ্ট থাকবে। আইনে বলা থাকবে যে, তফশিলি জাতিগুলি সবগুলি আইনসভার সদস্য হবে—কতজন সদস্য হবে সেটা নির্ভর করবে জাতির সংখ্যা এবং গুরুত্বের ওপর। এই যে তারা আইনসভার সদস্য হবে, এগুলি করতে হলে পৃথক নির্বাচনের (separate electorates) ব্যবস্থা করতে হবে।

এর পরে সম্মেলন আরও কঠিন কথায় চলে গেল। ঘোষণা করা হল যে, গ্রামপ্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। অর্থাৎ তফশিলি জাতিগুলি যে গ্রামের প্রান্তে পৃথক পল্লীতে থাকে, এই প্রথা অচল। স্বরাজ আসার পর যাতে করে বর্ণ-হিন্দুরা নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচার করতে না পারে, সেইজন্যে এই অন্ত্যজ পল্লীগুলিকে এক-একটি পৃথক গ্রামে পরিবর্তন করতে হবে। সেই নতুন তফশিলি গ্রামগুলি হিন্দু গ্রাম থেকে দূরে হবে এবং হিন্দু গ্রামের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। যেমন সম্ভব সেই জমিতে এই নতুন তফশিলি গ্রাম গড়ে উঠবে। এছাড়াও, কমিশন নতুন করে জমি কিনতে পারবে না। ভারতের নতুন সংবিধানে এই গ্রামগুলি তৈরি করার জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হবে। সেই কমিশনের হাতে সমস্ত সরকারি জমি দেওয়া হবে। যেমন সম্ভব সেই জমিতে এই নতুন তফশিলি গ্রাম গড়ে উঠবে। এছাড়াও কমিশন নতুন করে জমি কিনতে পারবে। এইজন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনকে বছরে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা দেবে। এ সমস্ত কথাই সংবিধানে লেখা থাকবে। তবেই তফশিলি জাতিগুলি নিশ্চিত হতে পারবে।

আইনসভায় যে সদস্যরা থাকবেন, তাঁরা যে শুধু হিন্দুদের হয়ে কথা বলবেন তাই নয়, তাঁরা অস্পৃশ্যদের হয়েও কথা বলবেন। মন্ত্রিসভা শুধু যে হিন্দুদের কাছেই দায়িত্বশীল হবে তাই না, অস্পৃশ্যদের কাছেও হবে। প্রশাসন শুধু যে দক্ষ হবে তাই নয়, বিশ্বাসযোগ্যও হবে। অস্পৃশ্যদের কাছে প্রশাসনকে যদি এই বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, তাহলে অস্পৃশ্যদের যথেষ্ট সংখ্যায় প্রশাসনে নিতে হবে এবং উঁচু চাকরি দিতে হবে। আশ্বেডকর ভাল করেই জানতেন এসমস্ত দাবি হিন্দুরা কোনওদিন মানবে না। তিনি বলছেন, গান্ধীও এইসব দাবি মানেননি এবং এই দাবিগুলির বিরুদ্ধে উপোস করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্দু গান্ধীকেও হার মানতে হয়। অবশ্য এই দাবিগুলির যথার্থতা গান্ধী স্বীকার করেননি [These political demands of the Untouch-

ables have been the subject matter of great controversy between the Untouchables and the Hindus. Mr. Gandhi⁹, the friend of the Untouchables, preferred to fast unto death rather than consent on them and although he yielded he is not reconciled to the injustice underlying these demands (পুস্তিকা প. ২২)]। হিন্দুদের মতে আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এই এলাকাগুলি হবে নির্বাচনের একমাত্র উপায়। আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা মন্ত্রিসভা গঠন করবে। আমলা তারাই হবে যারা দক্ষ। আমলাতন্ত্র গঠনে অন্য কোনও মাপকাঠি গ্রহণ করা হবে না। কংগ্রেসের হিন্দুরা এই প্রথাকে বলে জাতীয় প্রথা। অস্পৃশ্যদের প্রথাকে তারা বলে সাম্প্রদায়িক প্রথা। স্বেডকর বলছেন যে, যে বস্তু আপনার অপছন্দ তাকে একটা খারাপ নাম দিলেই চলে [It is a case of demanding what you do not like by the easy method of giving it a had and a repelling name, (পুস্তিকা পৃ. ২২-২৩)]। আসল সমস্যাটা হচ্ছে যে, এলাকা অনুযায়ী নির্বাচন হলে আইনসভা সত্যিকারের ভারতীয় সভা হবে কিনা। ভারতবর্ষের সমাজ যেরকম, তাতে করে একই এলাকায় অনেকরকম মানুষ থাকেন। যদি কোনও এলাকা থেকে হিন্দু প্রতিনিধি নেওয়া হয় তবে সেই এলাকার অস্পৃশ্যদের ওপর সুবিচার হবে না। হিন্দুরা এরকম নির্বাচনই চান। তাঁদের নির্বাচন-প্রথায় এই এলাকাগুলিই থাকবে। এতে করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে থাকবে, তারা অস্পৃশ্যদের ওপর যেমন খুশি অত্যাচার করতে পারবে। কাজেই নাম হবে জাতীয় প্রথা, কিন্তু কাজ হবে সাম্প্রদায়িকতা।

হিন্দুরা, অর্থাৎ কংগ্রেস এলাকা অনুযায়ী নির্বাচন করবে। তারা অস্পৃশ্যদের জন্য বিশেষ কয়েকটি আসন রাখবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু পৃথক নির্বাচন (separate electorate) হবে না। হিন্দুদের মতে, পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে জাতি খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। স্বেডকর বলছেন, ভারতবাসী বলে কোনও জাতিই নেই, কাজেই খণ্ড খণ্ড হবার কথাই উঠতে পারে না। ভারতবাসী বলে একটা জাতি তৈরী হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সমপ্রদায় নিয়েই সে জাতি তৈরী হবে। একটি সমপ্রদায়কে ধ্বংস করে যদি জাতি তৈরীর চেষ্টা হয়, তাহলে জাতির মঙ্গল হবে না। কাজেই নির্বাচন যদি বাস্তব রাখতে হয়, তাহলে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা রাখতে হবে। হিন্দুরা এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না (মেনে রাখবেন, সালটা ১৯৪৩)। অস্পৃশ্যদের জন্য নির্বাচন হবে, অথচ অস্পৃশ্যদের কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এজন্য এলাকাগুলি থাকা দরকার। নির্বাচনী এলাকাগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যা অস্পৃশ্যদের চাইতে অনেক বেশি। কাজেই, ছতগুলি সংরক্ষিত আসনই থাক না কেন, সেই আসনগুলিতে

তারা কেমন করে পরীক্ষা দেবে? এই যখন অবস্থা, ‘তখন যোগ্যতা থাকলে আমলা হবে’, এই কথাটার কোনও মানে হয় না। অস্পৃশ্যরা অবশ্য একথা বলে না যে, অযোগ্য লোককে আমলা করতে হবে। তারা একথাই বলছে যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হবে, নচেৎ আমলা হওয়া চলবে না। কিন্তু এই ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার পরে উচ্চশিক্ষার কথা আর উঠবে না। আমলাতন্ত্রে অস্পৃশ্যদের অধিকার এই ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকার। এ না ঘটলে সুবিচার হবে না। মাঝখান থেকে ‘যোগ্যতা’ এবং ‘উচ্চশিক্ষা’ এই কথাগুলো উঠে আলোচনা ভুল দিকে নিয়ে যায়।

এই কথা বলার পর আশ্বেদকর আবার গ্রামসমাজের কথায় ফিরে গেলেন। তিনি বলছেন যে, হিন্দুদের হাত থেকে অস্পৃশ্যদের বাঁচাতে গেলে আইনসভা, মন্ত্রিসভা বা আমলাতন্ত্র যথেষ্ট নয়। অস্পৃশ্যদের জন্য নতুন গ্রামও তৈরি করতে হবে। অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্য, কারণ তারা হিন্দু গ্রামের খুব কাছে থাকে। এদের হিন্দুদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে অস্পৃশ্যতা থাকবে। ভারতবর্ষ তো গ্রামেরই রাজত্ব। কাজেই গ্রামের অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিরাজ করে। কিন্তু নতুন গ্রাম যেগুলি হবে সেগুলিতে কে অস্পৃশ্য আর কে স্পৃশ্য এরকম কোনও ভেদাভেদ থাকবে না।

দ্বিতীয় একটা কথাও এই নতুন গ্রামগুলির ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত। এখন অস্পৃশ্যরা যেভাবে অন্ত্যজ পল্লীতে থাকে, তাতে করে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে হিন্দুদের কবলে পড়ে। তাদের তো জমি নেই, তারা তো ভূমিহীন কৃষক। হিন্দুরা যে কাজ দেয়, যে মজুরি দেয়, সবই তো অন্ত্যজদের মেনে নিতে হয়। কোনও স্বাধীন জীবিকা নির্বাহ করাও অস্পৃশ্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি সামান্য ফেরিওয়ালা হবেন, কিন্তু লোকে আপনাকে না ছুঁলে কী ফেরি করবেন? মুসলমান ফেরিওয়ালা হতে পারে, কিন্তু অস্পৃশ্য হতে পারে না। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে আছে বলেই তারা অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পায়। দারোগা বা হাকিম তো তাদেরই লোক, কাজেই হিন্দুদের সঙ্গে ঝগড়া হলে, অস্পৃশ্যদের সুবিচার পাওয়ার আশা নেই। অধিকার দাবি করলে কটর হিন্দুরা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও তাদের হাতে সমাজঠেলানামে এক অস্ত্র আছে। অস্পৃশ্যরা তো দিন আনে দিন খায়। সমাজঠেলা হলে তো তারা কোনওদিকেই যেতে পারবে না। এই যখন অবস্থা, তখন নিজেদের অধিকার দাবি না করাই ভাল। হিন্দুদের ধারণা যে ঈশ্বর উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণকে এক করেছেন। হিন্দুধর্মেই তার প্রমাণ রয়েছে। আশ্বেদকর বলছেন, এই ধারণা ভুল। অস্পৃশ্যরা নতুন গ্রাম তৈরি করে প্রমাণ করে দেবে যে বন্ধন ভাঙা যায়। অস্পৃশ্যদের দাবি হয়তো কাজে আসবে না, কিন্তু গ্রামসমাজকে নতুন করে সাজানোর দাবি তারা ছাড়বে না। এর জন্য অনেক সময় লাগবে, অনেক টাকা খরচ হবে। বলা

বাছল্য, টাকা তো দেবে হিন্দু সমাজ। অস্পৃশ্যদের যেভাবে রাখা হয়েছে তাদের তো কোনও বিত্ত নেই। সময়কেও তারা পরোয়া করে না। হাজার হাজার বছর তো এমনি করেই কেটেছে, না হয় আর কয়েকটা বছর কাটল।

এখন— উঠতে পারে যে, অস্পৃশ্যদের এইসব আপত্তি সংবিধানে ঢোকানোর কী হল? পৃথিবীর কোনও দেশই তো তাদের সংবিধানে এরকম কথা ওঠায়নি। কথাটা ঠিক। কিন্তু এটা ভেবে দেখা দরকার যে, ভারতবর্ষের যে সমাজ, তাতে ভারতবর্ষের সংবিধান এইসব কথা বলতে বাধ্য। হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা না উঠে গেলে সামাজিক সুবিচার আসবে না। এর ব্যবস্থা তো ভারতবাসীদের সংবিধানেরই করতে হবে। হিন্দুধর্ম এবং জাতিভেদ—এখা অভিন্ন। এর সঙ্গে ইংল্যান্ডের মত দেশে যে শ্রেণীবিভাগ চলিত আছে, তার কোনও সম্পর্ক নেই। জাতি—এখায় একটা নিঃসঙ্গতা তৈরি করে। সেই নিঃসঙ্গতা ভেঙে দিয়ে মানুষের মধ্যে মিলবার সুযোগ করে দিতে হবে। ভারতবাসীর সংবিধানই এই কাজ করবে। তবেই অস্পৃশ্যরা নিশ্চিৎ হতে পারবে।

অন্য আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে ভাবা দরকার। রাজনৈতিক রক্ষাকবচ শুধু তো অস্পৃশ্যরাই চাইছে না। মুসলমানেরা এবং শিখেরা জোর রকমই চাইছে। তুলনায় অস্পৃশ্যরা তো খুবই কম চাইছে। হিন্দুদের সৌভাগ্য যে, হিন্দুরা ক্ষমতা দখল করলেও অস্পৃশ্যদের আপত্তি নেই। শুধু সংবিধানে তারা কিছু রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে। অস্পৃশ্যদের দাবির কথা উঠলেই হিন্দুরা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। এর অবশ্য কারণ একটাই। সামাজিক সুবিচার তো হিন্দুদের লক্ষ্য নয়। জোর যার মূলুক তার, এই নীতিই এখানে অনুসৃত হচ্ছে। অস্পৃশ্যরা অসহায়, তাতে গায়ে জোর নেই। কাজেই হিন্দুদের কাছে সুবিচার পাবে বলে আশা করা যায় না।

এই তো গেল পুস্তিকাটির কথা। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখ করে রাখা ভাল। আশ্বেড়কর এই সময়ে যা লিখেছিলেন, সব লেখাতেই বিদেশীদের কথা আছে। মোটামুটি বিদেশী বলতে আমরা বুঝি মার্কিন দেশের লোক। তখনকার দিনে, অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশকে এর মধ্যে ইংরেজরাও আসতেন—হয়তো বেশ বড় আকারেই আসতেন। মোটামুটি ব্যাপার এই যে, যে বিদেশীরা ইংরেজি বলেন, তাঁরাই প্রকৃত বিদেশী। অন্য ভাষা বললে বড়ই অসুবিধা হয়। এখন, এইসব বিদেশীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা কংগ্রেসের গুণগ্রাহী। অথচ তাঁরা কংগ্রেসের কিছুই জানেন না। কংগ্রেস যে মধ্যবিত্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠান সেকথাও বোঝেন না। হিন্দুরা যে স্বরাজ পেলেই অস্পৃশ্যদের ওপর অত্যাচার করবে, সে খেয়ালও নেই। তাঁরা মনে করেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধে সব ভারতবাসীরই যোগ

দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এগুলি কংগ্রেসেরই প্রচার। আশ্বেদকরের এই সময়কার লেখায়, যাতে বিদেশীদের মন সত্যের পথে চলে, সে ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়।

এই সময় তিনি আর একটি বই লিখেছিলেন, সেটি সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। বইটির নাম What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables. ওবইটি ছাপা হয় ১৯৪৫ সালে। ছোট একটি পুস্তিকা লোখাই আশ্বেদকরের উদ্দেশ্য ছিল। আপনারা অবগত আছেন যে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসনের নতুন আইন হয়। সেই আইনের বিধি অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে নির্বাচনও হয়। কংগ্রে এই নির্বাচনে জয়ী হয় বলেই আমরা শুনেছি। বিদেশীদেরও এই কথা বলা হয়েছে, অন্তত কংগ্রেস প্রচারে। প্রচারের ভিত্তি এই যে, তফশিলিদের জন্য নির্ধারিত ১৫১টি আসনের মধ্যে ১২টি ছাড়া সবগুলিই কংগ্রেস জিতেছিল। কিন্তু আশ্বেদকরের এই পুস্তিকা এই প্রচার সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চেয়েছে। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জয় হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে, এই নির্বাচনে অস্পৃশ্যরাই জিতেছে, কংগ্রেস হেরেছে। এই কথা আশ্বেদকর অনেক যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন (যার ইচ্ছা বইটির মুখবন্ধে পড়ে দেখতে পারেন)। বিদেশীদের হাতে এই বক্তব্য পৌঁছে দেওয়াই আশ্বেদকরের উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্যই পুস্তিকাটি লেখা। কিন্তু পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়নি। এই পুস্তিকা বেড়ে গিয়ে বই হয়। তার ফলে সময় কিছুটা বেশি লাগল, বই ১৯৪৫ সালের অত্যাগে বেরলো না। কিন্তু বইয়ে অনেক কথা বলা গেল যা ছোট আকারের পুস্তিকায় বলা যেত না। বলা বাহুল্য, এই সহময় আশ্বেদকরের বক্তব্য যা, প্রথম পুস্তিকাটিতেই সেই কথা বলা হয়েছে। আশ্বেদকর যত ইচ্ছা বই লিখতে পারেন, কিন্তু বক্তব্য পাল্টায় না। সেজন্য তাঁর লেখা তুলে ধরতে চেষ্টা করলে কিছুটা পুনরাবৃত্তির ঝোঁক থাকে। তবে কিনা বই লিখলে কিছু কথা বলা যায় সেগুলি নতুন। অনেক কথা আবার বিশদভাবে বলা চলে। আশ্বেদকরের বক্তব্য বলতে গিয়ে কোন কথাটা নতুন, কোন কথাটা বিশদ, একটু খেয়াল করতে হয়। তিনি তো সময়ের স্রোতে, সংগ্রামের মধ্যে লিখে চলেছেন। কোন বক্তব্য আগে যাবে, কোনটা পরে আসবে, সবসময় ঠিক থাকে না। সেসব মেনে নিয়েও, এই বইটি আশ্বেদকরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে হয়।

বইটির কতগুলি পরিচ্ছেদ এড়িয়ে গিয়ে অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা আগে বলছি। আশ্বেদকর এই পরিচ্ছেদটির নাম দেন, 'The Real Issue: What the Untouchables Want'। এই পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন যে, কংগ্রেস এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে সত্যকারের সমস্যা একটাই : ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে অস্পৃশ্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় কি না। অস্পৃশ্যদের যদি হিন্দুসমাজের অংশ বলে মনে করা যায়,

তাহলে এই সমস্যা থাকে না। আবার, হিন্দুরা একদিকে, অস্পৃশ্যরা অন্যদিকে এই কথা মেনে নিলেও সমস্যা থাকে না। কংগ্রেস বলছে অস্পৃশ্যরা হিন্দু। আশ্বেডকর বলছেন, অস্পৃশ্যরা পৃথক। সেইজন্যেই এই মূলের সমস্যাটি রয়েছে। অস্পৃশ্যদের রক্ষাকবচের কথা এই থেকে ওঠে। কবচ কী দরকার? পার্থক্য মেনে নিলে তবেই কবচের কথা ওঠে। আশ্বেডকর এই বইটিতে প্রমাণ করতে চান, পার্থক্যটা মূলের; এবং এর থেকেই যা কিছু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে।

ইংরেজ সরকারের নীতি এ সম্পর্কে পরিষ্কার। বড়লাট লিনলিথগো বলেছেন যে, অস্পৃশ্যরা ভারতের জাতীয় জীবনে পৃথক। সেইজন্য এই বিষয় আশ্বেডকর কোনও আলোচনার প্রয়োজন দেখেননি। তাঁর শত্রু কংগ্রেস। বইয়ের বক্তব্য ঘুরে ফিরে সেই বিষয়ে এসেছে পার্থক্য মেনে নেওয়ার ফলেই মুসলমান-খ্রিস্টান-ইউরোপীয়ান এবং শিখদের সংবিধান অনুযায়ী রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। কংগ্রেস এ কথা ভাল করেই জানে। সেইজন্য কংগ্রেস কিছুতেই স্বীকার করবে না যে অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক। অবশ্য, অস্পৃশ্যরা হিন্দু, এই কথা বলার পক্ষে যে যুক্তি নেই তা নয়। হিন্দুদের দেব-দেবী, এবং অস্পৃশ্যদের দেব-দেবী এক। শিবের ভক্ত, বিষ্ণুর ভক্ত, রামের ভক্ত কি দুর্গার ভক্ত, অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রচুর আছেন। কিন্তু স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যরা দোল-দুর্গোৎসবে একত্র আনন্দ করছে এমন দেখা যায় না। কংগ্রেস কিছু অস্পৃশ্যদের ভাড়া করে রেখেছে। তারা এই দেব-দেবীদের ব্যাপারে খুব কটুর। এদের উপর নির্ভর করেই এই ভাড়া করা অস্পৃশ্যরা বলতে পারে, তারা হিন্দু। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার কথা যদি ওঠে, এবং অস্পৃশ্যতার সমস্যা উল্লেখ করা হয়, তাহলে এরাও বলবে এরা হিন্দু নয়। এই যে কিছু লোককে ঠেলে রেখে তাদের অচ্ছুৎ বানানো হয়েছে, এর ফলেই পার্থক্যটা তৈরি হয়েছে।

আশ্বেডকর অবশ্য তর্কের খাতিরে স্বীকার করতে রাজি আছেন যে, অস্পৃশ্যরাও হিন্দু। কিন্তু সেজন্য কেন ভারতীয় সংবিধানে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা হবে না? বুঝলাম এদের ধর্মটা এক। কিন্তু সেজন্য জনগোষ্ঠী এক নাও হতে পারে। তাই যদি হত তাহলে ইউরোপে ফরাসি আর জার্মানদের পার্থক্য থাকত না। ইউরোপে সবই তো খ্রিস্টান, তাহলে অতগুলি রাষ্ট্র কেন? কংগ্রেস এই বিষয়ে ধর্মের ওপর জোর দিয়ে ভুল করে। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় শিখদের আর হিন্দুদের কথা। ধর্মে এরা পৃথক কিন্তু সমাজে তো এরা এক। কিন্তু অস্পৃশ্যদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। সামাজিক পার্থক্য রক্ষা করাই হিন্দু ধর্মের মূল কথা। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা এর থেকেই উঠেছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা আপনি উঠিয়ে দিতে পারেন,

তারপরেও আপনি হিন্দু থাকবেন। হিন্দু যদি থাকতে চান, তাহলে সামাজিক পার্থক্যটা মেনে নিতেই হবে। হিন্দুধর্মই হিন্দুর সমাজে পার্থক্য জাগিয়ে রাখে (*Hinduism is the greatst obstacle to Hindu Unity*, পৃ. ১৮৭)। অস্পৃশ্যরা যদি হিন্দু হয়, তাহলে তারা যে হিন্দু সমাজের কেউ নয়, একথা অস্বীকার করা চলে না।

হিন্দুসমাজকে পান্টানো সংস্কারের কাজ নয়। কংগ্রেস এই কথার সবচেয়েবড় প্রমাণ। সমাজ-সংস্কার করার জন্য অনেক ভারতবাসীই ঝুঁকিয়েছিলেন। কংগ্রেসে গোড়ার দিকে সমাজ-সংস্কারের কথাটা উঠেছিল এবং ভালভাবেই উঠেছিল। দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেসের হিন্দুরা এতে বাধা দেয়। কংগ্রেসের বক্তব্য এ সম্পর্কে পরিষ্কার: রাজনীতি প্রথম এবং রাজনীতিই শেষ। সমাজ-সংস্কারটা বোধহয় স্বরাজের পরে হবে। অর্থাৎ হবে না। সমাজ-সংস্কারের একটি সভা প্রথমদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে হত। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর পর সেই প্যাভিলেই এই সভার অধিবেশন বসত। কংগ্রেসের অনেক লোক এই সভায় থাকতেন। কিন্তু কংগ্রেসি হিন্দুরা এতে আপত্তি করে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস হয়ে যাওয়া পর প্যাভিলেটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সমাজ-সংস্কারের কথা ওই সঙ্গেই ভস্মীভূত হয়েছিল। কংগ্রেস যা ছিল তাই রইল। রাজনীতি ছাড়া কংগ্রেসে অন্য কিছু আলোচনা হয়না। হিন্দু সমাজও যা ছিল তাই রইল। এই সমাজে পরিবর্তন হয় না। এখন, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে, যদি কংগ্রেস বলে অস্পৃশ্যদের সমস্যাটা সামাজিক, কংগ্রেস সমাজ-সংস্কার করলে এই সমস্যা থাকবে না, তাহলে কিন্তু ভণ্ডামি হয়।

কংগ্রেস বলছে যে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে অস্পৃশ্যরা চিরকাল অস্পৃশ্যই থাকবে। হিন্দু সমাজে কোনওদিনই তারা অন্যদের সঙ্গে একত্র হতে পারবে না। কিন্তু সকলেই যদি একসঙ্গে ভোট দেয়, তাহলে এই সমস্যা হয় না। যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে গ্রাহ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু অস্পৃশ্যদের সমস্যা যদি সমাজ-সংস্কারের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে রাজনীতিতে তাদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে সমাজ-সংস্কার কেন বন্ধ থাকবে? নির্বাচন তো হয় পাঁচ বছরে একবার। এই একটা দিনে সকলে একসঙ্গে ভোট দিলে সমাজ এক হবে, পৃথকভাবে ভোট দিলে সমাজ পৃথক হবে এই কথা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। যদি একের বাড়িতে অন্যের খাওয়া নিয়ে সমস্যা হয়, যদি হিন্দুর ছেলে অস্পৃশ্যদের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়, ওই একদিনের ভোটেই কি সেই সমস্যার সৃষ্টি হবে? আশ্বেদকর অবশ্য এর চাইতে বেশ কড়াভাবেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘নেহাত বুদ্ধ না হলে একথা কেউ বলে না’ (Only a congenital idiot will say that they can)।

অন্য একটি যুক্তিও এই সম্পর্কে দেওয়া হয়। অস্পৃশ্যদের সমস্যা উঠে যাচ্ছে। এই নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। এর উত্তর হচ্ছে : অস্পৃশ্যতার সমস্যা উঠে গেলে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার থাকবে না। কিন্তু উঠে যেতে পারে, এই সম্ভাবনায় যদি মাথা না ঘামে, তাহলে অসুবিধে আছে। এমন কথাও শোনা যায় যে, হিন্দু ধর্ম যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই ধর্মের স্বভাবটা এমন যে সমস্যার সমাধান করে করে ধর্মটি তৈরি হয়েছে। কাজেই অস্পৃশ্যতার সমাধান হিন্দু ধর্ম একদিন করবেই। সেইজন্য মনে হয়, এ নিয়ে আপাতত হিন্দুদের মাথা ঘামোনো কোনও দরকার নেই। আশ্বেডকর বলছেন, হিন্দুধর্ম সমস্যার সমাধান করে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয় পেলে করে আর লাভের অশায় করে। অস্পৃশ্যদের কাছে ভয়ও নেই লাভও নেই। তারা গায়ের জোরও দেখাবে না, টাকাও তাদের নেই। উন্টোটাঁই মনে হয় সত্যি। অস্পৃশ্যরা থাকলেই হিন্দুদের বেশ সুবিধে হয়। ছ'কোটি গোলাম থাকলে সমাজের অনেক কাজ করতে হয় না। এইসব ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য সমাজ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। হিন্দুদের যদি কোনও বিবেক থাকে, তাহলে অস্পৃশ্যদের তারা ছেড়ে দেবে। কিন্তু শুধু বিবেকে কাজ হবে বলে মনে হয় না। অস্পৃশ্যদের অন্ত্যজ-পল্লীতে রাখতে পারলে যদি অর্থনৈতিক সুবিধে হয়, তাহলে বিবেক তোলা থাকবে। ইতিহাসের শিক্ষা এরকম (অন্তত আশ্বেডকর সেই কথাই মনে করেন) যে, অর্থনীতির সঙ্গ নীতিগ্ঞানের সংঘর্ষ ঘটলে অর্থনীতির জয় হয়। আসলে, জোর না থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। স্বরাজ এলে হিন্দুদের জোর বাড়বে, অস্পৃশ্যদের জোর কমবে। তখন এই সমস্যা আরও উৎকট হবে।

এই তো গেল আশ্বেডকরের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য। এই বইয়ে কিন্তু অনেক বেশি আছে গান্ধীর সম্পর্কে বক্তব্য। সে বক্তব্য বইয়ের সবদিকেই ছড়িয়ে আছে, আলাদা করা কঠিন। বক্তব্য বেশ জটিল একথাও ঠিক। মোটামুটি বলা চলে, আশ্বেডকরের গান্ধীর সম্পর্কে বক্তব্যের তিনটে ভাগ আছে। এক হচ্ছে তাৎক্ষণিকের বক্তব্য। যেমন, মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় কোন মন্ত্রীকে নেওয়া হবে। এই বক্তব্য এখন আর কেউ শুনতে চায় বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, গান্ধী মানুষটি সম্পর্কে আশ্বেডকরের মতামত পরিষ্কার বলা আছে। ভাষা বেশ জোরালো, কিন্তু কোথায় যেন নিন্দামন্দের মধ্যেও একটা অভিমানের সুর বাজে। তৃতীয়ত, গান্ধীবাদ সম্পর্কে আশ্বেডকরের মন্তব্য আছে। গান্ধীবাদ যে পাগলের প্রলাপ, এ সম্পর্কে আশ্বেডকরের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। এটা কেন হল যে, গান্ধী ও আশ্বেডকর দুজনেই সমাজে সুবিচার চাইলেন, কিন্তু মতে একেবারেই মিলল না। এই নিবন্ধে আশ্বেডকরের কথাতেই সেই পার্থক্যটা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি।

মনে কিন্তু হয় যে, এসব কথা বলার আগে, আশ্বেদকরের আশাহত অইভমানটা ভেবে দেখা দরকার। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভারতবর্ষ গান্ধীর কথায় চলে। গান্ধীর আর কোনও কাজ নেই, অস্পৃশ্যতা নিবারণ করলেই চলবে। ভারতবাসী গান্ধীর নির্দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্পৃশ্যতাটা হটিয়ে দেবে। ইংরেজও ভারতবর্ষ ছেড়ে আস্তে আস্তে চলে যাবে। ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ বিষয়ে আশ্বেদকরের কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান্ধী অস্পৃশ্যদের সমস্যা আসলে কানে তুললেন না। তিনি শুধু বক্তৃতা দিলেন। অর্থাৎ, তাঁর প্রার্থনাসভার পরে রোজ কিছুম্ফণ করে বললেন। লোকে কিছুই শুনল না, কিছুই মানল না। এ ব্যবস্থায় গান্ধী কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে পারতেন না? সত্যাগ্রহ তিনি শুধু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে করছেন, হিন্দুদের বিরুদ্ধে করছেন না, আশ্বেদকরের মতে এটা ঘোর অন্যায়। এরকমই আর একটি অন্যায় হচ্ছে অস্পৃশ্যদের জন্য গান্ধীর উপোস না করা। তিনি তো ইচ্ছে করলেই এরকম উপোস করতে পারতেন, কোনওদিন করেননি। হিন্দুদের তোষণ করেই তাঁর জীবন কেটেছে। অস্পৃশ্যদের কথা তিনি ভাবেন নি। এই হল আশ্বেদকরের অভিমান।

কিন্তু গান্ধী যে একবার অস্পৃশ্যদের সম্পর্কেই উপোস করেছিলেন সে কথা আশ্বেদকরের চাইতে ভাল কে জানে? এই উপোসের ফলেই র্যাম্‌জে ম্যাকডোনা - এর Communal Award সাম্প্রদায়িকতার পুরস্কার! কিছুটা পায়ে যায়। Puna Pact হয়। এরপর গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। আশ্বেদকর বলেছেন, Puna Pact আসলে গান্ধীর পশ্চাদপসরণ। তিনি অস্পৃশ্যদের শত্রু। কিন্তু এই চুক্তির ফলে অস্পৃশ্যদের অনেক বন্ধু ব্যক্তি তিনি মানছেন। বাধ্য হয়েছেন বলেই মানছেন। অসলে ঘটনাটা এরকম যে, আশ্বেদকর দয়া করে গান্ধীর জীবন রক্ষা করেছেন। র্যাম্‌জে ম্যাকডোনা ও পিছু হটবেন না, অস্পৃশ্যরাও পেছোবেন না, এই অবস্থায় গান্ধীবাহিনী সাহস উবে গেল। কী করে এগিয়ে যাওয়া যায় এ ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক আশ্বেদকর দেখলেন। তাই শেষ পর্যন্ত আশ্বেদকর পুনা চুক্তিতে সই করলেন, গান্ধীর জীবন রক্ষা হল, কিন্তু অস্পৃশ্যদের সমস্যা ঘুচল না।

গান্ধী মানুষটি মোটেই সুবিধার নন। তাঁর মতো পিচ্ছিল কু-তार्কিক খুব কম আছেন। আবার জয়ের মুখে দণ্ডটাও আছে। আশ্বেদকর এর প্রমাণ পেয়েছিলেন গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে। প্রথম অধিবেশন বেশ ভালই হয়েছিল। আশ্বেদকর মনে করেছিলেন যে, প্রথম অধিবেশনের প্রগতি দ্বিতীয় অধিবেশনেও বজায় থাকবে। কিন্তু কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে এসে গান্ধী সব নষ্ট করলেন। প্রতিনিধি হওয়ার কোনও যোগ্যতাই তাঁর ছিল না, সভা পণ্ড করার যোগ্যতা ছিল। বড়লাট লর্ড অরউইনের সঙ্গে তিনি চুক্তি করে এসেছেন সেই অহংকারে লন্ডনে

এসেই গোলটেবিল বৈঠকের অন্যান্য সদস্যদের অপমান করতে শুরু করলেন। এই ব্যাপারে তাঁর মোটামুটি বক্তব্য হল যে, এঁরা কারও প্রতিনিধি নয়। ইংরেজ সরকার এদের এনেছে তাই এরা আছে (আম্বেডকরের মতো লোকের সম্পর্কেও নিশ্চয় গান্ধী এইরকম কথা বলেছিলেন, কিন্তু আম্বেডকরের বইতে সেরকম কোন কথা নেই)। বলা বাহুল্য, এইরকম কথা বলার ফলে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যরা খুব রাগ করেন। গান্ধী অবশ্য আম্বেডকরের বক্তব্য সম্পর্কে একটি নিদারুণ কথা এই বৈঠকেই বললেন। গান্ধী বলেছিলেন যে, অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের সমাজ থেকে পৃথক নয়। অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের কলঙ্ক। এর প্রতিকার কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দুসমাজ করবে। ইংরেজ সরকার যদি এই সুযোগে অস্পৃশ্যদের পৃথক ব্যবস্থা করেন, তাহলে গান্ধী নিজের জীবন দিয়ে সেই অভিসন্ধি বানচাল কবেন। আম্বেডকর এইসব কথা শুনেছিলেন। মোটেও খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

তিনি ভাবছিলেন যে, অস্পৃশ্যতার সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস কিছুই করবে না। গান্ধী নিজে এর জন্য ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন। সেই ভিখারিকে হিন্দুসমাজ আট লাখ টাকা দেয়। বলা বাহুল্য, এই সামান্য টাকায় অস্পৃশ্যতার কিছুই সমাধান হয় না। কিন্তু হিন্দু সমাজ স্বরাজের জন্য কোটি টাকার উপরে উঠলেও অস্পৃশ্যদের জন্য আট লাখের বেশি দেবে না। গান্ধী ভাবলেন যে, মন্দিরে ঢোকানোর অধিকার এনে দিলে অস্পৃশ্যতার সমাধান হবে। হত কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচুর মন্দির রইল, যেগুলি অস্পৃশ্যদের জন্য খোলা রইল না। কতকগুলি সাধারণ সামাজিক অধিকার অস্পৃশ্যদের কোনওদিনই এল না। যেমন, গ্রামের পথ ধরে সকলের সঙ্গে যাবার অধিকার অস্পৃশ্যরা পেল না। গ্রামের কুয়োগুলির জল তুলবার অধিকার অস্পৃশ্যদের হল না। গ্রামের পাঠশালায় অন্য ছেলেমেয়েদের পাশে বসার অধিকার অস্পৃশ্যদের ছেলেমেয়েদের এল না। আম্বেডকর বলছেন, পার্থক্যটা এইখানে। গান্ধীবাদে পার্থক্যটা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা আছে, সমাধান করার চেষ্টা নেই।

মনে হয় গান্ধী এবং আম্বেডকরের মধ্যে পার্থক্যটা এইখানে। লক্ষ্য করবেন যে আম্বেডকরের লেখায়, ঈশ্বর সত্য অহিংসা এসব কোনও কথাই নেই। গান্ধীর লেখায় এই কথাগুলি এড়িয়ে চলা দুঃসাধ্য। গান্ধী মনে করেন, মানুষ যদি মনে মনে হিংস্র থাকে, তাহলে নিয়ম করে কোনও লাভ হয় না। ঈশ্বরের দিকে মানুষের মন ফেরাতে না পারলে ব্যবহার আরও খারাপ হবে। আম্বেডকরের বিশ্বাস যে, সংবিধান অনুযায়ী কাজ করলে ব্যবহার খারাপ হতে পারে না। এই পার্থক্যের লড়াইটা এখনো চলছে।

গান্ধী গ্রাম বড়ই ভালবাসতেন। গ্রামে তিনি প্রচুর ঘুরেছেন, গ্রামে থেকেছেন, এবং গ্রামেই ভারতবর্ষের মুক্তি এই কথা বিশ্বাস করতেন। আম্বেডকরও গ্রামের উপর খুব

জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে, অস্পৃশ্যতার সূচনা গ্রাম থেকেই হয়। গ্রাম ভারতবর্ষের প্রাণ একথা আশ্বেদকরও জানেন। কিন্তু তিনি গ্রামকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলে গ্রামের সমস্যার সমাধান হবে না। গ্রামের চেহারা যদি পালটে না ফেলা যায়, তাহলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।

গ্রামের গুরুত্বের উপরে গান্ধী এবং আশ্বেদকর দুজনেই জোর দিয়েছেন। জোরটা হয়তো দুদিকে, কিন্তু জোরটা যে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুজনেই আবার ধর্মে খুব বিশ্বাস করতেন। গান্ধী তো ধার্মিক মানুষ, আশ্বেদকরও মনে করেন, ধর্ম পাল্টালে সমাজ পাল্টাবে। জাতিভেদ প্রথা যে অস্পৃশ্যতার মূলে আছে, এ বিষয়ে আশ্বেদকর কখনো সন্দেহ করেন নি। আপনি জাতি-প্রথা না বলে বর্ণ-প্রথা বলতে পারেন, জিনিসটা একই থাকে। আবার হিন্দুধর্ম মানেই এই জাতিপ্রথা। কাজেই, অস্পৃশ্যদের যদি হিন্দুর সমাজ থেকে বার করে নিতে হয়, তাহলে অন্য কোনও একটা ধর্মের আশ্রয় নেওয়াই ভাল। অবশ্য সমাজের লোকগুলো যা শয়তান, মন হয় মেথর মেথরই থাকবে। সে যে ধর্ম পালটে নিয়েছে, বোঝা যাবে না। এই শয়তানির কোনও সমাধান ভারতবাসী আজ অবধি করতে পারেনি। কিন্তু আশ্বেদকর বিশ্বাস করে গেছেন আইন করলে এ সমস্যার সমাধান হয়। আইন যদি কোনও গ্রামে না পৌঁছয়, কিংবা আইন যদি কোনও এলাকার লোকে না মানে তাহলে কী হয়, সে কথা আজ পর্যন্ত অস্পষ্ট।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের একটি বই আছে — ‘বাংলার নবজাগৃতি’। লিখেছিলেন ১৯৪৮ সাল নাগাদ। বাংলার নবজাগরণ নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভরা এর প্রতিটি অধ্যায়। বাইশ বছর পরে ১৯৭০-এ তাতে একটি অধ্যায় জুড়ে দেন— ‘বাংলার নবজাগরণ: সমীক্ষা ও সমালোচনা’। তিরিশ বছর পরে ১৯৭৯-তে এর আরেকটি অধ্যায় জুড়ে নাম দেন— ‘বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা’। অধ্যায়ের নামগুলো বলে দেয় তাঁর ভাবপথের ঠিকানা। বৌদ্ধিক সততার এমন উজ্জ্বল নিদর্শন একটি বিরল ঘটনা। গ্রন্থটি যখন প্রথম লেখেন তখনো তিনি মার্ক্সবাদী। যখন নিজের মত পাল্টে ভারত নিয়ে খোদ মার্ক্সের রচনাগুলোকেই কাঠগড়াতে দাঁড় করান তখন তিনি আসলে বিশুদ্ধতর মার্ক্সবাদী। গোঁড়া মার্ক্সবাদ বিরোধীদের এই প্রত্যয়ের অর্থ বোঝানো কঠিন। আমরা তা বোঝাতেও যাব না, শুধু বিপর্যয়টা ঘটে কেন, এই নিয়ে আমাদের নিজেদের কথা বলবার চাইতে তাঁর মন্তব্যের বালক কিছু তুলে দেওয়া মনে হয় না অপ্রাসঙ্গিক হবে। “...ইউরোপীয় রেনেসাঁসে’র মডেলটি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের দেশে নির্বিচারে যাঁরা প্রয়োগ করতে অত্যাশাহী হয়েছেন তাঁরা একজাতের অভিজাত কলেজে হয়তো শিক্ষালাভ করেছেন (যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ), পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অন্য সকলকে দাবিয়ে টপকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, অতএব ‘ইতিহাস’ অভিন্ন এবং তাঁর মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যানও অদ্রান্ত। এইটাই বিভ্রান্তিকর ট্রাজেডি। অর্থাৎ এই মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই নবজাগৃতির প্রত্যয়ের নিমিত্তকারণ। অবশ্য এই ট্রাজেডির মূলে আরও একটি বড় কারণ আছে এবং সেটা হল ‘ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল’ সম্বন্ধে কার্লমার্ক্সের উক্তিগুলি।” মার্ক্সের উক্তিগুলির উপরে নির্ভর করেই তিন দশক আগে যে বইটি লিখেছিলেন, সেগুলো খণ্ডন করেই তিন দশক পরে শেষ দুটি অধ্যায় লেখেন তিনি। যে মূল বিষয়টি বিনয় ঘোষকে নিজের পূর্বমত এবং মার্ক্সের মতকে পুনর্বিচারে বাধ্য করেছিল সে ভারতের ‘জাতবর্ণ ব্যবস্থা’।

যে গুটিকয় মার্ক্সবাদী সত্তর দশক থেকে ব্যবস্থাটিকে উপরিকাঠামোর বদলে যুগপৎ কাঠামো-পরিকাঠামোর বিষয় বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন বিনয় ঘোষ তাদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন, “পুঁথিপুস্তকগত

বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃত সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পার্থক্য দেখে আমরা পদে পদে অবাক হয়ে যাই। তথাপি পুঁথিগত বাস্তবতার লেজ ধরে, গরুর লেজ ধরে অন্ধের নগর দেখার মত, আমরা এগিয়ে চলি, সামাজিক পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি, প্রকৃত জীবন সত্য ও সমাজ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাই। আমরা চোখ মেলে দেখি না, মন খুলে চাই না যে সামাজিক চিন্তাভাবনা, সামাজিক ব্যবহার, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, সবকিছুরই বিভিন্ন স্তর (levels) আছে, বিভিন্ন গড়ন (structure) আছে এবং অনেক সময় এক-একটি স্তরে, একই গড়নের চৌহদ্দির মধ্যে এগুলি বেশ স্থায়ীভাবে বিরাজ করে, পরিবর্তনের কোনো ডেউ-এর আঘাতে বিচলিত হয় না। যেমন, আমাদের দেশের জাতিবর্ণভেদ ব্যবস্থা। শতশত শতাব্দীর নির্মম কশাঘাত সহ্য করে, শতসহস্র রাষ্ট্রনায়কদের জাতিসাম্যের বাণী বিধিনিষেধের আইনকানুন আবর্জনাভূতপে নিক্ষেপ করে, আজও ১৯৭৮ সালেও যখন দেখা যায় যে সেই জাতিভেদ ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে সবচেয়ে মজবুত ভিত্তিরূপে প্রায় অটুট রয়েছে, অথচ অর্থনীতি-টেকনোলজির অগ্রগতি-উন্নতি অনস্বীকার্য, তখন ভাবতে হয় যে এই ব্যবস্থাটা কী এবং তার অন্তর্নিহিত কোন জাদুবলে তার এই অমর অক্ষয় রূপ আজও প্রকট।” মার্ক্স আশা করেছিলেন বৃটিশ পুঁজির ধাক্কাতে বিশেষ করে রেলের মত প্রযুক্তির ধাক্কাতে ভারতের জাত-বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, বিশেষ করে বৃটেনে বিপ্লব হবে, ভারত স্বাধীন হবে আর তার পরে এই অভিশাপটি দেশের সমাজে থাকবে না — সেই বিশ্বাস থেকেই ভারতীয় মার্ক্সীয় তত্ত্ব গড়ে তুলতে পঞ্চাশের দশকের ‘তেভাগা’র নেতৃত্ব, বিনয় ঘোষ সেই আবহেই প্রথম লিখেছিলেন তাঁর বইটি। জাতবর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে গেছে, এমনকি হিন্দুতে মুসলমানেও সম্প্রীতিটাই মূল স্বর এই সমাজে— এমন একটা তত্ত্ব তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তিন দশক পরে এসে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন মার্ক্সের পক্ষে ভারতের সমাজের ভেতরটা দেখা তখন কতটা সম্ভব ছিল। মত দিচ্ছেন মার্ক্স যা আশা করেছিলেন ঘটনা তেমনটি ঘটেনি। শুধু তাই নয়, এই দেশে শিল্পবিপ্লব হয়নি, স্বাধীন পুঁজি গড়ে ওঠেনি, সামন্তবাদকে প্রত্যাখ্যান জানানো তো দূর, একে সঙ্গী করে নিয়ে এর সঙ্গে আঁতাত করেই এগিয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজি। সুতরাং নাগরিক উপরতলাতে সামান্য নাড়াচাড়া হলেও সমাজের তৃণমূল নাড়ানো কোনো নবজাগরণও হয়নি এই দেশে। তাঁর এই অধ্যায় পড়লে এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে বাধ্য যে সমাজ এবং ইতিহাসকে দেখার একটি ইউরোপীয় মডেল ছাড়া এই নবজাগরণের অর্জন বিশেষ নেই। যে মডেল আসলেই জ্ঞান-কর্মযোগে বিভাজিত এই সমাজের বৌদ্ধিক সমাজকে দেশের থেকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন করেছে বৈ কাছে নিয়ে যায়নি। অধ্যায়টি শেষ করেছেন এই লিখে—“আমাদের দেশের বৃহত্তম জনশ্রেণী কৃষকেরা নিম্নতম শূদ্রবর্ণভুক্ত হবার ফলে যে রাজনৈতিক ট্রাজেডি ঘটেছে তা আরও শোচনীয়। চীনে কৃষিজীবীরা সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, উচ্চতম স্তরের পরেই তাদের

স্থান, একথা আগে বলেছি। সেই জন্য চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহজেই গ্রামাভিত্তিক ও কৃষক শ্রেণীনির্ভর করতে পেরেছে, যা ভারতীয় রাজনীতির কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত নির্ভর হবার জন্য আজ তার এই মমাস্তিক পরিণতি হয়েছে। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও শোষণ-পীড়ন সত্ত্বেও এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আজও তাই শাসক-শোষক শ্রেণীর লেজুড় হয়ে নিজেদের সত্তা কোনরকমে বজায় রেখে চলেছে, এমনকি যাঁরা কমিউনিস্টদের মধ্যে সাচ্চা বিপ্লবী, প্রকৃত মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট বলে দাবি করেন তাঁদের মধ্যে অনেকে (সকলেই অবশ্য নন) মধ্যবিত্ত বাবুপ্রধান রাজনীতিতেই মগ্ন, কেবল তত্ত্বকথার বীজগুড়ি কাটছেন এবং গ্রাম বা কৃষক তাঁদের শহরের কফিহাউসের আড্ডা থেকে অনেক দূরে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে যেমন মার্ক্সীয় তত্ত্বের বাঁধা সূত্র প্রয়োগ করে, আমাদের হতভাগা দরিদ্র দেশে কোন বিপ্লব হয়নি এবং হবার আশু সম্ভাবনা নেই তা ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি মার্ক্স-লিখিত ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল বিষয়ে প্রবন্ধের সাহায্যে ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। বাংলার তথা ভারতের নবজাগৃতি যে একটি অতিকথা (Myth), এ সত্য বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে”।

“জাগল কারা?” তিনি প্রশ্ন করেছেন। “কলকাতা শহর যদি ‘নবজাগৃতি কেন্দ্র’ হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য ‘জ্যোতির কনকপদ্মের’ মত কলকাতার আকাশে উদ্ভিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার”? এর আগে যিনি লিখেছেন নগর কলকাতার নূতন অর্থনীতি বর্ণের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছে, এবারে সেই তিনিই লিখছেন, ‘বৃটিশ আমলে হিন্দু সমাজে এই ঘটনাই ঘটেছে। কুলবৃত্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা কেউ জাতিচ্যুত হন নি, বরং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সমাজে তাঁদের কুলগত আধিপত্য আরও মজবুত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুলগত বর্ণের সঙ্গে বিভক্ত বর্ণ মিশে এক বিচিত্র বর্ণ সামাজিক প্রতিপত্তির বিকাশ হয়েছে সমাজে বৃটিশ আমলে। সমাজের কুলগত জাতি-বর্ণগত গড়নের কোনো পরিবর্তন হয় নি, যেজন্য এদেশে ‘রেনেসাঁস’ হয়নি”। তিনি আরো লিখছেন, বৃটিশভারতে তথা বাংলাতে জাতি (Caste) ও শ্রেণী (Class) বিচিত্রভাবে সমাজগড়নের স্তরে স্তরে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তার ফলে সমাজের স্তরবিন্যাস আরো জটিল হয়েছে। জাতিবিরোধ ও শ্রেণীবিরোধ বাস্তবতার স্তরে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে কোনটা কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। বর্তমানে তাই ধনতন্ত্র ও টেকনোলজির যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রেণীবিরোধ জাতিবিরোধ বলে মনে হয় এবং বাইরের প্রতীতি যে বাস্তব সত্য নয় তা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বুঝি না।” বুঝি না বলেই আজ যখন অসম তথা পূর্বাঞ্চলের দিকে

জাতিবিরোধগুলো দেখি তখন আমাদের অনেকেরই মনে হয় এগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র —শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে দূর দূর অবধি এর কোন সংযোগ নেই। এতো এতো রক্তহানির ইতিহাস রচিত হবার পরেও আমাদের পুঁথিপড়া মনে এই প্রশ্নও জাগে না অনেক সময়, মার্ক্স তবে কেন লিখেছিলেন, “আজ অবধি অস্তিত্বশীল সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস”। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম স্থগিত রেখে ‘সাম্প্রদায়িক বিরোধ’ মেটাবার কাজে ব্যস্ত বহু মার্ক্সবাদী সমাজ ইতিহাস থেকেই মুছে যাচ্ছেন, তবু চৈতন্যদায় হয়-ই না। অথবা আদৌ কি স্থগিত রাখছেন? দেখা যাবে, বর্ণহিন্দু নেতৃত্বাধীন বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের ভেতরে মীমাংসার নিদান দিয়ে আসলেই তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামে প্রতিদিন অংশ নিচ্ছেন কিন্তু উপরের শ্রেণীর সহযোগী হয়ে এই ভাবে তাঁরাও শরিক তথা রক্ষক হয়ে পড়ছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত-বর্ণ ব্যবস্থার।

ভারতীয় সমাজের জাত-বর্ণ ব্যবস্থা এমন একটি মূল বিষয় যে, ‘ঈশ্বর’ কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রবল শক্তি নিয়ে ইতিহাসের সমগ্র সময় জুড়ে ভারতীয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটি একাধারে এই দেশে একটি ধর্মীয় তত্ত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষ আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ধর্মীয় তত্ত্ব হিসেবে এটির বিরোধিতা করতে গিয়ে চার্বাক যোগ, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব মতবাদের মতো যত মত তত পথের উদ্ভবই হোক না কেন, কিংবা ইসলাম বা খৃষ্ট ধর্মের ঝড় বাইরে থেকে ভারতে আসুক না কেন, সনাতন ধর্ম এখনো ভারতের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম। সেই সমস্ত মানুষ এবং যারা এই ধর্মের ভেতরে নেই তাদেরও চূড়ায় বসে আছেন ব্রাহ্মণ্য সমাজ। ধর্মটির আদৌ কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না কোনদিন, না কোন স্থির উপাসনা পদ্ধতি, না কোন স্থির আচার অনুষ্ঠান। যার জন্য এর উদারতা নিয়ে বহু ভারতীয়ই প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। কিন্তু জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, জাতি বিচার এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে কেউ এই ধর্মটির কল্পনা আজও করতে পারবেন না। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাচারের সময়ে প্রতিজন হিন্দুকেই জীবনে তিনবার হলেও ব্রাহ্মণদের পায়ে প্রণাম ঠুকতেই হয়। এখানে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা চলে না। ইতিহাসে বারে বারে এর উপর ভেতরে কিংবা বাইরে থেকে আঘাত পড়েছে, ক্ষয় হয়েছে, মনে হয়েছিল বিলুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু কোন এক অলৌকিক শক্তিবলে এর পুনরুত্থান হয়েছে, যেন নতুন নামে এবং চেহারাতে গোটা ধর্মটির পুনর্জন্ম হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে এই পুনর্জন্ম পাওয়া ধর্মটিই সগৌরবে নিজের আপাত ‘চিরায়ত’ গুণের প্রতি সম্মানে নিজের নাম দিয়েছে ‘সনাতন ধর্ম’, যে ধর্ম দুনিয়ার আর কোন ধর্মের মত নয় বলে সে নিজেই নিজের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। এবং বাকি বিশ্বের থেকে আলাদা থাকবার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে প্রথমে তারা প্রাচ্যের প্রতিপক্ষ এবং পরে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষের দেওয়া নাম সে নিজেই মেনে নিয়েছে— নামটি ‘হিন্দু’ ধর্ম।

যে ধর্ম ভারতের বাইরে ছড়াতে পারেনি কোনদিন—এটিই তার সীমাবদ্ধতার উজ্জ্বল প্রমাণ। যার শেষ পুনরুত্থান ঘটে উনিশ শতকের শেষের ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী কলকাতাতে এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই থেকে। উনিশ শতকীয় বাংলা তথা ভারতীয় ‘নবজাগরণ’ এসেও শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গে আঁতাত করেছে বৈ উচ্ছেদ করেনি। মহানাগরিক সমস্ত প্রগতিশীল ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পরিণাম কিন্তু উনিশ শতকের ‘হিন্দু পুনরুত্থানবাদ’।

আঠারো শতকের শেষে ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষার আত্মীয়তার সম্পর্কসূত্রের আবিষ্কার একদিকে যেমন নতুন শাসকদের সঙ্গে ‘সনাতন’ ভারতের শাসকশ্রেণীর আত্মীয়তাভাবের সুদৃঢ়করণে বৌদ্ধিক সহায়তা করে, তেমনি ভারত ইতিহাসের এক ‘অন্ধকার মধ্যযুগে’র কল্পনাও বিদেশী শাসক এবং দেশী মুৎসুদ্দিদের একই ইতিহাসের শরিক হবার গৌরব প্রদান করে। বুঝিবা এই জুটি এবারে ভারতের ইতিহাসকে ‘মধ্যযুগের অন্ধকার’ থেকে ‘আধুনিকতার আলো’য় এনে ফেলে দেবে। কদূর কী ফেলেছে সেটি নিয়ে অবশ্য বিশাল তর্ক করা যেতেই পারে। কিন্তু ব্রিটিশ যাবার অর্ধশতক পরেও নব্য ভারতীয় শাসকশ্রেণীর প্রবল বিশ্বাস যে, ‘পশ্চিমী জ্ঞান এবং সনাতন প্রজ্ঞা’ই শুধু পারে আধুনিক ভারতের নির্মাণ করতে; তাই এই শাসক শ্রেণী এখনো বিল গোটস ভারতে এলে এবং শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আমেরিকা গেলে সমান উল্লাসে মেতে ওঠে। ওদেশ থেকে পুঁজি আসা এবং এদেশ থেকে শ্রমের যাওয়াকে সে নাম দেয় ‘পূর্ব-পশ্চিমে’র মিলন তথা বিশ্বব্রাত্ম্য। এর উল্টো কল্পনা খুব একটা করেও না, তার দরকারও নেই।

‘অন্ধকার মধ্যযুগ’ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তার মধ্যে একটিই শুধু পার্থক্য আছে। পশ্চিমে রাজ করত স্বধর্মের চার্চ, যার শাসন এবং শোষণ থেকে বেরিয়ে তাঁরা নবজাগরণ এনেছিলেন, শিল্প বিপ্লব করেছিলেন, সামন্তবাদ হটিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর আমাদের দেশে রাজ করতেন বিধর্মী কিন্তু ধর্মাত্মক ‘বিদেশী’রা। যাদের থেকে আমরা নিজেরা তো মুক্তি অর্জন করতে পারিনি, পশ্চিম এসে হাত ধরেছে আমাদের ও উদ্ধার করেছে। মোটামুটি এই বিশ্বাস এবং ভালোবাসা ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে তুলেছিলেন এবং এখন উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে অস্তিত্বশীল ভারতীয় মধ্যবিত্ত সেই বিশ্বাসকে লালন করেন। অসম বিকাশের দেশে নতুন যেসব জনগোষ্ঠী এই মধ্যবিত্তের সারিতে নাম লেখান, তারা অচিরেই স্কুল পাঠ্যক্রমের এই ইতিহাস মুখস্থ করতে শুরু করেন।

বলা হয়ে থাকে যে ‘অন্ধকার মধ্যযুগে’ ইসলাম ভারতীয় হিন্দুদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন চালিয়েছে, ধর্মচর্চার শাসন কিছুই রাখে নি। হাজারো মন্দির ধ্বংস করেছে,

নারীর মান ধুলোয় লুটিয়েছে। ভারতীয় ‘নবজাগরণে’র অর্জন হলো এই নবীন অন্ধবিশ্বাস। ঘটনা হলো এতো সব হবার পরেও এইসব গল্প বলবার এবং শুনবার মতো এক শক্তিশালী ভারতীয় হিন্দু মুৎসুদ্দি শ্রেণীকে বৃটিশ এসে এই দেশে পেয়ে গেছে। তাঁরা কেউ ধর্মান্তরিত হন নি। তখনো তাঁরা এই দেশের সিংহভাগ মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নেতা। বাকি পশ্চিম এশিয়াতে, উত্তর আফ্রিকাতে, ইরানের মতো আর্যভূমিতে, তুরস্কের মতো ইউরোপীয় দেশে যে পূর্বতন সমস্ত ধর্মকে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক করে ছেড়ে দিয়ে একের পর এক ধর্ম-বিপ্লবও করে গেছে— ভারতে সেই ইসলাম হিন্দু ধর্মের টিকিটিও নাড়াতে পারে নি। চীনে-জাপানে অবশ্য ইসলাম ঐতিহাসিক অন্যান্য কারণ ছাড়াও প্রাকৃতিক কারণেই বেশিদূর এগোতে পারে নি। সেসব দেশে একইসঙ্গে জাঁকিয়ে বসল একটি ভারতীয় ধর্মই—তার নাম বৌদ্ধধর্ম। যে ধর্ম ভারতে ‘ব্রাহ্মণ্য’ ধর্মের কাছে হার মেনেছিল ‘অন্ধকার মধ্যযুগ’ শুরু হবার আগেই। বাকিটা বিলীন হয়ে গেল ইসলামের মধ্যে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। যদি কোন ধর্মকে বিপন্ন করেছে ইসলাম এই দেশে তবে সে বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু নয়।

আমাদের এই অভিমতের পক্ষে খুব সহজ সমর্থন যোগাবে আমাদের ধর্মসাহিত্যের ইতিহাস। গোটা ‘অন্ধকার মধ্যযুগে’ আমরা ‘চর্যাপদে’র মতো আর দ্বিতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য পেলাম না, ইসলামি সাহিত্য বা মুসলমান রচিত সাহিত্যকে সেই সব ঐতিহাসিকরাই একটির বেশি অধ্যায় জায়গা দেন নি, যারা তুর্কি আক্রমণের ইতিহাস এখনো প্রবল ব্যথাহত বুকেই লিখে থাকেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে ‘অন্নদামঙ্গল’ অবধি —সে যুগের বাংলা সাহিত্যের গোটা ইতিহাস আসলে ‘ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের’ পুনর্জন্মের ইতিহাস। সেই আধিপত্য যাদের রেখে দিয়েছিল সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে, তারা যদি রচনা করেছেন কোনো সাহিত্য কিংবা চর্চা করেছেন কোনো ধর্ম তবে সেগুলো ঠাই পেয়েছে ‘অপ্রধান’ কিংবা ‘গৌণ’ তালিকার ভিড়ে। খুঁজে পেতে বার করতে হয়। এমনকী দীনেশ সেনের মতো লোক যখন বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রাক্-প্রাঙ্গণ্য বৌদ্ধ-ঐতিহ্য লালিত বা ব্রাহ্মণ্য অধিকার বহির্ভূত বাংলার ধর্মসম্পর্কশূন্য ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের এমন বিশাল ভাঁড়ারকে পূর্ববঙ্গগীতিকা নাম দিয়ে উদ্ধার করেন তখনো সেগুলো ‘গৌণ সাহিত্য’, ‘লোকসাহিত্য’ ইত্যাদি বিচিত্র নাম দিয়ে প্রাত্য করে রাখবার সমস্ত আয়োজন হয়। ‘এমনকী জাল কর্ম’ বলে এগুলোর মানহানিরও সমস্ত আয়োজন হয়। এই নিয়ে স্বয়ং দীনেশ সেনই আক্ষেপ করে গেছেন। এই সাহিত্যগুলো আসলে আমাদের সমস্ত ঔপনিবেশিক ইতিহাসবোধকে ধ্বসিয়ে দেয়। চেনায় আমাদের সমাজ-ধর্ম-সাহিত্যের আসল স্বরূপ। এই কাজগুলো যারা করেন, তারাই ইসলামের হাতে হিন্দু ধর্মের বিপন্নতার কথা বড় করে বলে থাকেন।

আসল ঘটনা হলো, ধর্মের দিক থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধ শাসকশ্রেণী ভারতের জাতবর্ণ ব্যবস্থাটিকে হয় বোঝেন নি বা নিজেদের শাসনের সুবিধার জন্য তাতে আঘাতও করেননি। তাই একসময় ধর্মটি এই দেশে অগ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া অন্তত শাসনের দিক থেকে অনিবার্য ছিল। শাসিতের মধ্যে যারা ধর্মটিকে ধরে রেখেছিলেন, তাদের খুব ছোট অংশকে এখনো এই দেশে দেখা যাবে, বাকিরা ইসলামের শাসনে এবং প্রশ্রয়ে গোটা ভারতে দেখা দেওয়া বৈষম্য এবং সমধর্মী আন্দোলনের বিচিত্র শাখাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাতে কি বর্ণবাদ ধ্বংসে গেলি? মোটেও না। মুসলমান শাসনের গোটা অধ্যায় জুড়ে দেখা যাবে ভারতীয় সমাজকাঠামোতে তারাও কোনো ধরনের মৌলিক আঘাত করেনি। আঘাত হেনেছে বলে বলবার গল্প সেইসব ঐতিহাসিকদেরও বেশি নেই যারা মন্দির ভাঙার গল্প ঘটা করে বলেন। সেই মন্দির ভাঙার গল্প আবার বাংলাদেশে নেইও খুব একটা। কারণ, পশ্চিমী আর্য-ভারতের মতো সম্পদশালী মন্দির তথা ব্রাহ্মণ্যঘাঁটি বাংলাদেশে ছিলও না খুব বেশি। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে খুব কঠিন বইপত্রের কাউকে পড়তে হবে না, অচ্যুৎ চরণ তত্ত্বনিধির শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পড়লেই যথেষ্ট। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে যা কিছু এখানে ছিল, সবই বৌদ্ধ সম্পদ। নালন্দা গিয়ে ব্রাহ্মণ্য অধিপতিদের খুব একটা অসুবিধে করেছিল বলে মনে হয় কি? তাহলে গৌরব করার মতো মিথিলা নবদ্বীপের গল্প সব জমা হলো কী করে? মুসলমান যুগে এই কেন্দ্রগুলোর উত্থান হয়েছিল। সপ্তগ্রাম, কৃষ্ণনগর, সিলেট, পঞ্চখণ্ডে ছড়িয়েছিল। বৃন্দাবন দাস যখন নবদ্বীপের ধর্মের অবক্ষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ্য অবক্ষয় নিয়েই হাহাকার করছিলেন, ইসলামের অত্যাচার নিয়ে নয়। ব্রাহ্মণেরা বরং কাজির কাছেই বিচার নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে। তাঁর অপরাধ ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে। কাজিতে-ব্রাহ্মণে আঁতাতের ছবিটা বরং স্পষ্ট হয় এতে। বৌদ্ধ ধর্মের মতোই ইসলাম এই আঁতাতটাও করেছিল। শাসক এবং শাসিতের ইসলামের মধ্যে আদান-প্রদান থাকলেও একটা আলাদা চরিত্র পেয়েছিল। সুফি সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে আরাকানদের বৌদ্ধ রাজসভাতে। যে আরাকানের রোহিঙ্গিয়ারা বাঙালির আত্মীয় হয়েও এখন আন্তর্জাতিক স্তরেই একটি ব্রাত্য জনগোষ্ঠী। মূল বাংলাদেশের মুসলমান শাসকদের দরবারে অনুদিত হচ্ছে হিন্দু পুরাণ-ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত। কিছু তো অর্থ আছে এর। কিন্তু কোনো পক্ষই জাতবর্ণ ব্যবস্থার মূলে আঘাত করলেন না। এমনকী বৈষম্য শ্রীচৈতন্য বা গৌড়ীয় বৈষম্য ধর্মও না। তবে কিনা সংস্কৃতেই চর্চা হতে হবে সমস্ত ধর্মসাহিত্য— এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে প্রত্যাছান জানিয়ে বাংলা ভাষার বিকাশের শক্ত ভিত তৈরি করছে এই ঘটনা। সেই বাংলাভাষাতেই অকৃতজ্ঞের মতো আজকাল আমরা মুসলমান শাসনকে কষে গালিগালাজ করি, তাও খাওয়া পরার কোনো সমস্যা নিয়ে

নয়, ধর্মাস্তর ঘটাবার দায়ে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্মে আমরা যে ‘স্বকীয়া-পরকীয়া’, ‘বৈধী-রাগানুগা’ ইত্যাদি বিতর্ক দেখব সেগুলো নিতান্ত মতাদর্শগত সংঘাত ছিল না। এগুলো উঠে এসেছিল রীতিমত শ্রেণী-বর্ণগত স্বার্থের থেকে। স্বকীয়া-বৈধী ধারাটি ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দেখানো পথে সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ‘গৌরীয় বৈষ্ণব’ ধর্ম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার তথাকথিত ঔদার্যের বশে ধর্মের নতুন মত এবং পথকে বরণ করে নিচ্ছে কিন্তু জাতবর্ণ ব্যবস্থার অব্যয় আধিপত্য নিশ্চিত করে নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রীচৈতন্যের সময়ই আরেকটি ব্যাপার ঘটেছিল বাংলাদেশে। রঘুনন্দনের হাতে নতুন স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হচ্ছে নীরবে এবং ব্রাহ্মণদের বিতর্কসভায় ছড়িয়ে পড়ছে। স্মৃতিশাস্ত্র দিয়ে শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্ম। স্বয়ং নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী সেই চাপে রাখাকে পরিণীতা বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কৃষ্ণের বাঁ পাশে বসিয়ে যুগল মূর্তির প্রতিষ্ঠা করছেন; ফলে নিজের গর্ভজাত সন্তান রামচন্দ্র ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন মায়ের থেকে। মায়ের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার উঠে আসছে সংপুত্র বীরভদ্রের হাতে। সত্য বটে তাঁদের পুরনো ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার থেকে সরে আসা সবটা অতলে যায়নি, নৈলে জাহ্নবী দেবী, সীতা দেবীর মতো অতি শ্রদ্ধেয়া বৈষ্ণবগুরু দেখা দেবে কী করে? শুধু তাই নয়, বৈধীধারার নতুন শাস্ত্রচর্চা করতে করতে এঁরা বিদ্যাসাগরের বহু আগেই অন্ধকার মধ্যযুগের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা ছড়াচ্ছেন। এও সত্য যে সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে এঁদের হাতে নতুন করে বাংলাদেশে বহু বৈষ্ণব মন্দির গড়ে স্থাপত্যশিল্পেরও এতটাই বিস্তার ঘটেছিল যে বৃন্দাবন হয়ে সেগুলো রাজস্থান অবধি পৌঁছেছিল।^১ — মন্দির ভাঙার ইতিহাসের প্রবক্তারা যে-কথাগুলো খুব ঘটা করে লেখেন না। কিন্তু এও সত্য যে এদেরই উত্তরসূরীরা ক্রমে সহজিয়া চণ্ডীদাসেদের সেভাবেই অপাণ্ডক্ত্য করে দিচ্ছিলেন যেভাবে এককালে চৈতন্যকে করতে চেয়েছিলেন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা। কিংবা যে পূর্বাধিকার রচিত হয়েছিল ডোম্বী প্রেমে মাতোয়ারা চর্যাপদের রচয়িতাদের বেলা। মূল ধর্মকথাগুলো লুকিয়ে গেছিল সাক্ষ্যভাষার আড়ালে। এই দুই পথের লড়াই এরপরে নিরন্তর চলেছিল। পীড়িত, প্রত্যাখ্যাত, উপেক্ষিত এবং তথাকথিত নিম্নতর জাতি-বর্ণগুলোর সেই পথটিকে আমরা এক কথাতে বলতে পারি, ‘সহজিয়া’ পথ। সেই বৌদ্ধ যুগ থেকে সুফি কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের রমরমার যুগে যার বাইরের পোষাক পান্টালেও ভেতরে মর্মকথাটি মোটের উপর একই। এরা কেউ, ঈশ্বরকে নিজের বাইরে কল্পনা করতে রাজি ছিলেন না। তাদের একটাই কথা ‘মনের ভেতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়’। মন আর অচিন পাখির মাঝে কারো গুরুগিরি এবং শাস্ত্র-শাসন এঁরা মেনে নেন নি। যাঁরা তা মেনেছেন তাঁরা উবে গেছেন ক্রমেই বা প্রতিবাদী ধারাটি শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। এরই জন্য এঁদের থেকে উপাসনা পদ্ধতিটি কী— জানতে চাইলে

অনেকেই ভালো করে উত্তর দেন না। বিশেষ করে বাউল-ফকিররা। একটি সাধারণ ভয় ছিল তাঁদের বা এখনো আছে—সেরকম কোনো পদ্ধতি দাঁড় করালে কিংবা লোক জানাজানি হলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঠিক সেগুলো নিজের আদলে গ্রাস করে নেবে। এখন আবার তার সঙ্গে জুড়েছে বাজারের লালসা। ছায়াছবিতে অবদমিত নারীকে অর্থনৈতিক নিতান্তই যৌন লালসা মেটাতে গাওয়ানো হয় ‘সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী’, যার সঙ্গে বৈরাগ্যের দূর দূর অবধি কোনো সম্পর্ক নেই। বাজারের এই ব্যাপারটি বহু মধ্যবিত্ত বিদ্বজ্জনেরা বোঝেন। যেটি বোঝেন না, তা হলো সামন্তীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যাপারটি। আমরা সেটিই বুঝবার চেষ্টা করব মতুয়া ধর্মান্দোলন থেকে একটি নজির নিয়ে। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখাবো কী করে হরিচাঁদ ঠাকুর বারে বারে বাধা দিচ্ছেন তাঁর জীবনী লিখতে। বাধা দিচ্ছেন তাঁর পুত্র গুরুচাঁদও। কিন্তু সমাজ এবং পরিবারের ভেতর থেকে তাদের লড়াইতে হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে এবং লিখে ছাপার আয়োজন যখন হলো তখনো কেমন আচরণ করছে বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যবাদী কলকাতা।

তার আগে বলে নেওয়া ভালো হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যক্তিটি কে। বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দত্ত-ঘোষদের দেশে আমরা কেউই কিন্তু স্কুল-কলেজে এঁদের কথা পড়িনি বিশেষ। সেখানে এঁরা এখনো ব্রাত্য। হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলার সবচে’ বড় হিন্দু কৃষক এবং অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী নমশূদ্র সম্প্রদায়কে সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। ক্রমে সেই লড়াই রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দুই ধারাতে বিকশিত হয়। ব্রাহ্মণ্য বৈদিক ধারার বিপরীতে তিনি এমন এক ধর্ম গড়ে তোলেন যা আজো ভারত-বাংলাদেশের কয়েক কোটি নমশূদ্রদের মধ্যে মতুয়া নামে পরিচিত। ১৮১২ সনের ১১ মার্চ এখনকার বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দির পাশে সাফলিডাঙ্গা গ্রামে জন্ম নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পরে ওড়াকান্দি থেকেই পরিচালনা করেন তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড। সেখানেই ১৮৭৮-এ তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র গুরুচাঁদ উত্তরদায়িত্ব তুলে নেন। গুরুচাঁদের জন্ম ওড়াকান্দিতে ১৮৪৪-এ, মারা যান ১৯৩৭-এ। বাবা-ছেলের জীবৎকাল ১২৫ বছর থেকে হরিচাঁদের ছেলেবেলার প্রথম একুশ বছর - যে বয়সে তিনি তাঁর জন্মগ্রাম ছেড়ে ওড়াকান্দি আসেন—বাদ দিলেও বলা চলে উনিশ-বিশ শতকের একশত বছর জুড়ে মতুয়া ধর্মান্দোলন ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন। যদি ব্রাহ্ম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কথা মনে রাখি, তবে এতো দীর্ঘ নির্বিবাদ জীবন সেই ধর্মের ছিল না। এতো বিশাল সামাজিক সমর্থনও ছিল না ব্রাহ্মধর্মের। তারপরেও ব্রাহ্মদের চিনি, মতুয়াদের চিনি না।

আমরা তাঁর ধর্মমতের বিস্তৃত এখানে আলোচনা করতে যাবো না, কিন্তু কিছু

বালক তুলে না দিলে বুঝতে অসুবিধে হবে। বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের আদলে হরিচাঁদেরও ছিল দ্বাদশ আজ্ঞা : ১) সদা সত্য কথা বলা। ২) পরদ্বীকে মাতৃজ্ঞান করা। ৩) পিতা-মাতাকে ভক্তি করা। ৪) জগতকে প্রেমদান করা। ৫) পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ না করা। ৬) কারো ধর্মনিন্দা না করা। ৭) বাহ্য অঙ্গে সাধু সাজ ত্যাগ করা। ৮) শ্রীহরিচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। ৯) ষড়রিপুর থেকে সাবধান থাকা। ১০) হাতে কাজ মুখে নাম করা। ১১) দৈনিক প্রার্থনা করা। ১২) ‘ঈশ্বরে’ আত্মদান করা।

দেব-দ্বিজে, অবতারে, সাধুর ভেঁকে, মূর্তিপূজোতে, পাপে-পুণ্যে, স্বর্গে-নরকে, যাগ-যজ্ঞে, অশৌচাদি আচার বিচারে এবং জন্মান্তরবাদে মতুরা ধর্মের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। মূল কথাটা ছিল, “জীবে দয়া, নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা/ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া দ্রষ্টা।” হরিচাঁদের আমলেই সামন্ত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়াও, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নরবলি, শাস্তিবিক্রি ইত্যাদি নানা পরম্পরার বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন মতুরারা। পরে গুরুচাঁদ নমশূদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বাণিজ্যের বিস্তার এবং আইনী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টাতে চণ্ডাল অপবাদ ঘুচে জনগোষ্ঠীটি নমশূদ্র বলে পরিচিত হয় ১৯১১-র আদমশুমারির পর থেকে।

মতুরা ধর্মে ব্রাহ্মণ্যসংস্কার প্রবেশের প্রক্রিয়াটি কিন্তু শুরু হয়েছিল হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতেই। অথবা বলা সঠিক হবে, আতাকরণ্য তাঁকে লড়ে যেতে হয়েছে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। ‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’ বলে একটি গ্রন্থকে এখন অধিকাংশ মতুরারা তাঁদের আদি ধর্মগ্রন্থ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ এবং অনুসরণ করে থাকেন, সেটি লিখতে মানা করেছিলেন স্বয়ং হরিচাঁদই। কথাটি এই গ্রন্থেই আছে। এটি লিখেছিলেন তারক চন্দ্র সরকার। তাঁকে কবি নিযুক্ত করে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা আসলে করেছিলেন অন্য দুই ধর্মগুরু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এবং দশরথ বিশ্বাস। তাঁরা যখন নিজেরাই খানিক লিখে হরিচাঁদকে পড়িয়ে অনুমোদন আনতে যান, তিনি মানা করে বলেন, “...লীলাগীতি লেখা এবে উচিত না হয়/ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমাচার/অন্তরের মাঝে রাখো আসন আমার।” একজন যথার্থ বৌদ্ধ-বাউল সহজিয়া পরম্পরার গুরুর মতো নির্দেশ ছিল। জেদ ধরলে হরিচাঁদ উদ্ভা প্রকাশ করেন এই ভাষাতে, “মহাপ্রভু বলে জান এ কন্মের পুরস্কার/কুষ্ঠ ব্যাধি হবে চেষ্টা করিলে আবার।” এই ঘটনাতে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথ জুটি ভয় পান নি, বইটি অষ্টম সংস্করণের ভূমিকাতে আছে মৃত্যুঞ্জয় বুঝি এই অভিশাপকে সাদরে গ্রহণ করেন, “সেতো আমার জীবনের লীলাগীতি লেখার পরম পুরস্কার।”^{২২} কিন্তু কবি তারক চন্দ্র সরকার ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আধখানা লেখা পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখেন। পরে যখন শেষ করেন তখন এক ব্রাহ্মণ্য গল্প জুড়ে দেন— সেই পাণ্ডুলিপি বুঝি সরিয়ে ফেলেছিলেন দেবী সরস্বতী। হরিচাঁদের মৃত্যুর পর আবার সেই

সরস্বতী স্বপ্নে এসে তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে যান, সেই সঙ্গে গ্রন্থ শেষ করার জন্য হরিচাঁদের ইচ্ছে জানিয়ে যান। তাতেও ‘মূঢ়মতি’ তারক খুব উৎসাহ দেখান না লেখা শেষ করতে। শেষে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথের সহযোগী গোলক গোসাঁই এসে জানান, “স্বপ্ননেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান/সেজন পণ্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ।” আরো জানান, তারকনাথের প্রতি ব্রাহ্মণদের সমর্থন আছে, “ইতিনায় ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান/সুকবি বলে তোরে দিয়েছে আখ্যান।” এতো সবেও যখন তারকনাথ সাহসী হন না, তখন গোলক গোসাঁই এক ভোর রাতে রীতিমত নৃসিংহ রূপে এসে তারকনাথের বুকে নখ ঢুকিয়ে শাসিয়ে দিলেন, “...বললে তোরে নখে চিরি করি খান খান/নৈলে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত পুঁথি আন।” বোঝা যায়, ইতিমধ্যে মতুয়া ধর্মের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে যাঁরা আখের গোছাতে চাইছিলেন তাঁরা এর রাজনৈতিক সারবস্তুর্তে বিসর্জন দিয়ে একেবারেই ব্রাহ্মণ্যধারার গুরু হয়ে বসতে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরাই প্রবল চাপে এই গ্রন্থ লেখান। আজ অনেক মতুয়া ধর্মাবলম্বী বুদ্ধিজীবীরা একে ‘স্বগোষ্ঠীর প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ’ বলে মনে করছেন এবং নতুন করে ভাবছেন’।^{১০} এ বইটি সরস্বতীর স্বপ্ন দেখানো, নৃসিংহ রূপ ধরা, গুরুবাড়িতে দুর্গাপূজোতে গুরুচাঁদের সম্মতি, ব্যবসায়ী গোবিন্দ বিশ্বাস, চৈতন্য বিশ্বাসের বাড়ির দুর্গাপূজোতে পাগল হীরামনের অবিশ্বাসের বশে দুর্গা মূর্তির কোলে চড়ে গিয়ে দুধ খাবার বায়না ধরা এবং দুর্গার প্রকাশ্যে তাঁকে স্তনের দুধ খাইয়ে শাস্ত করা—এমন আরো বহু অলীক গল্পে ভরা। এতো গেল ভেতর থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী চাপের কথা।

কিন্তু বাইরে থেকে যে চাপ ছিল, সেটি আরো ভীষণ এবং আরো লজ্জার। হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতে বইটি ছাপার মুখ দেখেনি। তিনি মারা যান ১৮৭৮-এ। ১৯১৬তে বইটি ছাপান তাঁর কবিরাজ শিষ্য হরিবর সরকার। সম্প্রতি ২০১০-এ ডা. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ‘হরি-গুরুচাঁদ চৈতন্যমণ্ডে’র উদ্যোগে ‘হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত’ নামে একটি বই লিখে বের করেছেন। সেখানে জানা যাচ্ছে, ‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’ প্রকাশে গুরুচাঁদেরও আপত্তি ছিল, ছেলে শশীভূষণ ঠাকুরের চাপে সম্মতি দেন। “গুরুচাঁদ সম্মুখেতে আনা হল পুঁথি/শশীবাবু প্রতি পাদ দেখে পাতি পাতি/গুরুচাঁদে পড়ে শোনাল এ গ্রন্থ/গ্রন্থের বন্দনা থেকে একেবারে আস্ত/পড়া শুনে গুরুচাঁদ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস/কিছু কিছু ভাব তত্ত্বে হইল হতাশ।। ...লেখা যায় যাহা ইচ্ছা সাদা কাগজেতে/কালি লেখা কাগজেতে লেখে কিবা মতে/সেই মত ভুল তত্ত্ব শেখে যদি জাতি/ কোনদিনও কাটিবে না এ আঁধার রাত/ঠিক তত্ত্ব বুঝোনো তো হবে বড় দায়/আমি সারা হই ভেবে সেই আশঙ্কায়।।” বইটিতে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মতুয়া তত্ত্ব ছিল না তা নয়, কিন্তু আদিভাস্ত ‘বৈদিক অলীক গল্প’-এর মিশেল রয়েছে। তার উপর সমস্যা হলো তখন অবধি যদিও ‘নমশুদ্ধ সুরিৎ’-এর মতো বহু সাময়িক কাগজ বেরোচ্ছে নানা কেন্দ্র থেকে,

তারকচন্দ্রের মতো সম্মানিত কবি ছিলেন না সমাজে। সুতরাং ভবিষ্যৎ লেখকেরা এর থেকে সত্যিকার কাঠামো একটা দাঁড় করিয়ে দেবেন এই আশাতে গুরুচাঁদ সম্মতি দিয়ে দেন। বাপ-ছেলেতে কথা হয় এরকম : “শশী বলে গ্রহে বাবা ধোঁয়া যদি হয়/গুরুচাঁদ বলে অগ্নি খুঁজিয়ে নিশ্চয়। শশী বলে থাকে থাক কিছু জল অংশ/গুরুচাঁদ বলে ছেকে খাবে রাজহংস”।^৪ বইটির প্রকাশিকা অনিতা বিশ্বাস তারকচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়েই লিখেছেন, প্রবল দারিদ্র্য তাঁর শৈশব কেটেছে। কবিরিয়াল পরিবারে জন্মেছেন। বৈদিক পরম্পরার কথিকা পাঠ আর গান করেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তার উপর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। হরিচাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই তাঁর মধ্যে যে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তার ছাপ রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। এই দ্বন্দ্বের জন্যই বইটি লিখতে তাঁর এত দিবা ছিল। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপির উপর কলম চালাতে হয়েছিল সম্পাদক হরিবর সরকারকেও। শ্রীগোপাল বলে এক ভক্ত টাকার যোগান দিলে হরিবর সরকার কলকাতার প্রেসে প্রেসে যোরেন বইটি ছাপাবার জন্য। কেউই রাজি হয় না। অনেকে এর ‘বেদ-ব্রাহ্মণ সম্মত’ সংস্কার করে আনতে পরামর্শ দেন। “কোলকাতা প্রতি প্রেসে করে অনুরোধ/সর্বস্থানে পান তিনি সম প্রতিরোধ/প্রচারে বৈদিক শাস্ত্র ছিল যে সমিতি/বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সপ্তসতী স্মৃতি/ইহাদের ছাড়পত্র আগে প্রয়োজন/তবেই করিবে প্রেস এ গ্রন্থ মুদ্রণ।” সমিতিটির নাম লেখেননি ডা. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। কিন্তু তাঁরা অনুমতি দেন নি, “নিষেধাজ্ঞা জারি করে গ্রন্থ ছাপিবারে/চিহ্নিত করিল গ্রহে বহু জায়গায়/বলে আগেত এই সকলি কর সংস্কার/বৌদ্ধতত্ত্ব বুদ্ধকথা না থাকে পুঁথিতে/অবৈদিক ভাবধারা হইবে মুছিতে।” বিবেকানন্দ বলেছিলেন ‘শূদ্রদের সংস্কৃত অধ্যয়নে মানা করেছে কে?’^৫ তাঁর মৃত্যুর পরেও নবজাগৃত মহানগর কলকাতার ছাপাখানাগুলোর বাস্তবে ছিল এমনি অবস্থান। বিপাকে পড়ে হরিবর গেলেন শ্রীগোপালের সঙ্গে শলা করতে। আম ছাড়া আমসত্ত্ব কী করে তৈরি করবেন তিনি? শ্রীগোপাল টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরও অবদমিত সামাজিক অবস্থান বোঝা যায় এই উক্তিতে, “পড়িয়াছি হেন ফাঁদে উপায় তো নাই/কিছু কিছু জায়গায় কর সংস্কার/দৃষ্টিমাত্রে দৃষ্ট হয় হেন দরকার/স্থূলের ভাবভঙ্গি রাখিও বৈদিক/সূক্ষ্মভাবে ঠিক রেখে অবৈদিক দিক/ভাবীকালে সত্য ঠিক খুঁজিবে পাঠক/জাতিমাঝে জন্ম হবে তাত্ত্বিক রচক।”^৬ সুতরাং যা দাঁড়ালো, “...নীলামৃতে বহুস্থান সংস্কার করে/অলীকের গল্প যাহা গ্রহে দেখা দিল/পরিস্থিতি চাপে সব প্রক্ষিপ্ত হইল”। এতো সব করবার পরেও যে প্রেস এই বইটি ছেপেছিল, তার ম্যানেজার তাঁদের থেকে কুড়ি টাকা ঘুষ নিয়েছিল।

সত্যি সত্যি শ্রীগোপাল এই সূক্ষ্মভাবে ‘অবৈদিক দিক’ ঠিক রাখার কথা বলেছিলেন কিনা, আজ আর আমাদের জানার উপায় নেই। কিন্তু একুশ শতকে এসেও যখন একজন নবীন ‘তাত্ত্বিক রচকে’র কলমে এই কথাগুলো পড়ি, তখন মনে তো হয়ই

আমাদের ‘অন্ধকার মধ্যযুগে’র বিরুদ্ধে যত ধিক্কার, ‘আলোকিত আধুনিকতা’ নিয়ে যত বড়াই কিংবা তাত্ত্বিক কচকচানি সবই আসলে পশ্চিমা আদলে নিজেদের স্বার্থে নির্মিত এক কৃত্রিম আখ্যান। যে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ কবিদের চর্যাপদের ভাষাকে ‘সাক্ষ্যভাষা’ করে ফেলতে বাধ্য করেছিল, তার থেকে স্থানে এবং কালে খুব একটা বেশি এগোইনি আমরা। বাংলার তথা ভারতের ‘নবজাগরণে’র দর্প আমাদের মানায় না। এখনো অনেক পথ আমাদের হেঁটে যাওয়া বাকি। আমাদের ইতিহাসের আলো-আঁধারির খেলাটাই অন্য। পশ্চিমা নবজাগরণের কাঠামোতে এর বেশিটাই আসলে বোঝা যায় না।

গ্রন্থ সূত্র :

- ১। সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৩২১
- ২। দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস, শীশ্রী হরিলীলামৃত এক ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক প্রয়াস : প্রসঙ্গ হরিচাঁদ ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা, চেতনা লহর, এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩, সম্পাদক অনন্ত আচার্য, কলকাতা, পৃ. ৮৯
- ৩। ঐ, ১০৮
- ৪। হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত, ডা. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃ. ২৪০-৪১,
<http://mulnivasijagrron.wordpress.com/book-0001/>
- ৫। The Future of India, Lectures from Colombo to Almora, Complete-Works.
- ৬। হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত, ডা. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃ. ২৪১-৪৫
<http://mulnivasijagrron.wordpress.com/book-0001/>

অসংখ্য অভুক্ত জাগে আঁধার প্রত্যুষে
হাড় ভাঙে ঘাম ছোট তরই রক্ত
কেড়ে খায় সভ্য সমাজ, পরিচ্ছন্ন পোশাকে
কত দানব বসে আছে
হাড় খায়, মাংস খায় ।
রক্ত মজ্জা সবই তার চাই
আমি ক্ষেপী কেঁদে মরি, কষ্ট পাই
বিনিদ্র রজনী জাগি
কথকতা জিজ্ঞাসা থাকে রাজা-মহারাজে
প্রজাই সম্পদ জেনে চুপ থাকে সবে ।

আসলে যে পথ দিয়ে অর্থ আসে
পুঁজি বাড়ে, তারে তুমি
লৌহ-কয়লা যা কিছু বানাতে পার
কেবল মানুষই বদলে যায়
লৌহ আকরিকে

হতভাগা কালো মানুষ
হয়ে যায় চমৎকার রাশি
রাশিফল মেলাবার তরে
কত মাথা ঘামাইছে তারা
মানুষকে বানাতে হবে রেলপাত
নয়তো কয়লা ।

জঙ্গল !
দেখেছি তার
শেষ দিনগুলি ।
শেষ কথা
টেপ-রেকর্ডারে
ধরা আছে ।
রেখেছি
যত্নে
অতি গোপনে ।
যদি
বাজিয়ে শোনাই
অনেক নেতার
মুখ চুনকালি হবে ।

জনগণ
বিপ্লব-সম্ভাবনা-ভ্রূণহত্যার
বিচার চাইতে পারে ।
থাক
সে কথা
পরে হবে ।

হিমালয়
বিস্ফোরণ করে
একখানা
কালো পাথর
ছুঁড়ে দিয়েছিল

নকশাল বাড়িতে ।
ভূকম্পন !
সে স্পন্দন
অনেক দূর গড়িয়েছে ।

ভদ্রলোক
বিপ্লব খুনিরা
শয়তানি-হাতুড়ি দিয়ে
কালো পাথরখানা
টুকরো টুকরো করে
নিষ্পেষ করেছে ।
ফেলে গেল ।
গুধু ছায়া ।

ভয়ঙ্কর ভূমি স্থলন !
সিকিম-হিমালয়ে
জুলুকের কাছে
আর দু-হাত আগে এগোলে
কোথায় যেতাম তলিয়ে ।
সেদিন
গুহায়
গুহামানব হয়ে
রাত কাটালাম ।
গভীর রাতে
হঠাৎ ঘুম ভাঙল,
দেখি ছায়া ।

জঙ্গল !
গুহার সামনে দাঁড়িয়ে ।
ওদের বলে দিয়ে
বাবু
চতুর
বিপ্লব-খুনি
বিশ্বাসঘাতকদের
মুখ আমি চিনে রেখেছি ।

প্রতিজ্ঞা করছি
ফিরে গিয়ে
শোনাব
তোমার বুকের জ্বালা
আর বলব
জঙ্গলকে তোমরা
ভাঙতে পারনি
সে মরেনি ।
হিমালয়ে ফিরে গিয়ে
বিচরণ করে
সগৌরবে
নিজ মহিমায়
নিজ কর্তৃত্বে
সেখানে
তোমরা
বড় অসহায়

কাপুরুষ !
সাহস থাকে তো
যাও না একবার জুলুক ?
দেখে এসো
জঙ্গলের ছায়া
শুনে এসো তার গর্জন ।
একবার পরে
ধুতি
পাঞ্জাবি
বদলানো বিপ্লবী ।
কূটবুদ্ধির কচ্কচানি
প্রতিবার
ঢেলে সাজানোর বুজরুকি
ঘরে বসে
তড়পড়ানি
জঙ্গলের কাছে যাওয়ার
বুকের পাটা নেই ।
তাই
একদিন
টেপ
শোনাব ।
বসে থাকো
আতঙ্কে ।

৮ই জুন, ১৯৯৭
সণ্টলেক সিটি, কলকাতা-৯১

[নকশাল বাড়ি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক জঙ্গল সাঁওতালের জীবনাবসানের (ডিসেম্বর, ১৯৮৮) পর বেশ কয়েকটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয় এবং বি-সংবাদ ২৬শে জানুয়ারী ২০০০ সালে পরিমার্জিত সংস্করণে সণ্টলেক নিবাসী উপেন বিশ্বাসের কবিতাটি মুদ্রিত হয় । উপরোক্ত কবি বর্তমানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য ড. উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস]

বিনোদিনী - দাসী নয়, দেবীও নয় - আমাদের মা

সংযুক্তা ঘোষ

‘জানি কিন্তু বলব না’, অধ্যক্ষ হেরস্বচন্দ্র মৈত্রের (১৮৫৭-১৯৩৮) এই বিখ্যাত বেহুদা উক্তির সঙ্গে জড়িত গল্পটি ছেলেবেলায় আমাদের কৌতুকের বিষয় ছিল। কলকাতায় নবাগত এক নাট্যমোদী পথের মোড়ে হেরস্বচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে স্টার থিয়েটার কোন্ দিকে তিনি তা জানেন কিনা। রঙ্গালয় বিদ্রোহী ব্রাহ্মনেতা হেরস্বচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, ‘না, জানি না।’ তারপর সেই পথিক কিছুটা পথ চলে যাবার পর তাঁর খেয়াল হয় যে তিনি উচিত উত্তর দিয়ে থাকলেও ঠিক সত্যকথা বলেন নি। খেয়াল হওয়া মাত্র তিনি আগন্তুককে উচ্চস্বরে ডাকেন এবং উক্ত পথিক কাছ এলে জোর গলায় ঘোষণা করেন, ‘জানি, কিন্তু বলব না’। তারপর হতভম্ব প্রশ্নকর্তাকে মুখ খোলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

তিনকড়ি, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী উজ্জ্বল তিনটি নাম আমার বিশেষ পরিচিত ছিল না। আবার একেবারে অজানাও নয়। বেশ কয়েকবছর আগে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে আমারই সহপাঠী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লাইন আমার খাতায় লিখে দেয়—

‘অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়়াও, মানুষের জীবনকে তুমি যত জানবে অভিনেত্রী হিসেবে তুমি তত বড় হতে পারবে।’

এই লাইনটা আমাকে বেশ তাড়া করে ফেরে আর সেই তাড়া খেয়েই নন্দন চত্তরে আয়োজিত পুরনো বই মেলায় আমার অবাধ বিচরণ। তেমনি একটা স্টলে এই বই সেই বই ঘাটতে ঘাটতে হাতে উঠে এল তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী।

ভূমিকার ছোট অংশটি মুহূর্তে গোগ্রাসে গিলে ফেললাম আমি। এ-পাতা ও-পাতা নেড়ে বুঝলাম বইটি পড়লে জানার পরিধি বেশ বাড়বে। তাই দেরী না করে কিনেও ফেললাম।

রাতের বাড়বাড়ন্তে পিঠে বই-এর বোঝা আর সাইকেল নিয়ে বাউরিয়ার ঐন্দো গলি ঘুপচি দিয়ে ঠান্ডা দৃষ্টি আর চাপা ভয়কে বুকে নিয়ে রোজ বাড়ি ফেরা।

পিঠে আমার বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, কেতকী দত্ত, রেবা রায়চৌধুরী,

তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কেয়া চক্রবর্তী, আর সামনে অন্ধকার রাস্তা। যাই হোক, কিছুটা উইয়ে খাওয়া, কিছুটা মানুষে ছেঁড়া, ভাঙা, হলুদ পাতাগুলোতে উঠে আসে এক-একটা জীবন্ত ইতিহাস।

আমি যেন হাত রাখি ছেঁড়া পাতায়
আর কে যেন হাত রাখে আমার পিঠে।

আমি তাকে পারি না এড়াতে তাই অনেকটা আবেগে আর কিছুটা উত্তরাধিকারের দায়বদ্ধতায় গবেষণার বিষয়ে ছেপে দিই এদের মুখ। কিন্তু তাও যেন অস্থিরতা কমে না। আসলে যা বলার কথা এম্মুনি বলার কথা তা বলা হচ্ছিল না। আমার দেৱী হয়ে যাচ্ছিল, বড্ড দেৱী।

ভয় হচ্ছিল যে বই-এর আর মুদ্রণ হয় না যে বই লাইব্রেরীর অতল অন্ধকারে পড়ে পড়ে উইয়ে কাটছে তা কি কালের অন্ধকারে এ ভাবেই তলিয়ে যাবে? কোন চেষ্টাই কি হবে না!

একদিন আমার স্কুলের বাগানে পায়চারি করার সময় একটা ফোন আসে— পরিচিত গলার যুবক আমাকে জানায় চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা একটা ডকুমেন্ট্রি করতে চাইছে বিনোদিনীকে নিয়ে, যেহেতু বিনোদিনীর ১৫০ বছর পূর্তি চলছে। মনে মনে বড় আনন্দ পেলাম; আবার এটাও ভাবলাম হয়রে মানুষ! ইতিহাসকে ১৫০টা বছর অপেক্ষা করতে হল।

ধন্যবাদ চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বন্ধুবর তথাগত চৌধুরীকে এ কাজের সুযোগ করে দেবার জন্য। এবং সঞ্জীব খান ও জয়দীপ মন্ডলকে অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের ভাবনাকে ক্যামেরায় বন্দি করার জন্য। বারে যাওয়া পাতা আর হারিয়ে যাওয়া সময়গুলির উদ্দেশ্যে এই আমাদের প্রথম হাত বাড়ানো।

নটি বিনোদিনী রচিত আত্মকথন মূলক বই ‘আমার কথা’ যা কালের গর্ভে তলিয়ে যেতে বসেছে। সেই বই উন্টেপাল্টে তৈরি হল চিত্রনাট্য। এত সহজ বয়ান সমগ্র লেখায় আর এতই মর্মস্পর্শী জীবন ইতিহাস যে একসময় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল কোনটা রাখব আর কতটা রাখব এটা নির্বাচন করতে।

সচেতনভাবেই সমগ্র নির্মাণে বিনোদিনীর লেখার সারল্যের সাথে সই পাতিয়ে সমগ্র নির্মাণে আমরাও সহজ পরিবেশনার সাহায্য নিয়েছি। যদি কোথাও সেটা উচ্চ আলঙ্কারিক পর্যায়ে পৌঁছয় তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শ্রীমতি বিনোদিনীর রচিত পুস্তক -

‘আমার কথা’র।

বিনোদিনীর জীবনের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কে রেখেও আমরা চেয়েছিলাম বর্তমান সময়কে থিয়েটারের বর্তমান চলনকে এবং সর্বোপরি পরিবর্তিত সময়ে সমাজে মহিলাদের অবস্থানকে তুলে ধরতে।

বিজ্ঞাপনের রমরমা বাজারে যেখানে নারীকে পণ্য করে চলে প্রচার এবং প্রসার সেখানে নিবাসিতপ্রায় থিয়েটারের অভিনেত্রীদের জীবনে কি পেয়েছি, কি পাচ্ছি, কি বা পাব আমি জানিনা, তবে আমার মত মেয়ের কাছে আপনারাই আকাশ। আপনারাই আমার সামনে জন্ম-জন্মান্তরের দরজা খুলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বিনোদিনী নয়, আমাদের এই নির্মাণ থিয়েটারের সকল অভিনেত্রীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য।



জন্ম : ১৮৬২ মৃত্যু : ১৯৪১

বাঙলার কাব্য : হুমায়ুন কবিরের ব্যতিক্রমী প্রয়াস

বুলবুল আহমেদ

যে কোনও ভাষায় রচিত সাহিত্য সময় ও সমাজ নিরপেক্ষ নয়। বরং এসবের মধ্যেই নিহিত থাকে তার সমস্যা ও সম্ভাবনা। একথা সমান সত্য আমাদের বাংলা ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। অথচ বাংলার সাহিত্য আলোচনায় এই সামাজিক দিকগুলি তেমনভাবে আসেনি বললেই চলে। ঠিক এই রকম একটি কাজের সূচনা হয়েছিল হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) রচিত ‘বাংলার কাব্য’ (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) গ্রন্থে। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে জীবন ও কবিতার বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে, সময় আড়ালে থেকে সব চালনা করে। হুমায়ুন কবিরের এই গ্রন্থটিতে সাহিত্যের ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের এক অভিনব প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার এক কাব্য-ইতিহাস রচনায় তিনি পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছেন। আবার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বলতে অনেক সময়ই মনে করা হয় রাজা-রাজড়ার ইতিকথা। এখানে তিনি তা করেননি। তাঁর চেষ্টা অন্য ধারার। বাংলা ভাষায় তার উদাহরণ নেই বলা চলে। একটা সময় পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যের মান্য সব ইতিহাসকাররাও সাহিত্যের যুগলক্ষণ ও বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ করেছেন রাজবংশের ক্রম অনুসরণে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও মূলত এগিয়েছেন এই একই পথে। তবে হুমায়ুন কবিরের ‘বাংলার কাব্য’ যখন লেখা হয় তখনও সামাজিক প্রেক্ষিতে বাংলাভাষার কাব্যধারার বিকাশের পরিপূর্ণ পরিচয় দেবার সময় আসেনি। আজ ভাবতে অবাক লাগে ট্রেভেলিয়ানের ‘সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড’ (১৯৪৪) প্রকাশের আগেই ‘বাংলার কাব্য’ প্রকাশিত হয়। আমরা দেখব, এই গ্রন্থ কেন আমাদের মনোযোগ দাবি করে, এই সময়েও।

॥ ২ ॥

হুমায়ুন কবির ছিলেন সাহিত্য ও দর্শনের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। পরে কৃতি শিক্ষক ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দীর্ঘ সময়ের পর্ব জুড়ে প্রগতিনিষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থাপক হন ভারত রাষ্ট্রের। লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজিতে। তাঁর সমসাময়ের বাংলার মনীষীদের অন্যতম। ব্যক্তি জীবনে যেমন ছিল তার প্রচুর অভিজ্ঞতা, তেমনি বিশ্লেষণে মানবিক

বোধ। বাংলার কাব্যচর্চার ধারায় বাঙালি মানসের একটা বিশেষ প্যাটার্ন খোঁজার প্রয়াস তাঁর। খোঁজ রাখেন যারা তারা জানেন, এই লেখকের সাহিত্যিক সংবেদনা ও অনুশীলন ছিল প্রবাদ প্রতীম। দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এষণা বিস্ময়কর। বাংলার জটিল অথচ ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন চিন্তাশীল বাঙালি মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য।

মানুষের ইতিহাস সময় চেতন দার্শনিকের মনে প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে প্রাচীন কাল থেকেই। সে ইতিহাস হতে পারে বিচ্ছিন্ন ভাবে সমাজের, ধর্মের, সাহিত্যের, শিল্পের, অর্থনীতির বা সামগ্রিকভাবে সংযুক্ত মানব সভ্যতার। গ্রীক দার্শনিকরা বুঝেছিলেন যে, নদীর সব চূর্ণিত তরঙ্গগুলি স্বতন্ত্র নয় - এক নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের অংশ মাত্র। তারা রয়েছে Time and space - এর শাসনে। আমাদের দেশে উপনিষদকারও মহাকালের অনতিক্রমণীয়তার কথা বলেছেন এবং কালকেই জ্ঞান করেছেন জগৎনিয়ন্তা হিসেবে। মানুষ চেয়েছে ইতিহাসের একটা প্যাটার্ন খুঁজতে। ইবনে খালদুন, কলহন, মার্কস, টয়েনবিও ঘটনা সমাবেশের একটা অন্তর্লীন ঐক্যের সন্ধান করেছেন। সাহিত্যে এই বিশেষ প্যাটার্ন বা প্রবণতার খোঁজ যা সমাজজনকে বুঝতে সহায়তা করবে সেখানে বাংলা ভাষায় হুমায়ুন কবির প্রথম অভিযাত্রীর সম্মান পাবেন।

বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক নীতির নিদর্শন খুঁজতে যোভাবে সমাজ বীক্ষণ করেছেন সেগুলি হল —

১। ‘সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার কাব্যধারার বিকাশের’ পরিচয় দেওয়া যাতে সম্ভব নয়, তার একটা পশ্চাদপদ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

২। ‘সেই পশ্চাদপটের অভাবে বাংলার কাব্যে বাঙালির মানসের বিকাশ পুরোপুরিভাবে বোঝা যায়না, কারণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজ মনের প্রকাশেই কাব্যের জন্ম।’

৩। ‘সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে’ বাংলা কাব্যের ইতিহাস কেমন হওয়া উচিত, সে কাজ কতটা বিস্তৃত, কত শ্রম সাধ্য, তার গবেষণার ভিত্তি এমন কি সে - ইতিহাসের মালমশলা কতটা পাওয়া সম্ভব তা লেখক জানেন।

৪। বৃটিশ রাজের এ দেশ ছেড়ে যাবার সময় বাঙলা আর অখন্ড থাকল না সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু বাংলা ভাষার রচিত সাহিত্য ‘রাষ্ট্রবিভাগের বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে বাঙালির কাব্য সাধনায় ঐক্য ও ধারাবাহিকতা’ বহন করেছে। হুমায়ুন কবির তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বাঙলা সাহিত্যের সকল অনুধাবকেই বাংলার সম স্ত আঞ্চলিক লেখা সমন্বিত

করে একটা সমগ্র মানসের অনুসন্ধান করতে হবে, সে - মানস একই বাঙালি-মানস। হোক না তাতে হিন্দু মুসলিম, উচ্চ বর্ণ ও পতিত জাতি, পদ্মার এপার এবং ওপার বিবিধ এভেদের একাশ। এখানে আমরা উভয় বাঙলার চি শাশীল ও এশ স্মনা সব মানুষের বিদাস ও আশার এতিশ্বনি ধরা পড়ে।

হুমায়ুন কবির বাঙালির মানস - গঠনে ভৌগোলিক ও জনধারার বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেছেন সাহিত্য মূল্যায়নের সময়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে যেখানে বাঙালি নদীভাঙন ও বাড়বাঙ্গার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীল, তারাই আবার রক্তের উত্তরাধিকারী হিহেসবে নিগ্রয়েড, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় সুলভ অহিংস ও পরমত সহিষ্ণু। পরিবেশগত এই বিশিষ্টতার কারণে পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ। নৃতাত্ত্বিক অনন্য তার জন্য সেখানকার বাঙালিদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হয়েছিল সমধিক এবং একই সামাজিক কারণে সমগ্র বঙ্গে আর্থপ্রভাব বিস্তৃত হবার অবকাশ পেয়েছে সবচেয়ে কম। হুমায়ুন কবির দেখিয়েছেন, পশ্চিমবাংলার প্রকৃতি তাই বাঙালির কবি মানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত এক রহস্যের আভাস। আর এই ‘অনির্বচনীয়ের আশ্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রতাপী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।’ সঙ্গত কারণেই বাংলার এই অংশে বৈষ্ণব কবিতার ও বাউল গানের বেশি উদ্ভব হতে দেখা যায়। প্রকৃতিই তৈরি করেছে সমাজ মানসের সামগ্রিক যুক্তি গ্রাহ্য কাঠামোটা। সৃজন কর্মে সে মনের ছায়া পড়েছে অনিবার্যভাবে। এ প্রভাব অনতিক্রম্য। ‘ধর্মের প্রভাব বাঙালির কাব্যে চিরদিন প্রবল’ — এ কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন লেখক এবং বাঙলার কাব্য-কথার সৃজন-প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার সময় তাকে গুরুত্ব দিতে সংকোচ করেননি। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ গান ও দোহা। বাংলার এই সাহিত্য প্রয়াসের রচনাকার ছিলেন সকলেই বৌদ্ধ। আর একথা মনে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন যে, বাংলার বৌদ্ধ বিপ্লব যে কেবলমাত্র ধর্মবিপ্লব ছিল না, উত্তর ভারতের আর্থ সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ছিল এবং তার ফলে তা শুধু সমাজ ও রাজনীতিকেই স্পর্শ করেনি, বরং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের প্রভাব সচেতন চেষ্টায় কমিয়ে দেশজ ভাষার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এই দোহা গুলিকে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির তথাকথিত আভিজাত্য ও আধিপত্য-মনস্কতার বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙালির প্রথম বিদ্রোহ হিসেবে দেখে হুমায়ুন কবির মন্তব্য করেছেন, ‘বৌদ্ধ দোহার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ভাষা। দেশজ ভাষায়ও যে কাব্য সৃষ্টি হতে পারে, এই বিশ্বয়কর আবিষ্কার বৌদ্ধ দোহার শুদ্ধ নীতি ভাষণকে কাব্যের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।’ সংস্কৃত সাহিত্য যদি হয় সমাজের অভিজাতবর্গের সাহিত্য, তবে এই সব দোহার কারবার ‘ধনিক বণিক শ্রমণ ভিক্ষু এমন কি সাধারণ মানুষকে নিয়েও।’ লেখক লক্ষ করেন,

সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য যে সাময়িক প্রসারের প্রয়োজন, তা মিলল না বলে সে যুগের বৌদ্ধ দোহাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রচেষ্টা বলে স্মরণীয় হয়ে রইল বটে, কিন্তু প্রথম সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারল না।’ সামূহিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বৈরিতাই এক পরিণতি না পাবার প্রধানতম কারণ। আর আমরা ভুলতে পারি না যে, শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচতে দোহাকারদের নিজভূমি থেকে নিদারুণ ভাবে উৎখাত হতে হয়। নবজাগরিত হিন্দু জাগরণবাদের শিকার হয় বাংলার এই বৌদ্ধ ভূমিপুত্রদের। তার সাথে মৃত্যু ঘটে বাংলা ভাষার আদিপর্বের এক স্বপ্ন সম্ভাবনার। তিনি সঙ্গত কারণেই ভেবেছেন, ‘বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক কাব্য সৃষ্টি বৈষ্ণব কবিতা।’

আর এই বৈষ্ণব কবিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণা এসেছিল যে গৌড়ীয় উদার বৈষ্ণব ধর্মমত ও ভাব আন্দোলন থেকে, তার মূলে ইসলামের মানবতান্ত্রিক প্রভাবকে হুমায়ুন কবির বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন। অন্য মত থাকতে পারে জেনেও তিনি স্বজ্ঞান ঝুঁকি নিয়েই বলেছেন, ‘হিন্দু ও মুসলমানের বিপরীত ধর্মী দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে হিন্দুর সমাজ মনে, তার ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শনে যে সাড়া জাগাল, তারই ফলে বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি।’ বাংলায় এক দীর্ঘ সময় পরিধি জুড়ে যে সংস্কারমণ্ডা বৌদ্ধ বিপ্লবের কারণে যে জমি তৈরি হয়েছিল তার উপরেই বিস্তার সম্ভব হয় ইসলামের প্রভাব — বিশেষ করে তার প্রবল ইহজাগতিকতা ও সাম্যবাদ। ধর্মী ধনে নির্ধনের অধিকার রয়েছে — ইসলামের এই পরম স্বীকৃতির মধ্যেই তো নিহিত থাকলো সাম্যবাদের প্রধানতম পূর্বশর্ত। আর মানুষকে এই মর্যাদা দানের কারণে হিন্দুমানসের তৎকালীন প্রবল মায়াবাদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবে কেবল সংঘাতই নয়, মিলনও যে ঘটেছিল তা বিস্মৃত হননি লেখক। বৈষ্ণব কবিতায় তাই সক্রিয় মনোভাব ও নিষ্ক্রিয় মায়াবাদের অপূর্ব সমন্বয়।’

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি রয়েছে ইসলাম ধর্মের বহমান ধারায়, আবার বৈষ্ণব কবির মরমী কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে মানুষের প্রাপ্য মর্যাদার চিরায়ত বন্দনা। হুমায়ুন কবিরের বিশ্লেষণঃ

‘ইসলাম প্রবলভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে, বলেছে সৃষ্টির সমস্ত প্রদেশেই তার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব কবির কণ্ঠেও তার প্রতিধ্বনি বেজেছে। তাই সবার উপরে যে মানুষ সত্য সে কথা বলতে বৈষ্ণব কবির মনে কোনো দ্বিধা আসেনি। অথচ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস মায়াবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাসের বিরোধী। বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোড়নেও ব্যক্তির সত্তা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এত প্রবলভাবে পূর্বে কোনদিন ঘোষিত হয়নি।’

আমরা দেখেছি মধ্যযুগের পূর্বে ভারতবর্ষের ঐয় সম স সাহিত্যই তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের রচনা। বাংলা ভাষার বৈষ ব পদাবলিতেই এথম ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের কবিরও সা াৎ পাওয়া গেল। এযেন বাংলার আত্মারই অন্য এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নিম্নবর্ণের সুবর্ণ বণিত কবি যেমন বৈষ ব পদ রচনা করেচেন তেমনই রচনা কাজে সামিল হয়েছেন অনেক মুসলমান কবিও।

॥ ৩ ॥

সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণ ইসলামে এই সময়ের তুলনায় এগিয়ে তাকা মূল্যবোধ মধ্যযুগে বাংলার বৈষব কবিদের করে তুলেছিল প্রত্যয়শীল মানবতাবাদী। চৈতন্যদেবের ধর্মীয় দর্শনের প্রধান ভিত্তিই মানবতাবাদ। আরাধ্য দেবতা ও ভক্তের মাঝখানে কোনও সহায়কজনের অস্তিত্ব প্রবলভাবে অস্বীকার করা — আন্তরিক ভক্তি নিবেদনই পরস্পরকে নিকটবর্তী করবে। পুরোহিত তন্ত্রের স্বার্থের একান্তই পরিপন্থি ছিল এই মতবাদ সে সময়। তার করুন শেষ পরিণতি নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ হয়নি। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, ইসলামও প্রবলভাবে পুরোহিতের মধ্যবর্তিতা ত্যাগ করেছে। এই অনুযুগে বৈষব মতের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকাটা দূর কল্পনা নয়। আর এই বৈষবধর্মের মানবতাবাদের আন্তঃ প্রেরণায় কবি চন্ডীদাস ঘোষণা করেন :

‘শুন হ মানুষ ভাই।

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।।’

চৈতন্যদেবের দর্শন ও মানব প্রেমের ভক্তিবাহী বাংলায় যে সামাজিক জাগরণের প্রবল হাওয়া এনেছিল তার মূলে ছিল ইসলামি সাম্য নীতি ও মানবতাবাদ। হুমায়ুন কবির তাঁর আলোচনায় বাংলার সমাজ-মানসের এই ত্রাণ্তিকালীন আলোড়ন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও আগামী গবেষণার ও ব্যাখ্যার ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর অগ্নায়তন অথচ দিকদর্শী আলোচনায়।

বাংলার ইতিহাসের মধ্যপর্বে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পুরাণের অনুবাদের প্রেরণাতেও ইসলামের প্রভাব কাজ করেছে বলে হুমায়ুন কবির মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে মানব সভ্যতার ইতিহাসের একটা বিরাট সময় জুড়ে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-দর্শন-শিল্প-স্থাপত্যবিদ্যার চর্চার সহায়ক হয়েছে। গ্রীক জ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যকে চরম অবলুপ্তির হাত রক্ষা করেছে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আর সে বিদ্যা তাদের হাত ধরে পৌঁছেছে ইউরোপে। তারপর কেটেছে কেটেছে সেখানকার অন্ধ মানসিকতা। ইসলামের অনুসারীরাই ছিল তখনকার সভ্য বিশ্বের

নিয়ামক।

বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পুরাণের অনুবাদে হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আগ্রহী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কবির লিখছেন :

‘একদিকে পাঠান সুলতান বাংলাকেই স্বদেশ মনে করে তার চিন্ত জয় করতে উন্মুখ, অন্যদিকে সেদিনকার হিন্দু চিন্তানয়ক ইসলামের বিপুল সংহতি শক্তির আঘাতের সম্মুখে হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত। একদিকে মুসলমান রাজা সেদিন চেয়েছেন যে বাংলায় হিন্দুর পরিচয় চাই, অন্যদিকে হিন্দু সমাজপতি চেষ্টা করেছেন যে জন সাধারণ যে আত্ম বিস্মৃতির দরুণ বা আত্ম-পরিচয়ের অভাবে ইসলামের বিজয় প্লাবনে ভেসে না যায়। এই যুদ্ধদাবি মেটাবার জন্য সেদিন বাংলা রামায়ণ মহাভারত সৃষ্টি। মুসলিম রাজসভায় তার শুরু, কিন্তু বাংলার বিপুল হিন্দু সমাজের মধ্যে তার পরিব্যাপ্তি। সেদিন কৃত্তিবাস ওঝা এবং কাশীরাম দাস কেবলমাত্র রামায়ণ মানসের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা করে রামায়ণের ও মহাভারতের এক নতুন বঙ্গীয় রূপ সৃষ্টি করেছেন।’

আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু মানসের কাছে বৈষণ্য কবিতা বা রামায়ণ-মহাভারতের ধর্ম ভাবটাই প্রধান, সাংসারিক-সামাজিক জীবন ব্যাখ্যা গৌণ ব্যাপার। কিন্তু মুলমান সুলতান ধর্মভাব নয়, আকৃষ্ট হয়েছেন ওইসব কাব্য-আখ্যানের সামাজিক-প্রাত্যহিক যাপনের অনুষঙ্গের প্রতি। সমাজ মানসকে বুঝতে তারা প্রজা সাধারণের অন্তরের ধন রামায়ণ-মহাভারতের প্রচলিত গল্পকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মাধ্যমেই তাঁরা পেতে চেয়েছিলেন এই ভূ-খন্ডবাসীর মানস-প্রবণতার একটা আন্তরিক পরিচয়।

ধর্মীয় পরিমন্ডল অতিক্রম করে মুসলিম কবিদের রচিত প্রণয়, কাব্য সমূহে প্রকাশিত হয়েছে মূলত সামাজিক সাধারণ মানুষের জাগতিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সাহস ও সংগ্রামের এক অবিমিশ্র অনুভূতি।

আর হুমায়ুন কবীরের আলোকপাত এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে :

বৌদ্ধ বিপ্লবের যে সাম্যবাদ পূর্ব-বাংলায় সজ্জাগত, মুসলিম বিজয়ে তা আরো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল, এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠল নতুন আত্মপ্রত্যয়, নতুন ব্যক্তিহ্রবোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। আরাকানের

রাজসভায় তাই বাংলার সামাজিক কবিতার পত্তন, এবং পরবর্তী যুগে ময়মন সিংহ, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের গীতিকার মধ্য দিয়ে তা সমাজ সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার ফলে যে আমরা কেবলমাত্র কাব্য রচনায় নতুন ধারার পরিচয় পাই তা নয়, — পুরনো রীতির জীর্ণ খাদেও তার প্রভাবে নতুন ঢঙের জোয়ার নেমেছিল।’

আমরা দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম বিজয়ের সবচেয়ে বড়ো প্রভাব পড়েছে পল্লি কবিতার ক্ষেত্রে। এই বিজয়ের অব্যবহিত পরের থেকে মানুষই হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্যের প্রধান উপজীব্য। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে মুখর বাংলার পল্লি-কবিতা। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরকে বলতে শুনি —

‘মুসলিম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লি-কবিতার ক্ষেত্রে। ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টি টানেনি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও অভিজাতের সংকীর্ণ গন্ডী পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে কাব্যে উপাদান খুঁজেছে। ফুল্লরার বারমাসী বা খুল্লনার দুঃখ-কাহিনীর মধ্যে এই অন্তরঙ্গ সুখ-দুঃখের পরিচয় মেলে, কিন্তু মানবধর্মী এ রচনার পরাকাষ্ঠা ও যাত্রার মধ্য দিয়ে তারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে, চাষির জীবনের দুঃখ-সুখ, আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছে।’ আবার মুসলিম শাসনের ভাঙনের দিনে, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মন্দার ফলে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে এক অপরিমোচনীয় অবসাদ ও ক্লান্তি, বিপন্নতা ও বিকৃতি। তবে এক্ষেত্রে, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক সংখ্যক জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। দেবতা নয়, প্রত্যক্ষ মানুষকে নিয়ে কাব্য রচনার এটাই প্রথম প্রয়াস।

শুধু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার কাব্যধারার বিকাশের পরিচয় দেননি হুমায়ুন কবির তাঁর এই আলোচনায়। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ তত্ত্বের আচস কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার বহুমান দার্শনিক সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই জানাতে পেরেছেন —

‘মানুষের অধিকার না পেয়েও মানুষ তৃপ্ত থাকবে, এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হল, সে প্রশ্নের উত্তর সন্ন্যাস মনোবৃত্তির প্রবলতার মধ্যেই মেলে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মুসলমান যেমন আখেরাতের লোভে তার ইহকালকে বিসর্জন দিয়েও তৃপ্ত হয়েছে, হিন্দু ভারতেও তেমনিভাবে জীবনের নশ্বরতার বিবেচনায় জীবনের সমস্ত অসাম্যও অত্যাচারের তীব্রতা অবসন্ন হয়ে এসেছে। সেদিন বিশেষ করে এই কথাই বলা হয়েছে যে, প্রতি মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের সত্তা নিহিত, এবং সে ব্রহ্ম স্থান কালাতীত পারমার্থিক সত্য। বিনা প্রশ্নে একথা মেনে নেবার ফলে ব্যবহারিক জীবনে মানুষের

হাতে মানুষের অপমানকেও মায়া বলে উপেক্ষা করা হিন্দু ভারতে সম্ভব হয়েছিল।’

॥ ৪ ॥

ইতিহাসের এই ভাঙাগড়া চলেছে সর্বদাই। এবং তা নির্ধারণ করেছে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন। মানুষ সেদিন অমর্যাদার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ধর্ম বদল করেছে কিন্তু সে বদলের অনুপাতে জীবন দৃষ্টি র বদল ঘটেনি। ফলে ইংরেজ শাসনের এতিয় বাংলায় মুসলিম নাগরিক সংস্কৃতিও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ইংরেজের সাথে সংঘর্ষে পরাজিত মুসলমান অভিজাতরা গ্রামের দিকে পালিয়েছে বাঁচার জন্য। পলায়নী ও নিষ্টিয় মনোবৃত্তির কারণে আর্থিক সচ্ছলতা তো হারালই এবং জীবন সংগ্রাম থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তখন পূর্বকালের গৌরবের স্মৃতি ও পরকালের অলীক আশা হয়ে উঠল তার একমাত্র সম্বল। আরো বাংলার মুসলমান সমাজে যে অন্ধ-আচার-নিষ্ঠা, গোঁড়ামি ও পরলোক মুখাপেক্ষিতার পরিচয় মেলে, সে মনোবৃত্তি সেদিনের পরাজয়ের মানসিক অবসাদ ও দৈন্যেরই দূর-সারী ফল। এবং তাদের সৃষ্টি সাহিত্যে সে দীনতার এতিফলন আজও অত্যন্ত একট। হিন্দু সমাজ যত দ্রুত পাশ্চাত্য এভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল, মুসলমান তা পারেনি। এই অপারগতা বাংলার মুসলমানদের জীবন যে ভাবে বিশ্বাস করেছে, অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। আর মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যখন অভ্যুদয়, তখন হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের লভ্য সকল সুখ-সুবিধা আত্মসাৎ করেছে এবং বাংলার সমাজ-সত্তাকেও নিজ শ্রেণী মানসের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরাজয়ের দাগা হিন্দু মনে তেমন লাগেনি। ইংরেজের সাহচর্যে তাদের মধ্যে পলায়নীভাবে বদলে গ্রহণী মনোবৃত্তিই বেশি স্পষ্ট তর হয়েছে। এবং সৃষ্টি সাহিত্যে যে ছবি এতিভাত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বাংলায় সাত-আটশো বছরের বেশি সময় ধরে পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু সাহিত্যিকের লেখায় মুসলমানদের কথা থাকে না। একটা ট্রজিক নীরবতা অস্পর্গত চেতনার মধ্যে কাজ করে। আজও তার শাপমুক্তি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

ইংরেজি সাহিত্য, ইংরেজের দর্শন, ইংরেজের বিজ্ঞান আমাদের সেদিন মুগ্ধ করেছে। সেদিন ইংরেজ রচিত ভারত ইতিহাসও বাংলার গরিষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ অদ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছে। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ইতিহাসের যে বিকৃতি, আজ তা খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আর আমরা জানি, সম্প্রসারণশীল ধনতন্ত্রের তাগিদে ইংরেজরা এদেশে এসেছে, নিছক পরোপকার বা অন্ধকার ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য ইংরেজ এ দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করেনি। খুব

কম লোকের বোধে তা ধরা পড়েছে। কেউ কেউ সেদিন ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে বিধাতার আর্শীবাদ মনে করে তার মধ্যে মুক্তির সম্ভান করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে যাঁরা সেদিন বুঝেছিলেন তাদের মধ্যেও আবেগ ও সংস্কার কম ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্রের রচনার মধ্যে একটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। বঙ্কিমের অনন্য সাধারণ প্রতিভা তার কারণ হতে পারে। তাঁর সৃষ্ট কথা সাহিত্যে তিনি ইংরেজ আগমনের মধ্যে ঈশ্বরের কল্যাণ হস্ত দেখতে পেয়েছেন। হুমায়ুন কবির বলেছেন —

বাঁ মের উপন্যাস বাংলার কাব্যের ইতিহাসের অঙ্গ নয়, কিন্তু তার মধ্যে যে মনোবৃত্তির বিকাশ, সে যুগের কাব্যেও তারই পরিচয় মেলে। ইংরেজভক্তি বহুত্রে এ আসক্তি তে রূপা স্মরিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবনকে উপে করে দ্বন্দ্ব সংঘাতকে বড় করে তোলা হয়েছে, বহুত্রে এ মুসলমান রাজশক্তি র বিদ্ধে বিদ্রোহকে মুসলমানের এতি বিদ্রোহ বলে গণনা করার মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে। বর্তমানের গনিকে অস্বীকার করবার মোহে অনেকেই অতীতকে অত্যাধিক রঙীন করে দেখেছে। এক কথায়, এতিনি য়ায় এতি ত বলে বাঁ ম যুগের স্বাভাবিকতা ও তাই নেতিধর্মী। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মোহে বিহ্বল মধ্যবিত্তমানস সেদিন বিশ্ব স মুসলিম রাজশক্তি কে আত্র মনের মধ্যেই স্বাভাবিকতার পরিচয় খুঁজেছে, স্বাধীনতার আসল মর্ম বোঝেনি।

।। ৫ ।।

ইংরেজ শাসকদের তিনটি সিদ্ধান্ত বাংলা তথা ভারত ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮২০ সালে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং ১৮৩৫ সালের রাজ ভাষার আকস্মিক পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য করেছেন :

“বাংলার জাতীয় জীবনে এ তিনটি ব্যবস্থা যে কি দূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছে, এতদিনেও তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি আমাদের হয়নি। দেশের শিল্প-বানিজ্য ধ্বংস এবং ভূমি ব্যবস্থার আধূল পরিবর্তন, ইংরেজ রাজশক্তির মুখাপেক্ষি ও স্থিতিশীল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি, শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে নতুন শ্রেণিভেদের গোড়াপত্তন, বাঙালির সাহস, উদ্যম এবং সৃজনীশক্তির হানি ও বাংলার পল্লিসভ্যতার বিনাশ প্রভৃতি নানা দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালির যে ক্ষতি করেছে, আজ এতদিনে আমরা সে সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করেছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই বিপুল ক্ষতির বদলে জমার কোটায় রয়েছে বাংলার আধুনিক সাহিত্য। আজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বাংলার বর্তমান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই এত দ্রুত গড়ে উঠেছিল,

এবং সেই দ্রুত পরিণতির ফলেই বাংলার আধুনিক সাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ।’

ইংরেজি সভ্যতা ও শক্তিকে আত্মস্থ করার প্রথম ও অনিবার্য পরিণতি রামমোহন রায়। বাঙলা কাব্যে এই অভিঘাতের ধারাবাহিকতায় মধুসূদন দত্তের আগমন। এবং এর প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন হুমায়ুন কবির। তাঁর মতে—

মাইকেল মধুসূদন বাঙলা কাব্যে যে নতুন রীতির এচলন করলেন, তার সবচেয়ে ল নীয় গুন বিদ্রোহ ও গতিবেগ। পুরোনো বিশ্বাস ও আচারকে গ্রহণ করবার মুহূর্তেও তাদের রূপ বদলে গেল নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীতে নতুন আদর্শ জন গ্রহণ করল। তাই কেবলমাত্র কাব্যরীতিতেই তিনি বি বি নন, কাব্যের বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টি ভঙ্গীতেও তিনি সমানই বি বি। ... ভারতীয় হিন্দু-মানসের আদর্শ রাম এবং তাঁর মিত্র ও সহায়ক বিভীষণ মাইকেল মধুসূদনের দৃষ্টিতে পরদেশ-আত্ম মণকারী এবং তাঁর স্বদেশদ্রোহীর সহকারী। অত্যাচারী রাবণ দেশাণ নরপতি এবং তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ আদর্শ চরিত্র মহাবীর। এ দৃষ্টি ভঙ্গী যে কি বি বকারী, আজ বাঙালির পক্ষে তা উপলব্ধি করাও কঠিন, কারণ মাইকেলের বিদ্রোহ আজ বাঙালির মানস সত্তার অস্বর্ভুত।

এতদিন পরেও হুমায়ুন কবির উচ্চারিত মন্তব্য এই সময়ের মধুসূদনের আলোচকরাও গ্রহণ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে।

আর খন্ড খন্ড সামাজিক আন্দোলনের স্রোত বাঙালির মানসিক বিকাশকে এগিয়ে দেয় অনেক দূর। এই অগ্রগমনের সার্থকতম পরিণতি আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র প্রতিভার সামগ্রিক বিকাশে। তাঁর আশ্রয়ে বাঙলা কাব্যের যে বিস্তার তা চিরকালের জন্য বিস্ময় উদ্বেক করবে। একজন ব্যক্তির সাধনায় একটি প্রান্তিক ও প্রাদেশিক ভাষা কত অল্প সময়ে তার আদিম সাজগোজ পরিত্যাগ করে একটি দীপ্তিমান বিশ্বমানের ভাষায় রূপান্তরিত ও স্বীকৃত হলো। পৃথিবীর খুব কম ভাষার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। আর বাঙালি হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বেঁচে থাকা। প্রতিভার অলৌকিক দাবী স্বীকার করে নিয়েও হুমায়ুন কবির রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের প্রধান সামাজিক সূত্রগুলোর বুদ্ধি গ্রাহ্য একটা বিশ্লেষণ তৈরি করেছেন। তিনি বলেছেন :

‘দেশের সমগ্র জীবনের সঙ্গে একাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের দূরন্ত প্রাণশক্তির উৎস। তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত প্রকাশের মূলত এইখানে। রবীন্দ্রকাব্যে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের প্রতিচ্ছবি অনেকেরই চোখে ধরা পড়েছে এবং একথা বোধ হয় সত্য যে চিন্তাশালী এবং সাবসর শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে দেখেছেন, নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের এবং আত্মস্থ অভিজ্ঞতার কেন্দ্র থেকে কল্পনার চোখে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন।

যে মানসিক নিঃসঙ্গতা ও দূরত্ব রবীন্দ্র কাব্যের একটি মূল সূর, মধ্যবিন্ত মনোবৃত্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণতি হিসেবেই তাকে বোঝা যায়।’

তঁার কীর্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, ব্যক্তিগত প্রতিভা অলৌকিক ও বিচার, বহির্ভূত। তাই যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে তার স্ফূর্তি, আমরা কেবলমাত্র তারই বিচার করতে পারি।’ কবির শুধু দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত শক্তি বহির্বাস্তবতার অভিঘাতে কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে সময়-সভ্যতার দাবিতে নবোদ্যম লাভ করেছে। রবীন্দ্রমানস গঠনে তিন ধরনের সংস্কৃতির একত্র মিলনকে হুমায়ুন কবির চিহ্নিত করেছেন — ‘প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি’, ‘মোগল আমলের ভারতবর্ষে ভারতীয় ও সারাসেনিক’ সভ্যতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ’ ও ‘ইউরোপীয় সভ্যতা’ এবং এই তিনের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক বিশ্বজনীন চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

হুমায়ুন কবিরের দৃষ্টি ছিল গভীর অথচ উদার বোধের মাত্রা ছিল অসীম, পঠনের জগৎ ছিল বহু ব্যাপ্ত, অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল ঋদ্ধ, অনুভূতি ছিল স্পর্শকাতর এবং বাঙালিত্ব ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু সকল প্রসঙ্গে তঁার প্রকাশ ছিল পরিশীলিত, পরিণতি ও সাংকেতিক। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। বাঙলা কাব্যের বিকাশের পথের মোড়ে মোড়ে যে নতুন প্রবণতার উন্মেষ, তার কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা এবং কাজ প্রয়াসের মৌল চেতনাকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বিচার ‘বাঙলার কাব্য’ গ্রন্থের মুখ্য প্রচেষ্টা। সামাজিক পশ্চাদপট বাঙলা কাব্যের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার প্রধান নিয়ামক, ‘বাঙলার কাব্য’ গ্রন্থ পাঠকের মনে এই প্রতীতিরই জন্ম দেয়। একবার অধ্যাপক অমলেন্দু বসু বলেছিলেন, ‘কোনো শিক্ষিত বাঙালি স্বেচ্ছায় এ-বই অপঠিত রাখবেন এমন মনে হয় না।’

ঋক্বেদে খুব অল্পসংখ্যক দেবীর উল্লেখ দেখা যায়। এই স্বল্পসংখ্যক বৈদিক দেবীর মধ্যে একজন হলেন সরস্বতী। অন্য দুজন প্রধান দেবী হলেন অদिति এবং উষা। তিনজনই সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অদिति হলেন সূর্যের মা। উষা হলেন সূর্যের কন্যা। আর সরস্বতী হলেন সূর্যের কন্যা আবার পত্নীও বটে।

ঋক্বেদে উল্লিখিত রয়েছে ‘অস্থিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী।’ অর্থাৎ সরস্বতী হলেন নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধবলা স্রোতস্বিনী সরস্বতী নদীর কাছে বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করতেন। ঋক্বেদের ৭মণ্ডল ৯৫ সূক্ত ৬ ঋক্-এ বলা হয়েছে, “...হে শুভ্রবর্ণা দেবী, বর্ধিত হও, স্তৃতিকারীকে অন্ন দাও। তুমি সর্বদা আমাদের স্বস্তি দিয়ে প্রতিপালন কর।” ৬ মণ্ডল ৬ সূক্ত ১৪ ঋক্-এ বলা হয়েছে, “হে সরস্বতী, তুমি আমাদের প্রচুর সম্পদে নিয়ে যাও। তুমি আমাদের গরীব-দুখি করো না। অধিক জল দ্বারা উৎপীড়িত করো না। তুমি আমাদের সখ্যতা এবং বাসগৃহ স্বীকার করো। আমরা যেন তোমার কাছ ছেড়ে কোন খারাপ জায়গায় না যাই।”

সেকালে সরস্বতী নদীর অববাহিকায় নানান যাযাবর জাতি বসবাস করতো। এদের মধ্যে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বলা যায় একাধিপত্য লাভ করে যারা আর্যভাষাগোষ্ঠী নামে পরিচিত। যুদ্ধ বিদ্যা ও হত্যা-লুণ্ঠনে তারা পারদর্শী ছিল। প্রধানত চুরি ও অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনই তাদের পেশা ছিল। এদের সমাজব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান এবং সর্বশক্তিশালী ছিল দেবতারা। ঋষি ছিল মধ্যম। আর সর্ব নিম্নে ছিল আর্য। স্বনামে ও সংখ্যায় আর্যরা বেশি হলেও তারা ঋষি ও দেবতাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য থাকতো। এমনকি তাদের স্ত্রীরাও ভোগ্য হিসেবে দেবতা বা ঋষিদের সেবা করতে বাধ্য থাকতো। আর্য-ঋষি-দেবতারা ছিলেন নিরক্ষর-কর্মবিমুখ-যুদ্ধপ্রিয়। সিদ্ধাসভ্যতার মানুষজনকে আর্যভাষাভাষির মানুষেরা অসুর নামে অবজ্ঞা করতো। অসুর সভ্যতা ছিল উন্নত নগর সভ্যতা। উন্নত কৃষিবিদ্যা ছিল তাদের সভ্যতার ভিত্তি। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে অসুরদের প্রধানও মাঠে হালচাষ করছেন, বীজ বুনছেন। এমনকি অন্যের ফসল কেটে এবং শস্য মাড়াই করে দিয়েছেন। তবে পরবর্তীকালে অসুরদের এই কৃষিকাজ আর্যরা তাঁদের নিজদের স্বার্থে গ্রহণ করেছেন। আর্য-ঋষি-দেবতারা তাদের পূজা-অর্চনা এই সরস্বতী নদীর

অববাহকায় করতেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরস্বতী শব্দটার ব্যুৎপত্তিতেই রয়েছে জলের ইঙ্গিত। সরস্ + মতুপ + স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ অর্থাৎ স্ত্রী। এই হল সরস্বতীর প্রত্যয়। সরস্ শব্দের অর্থ জল। জল ভাঙলে ‘জ’ আর ‘ল’ পাওয়া যায়। ‘জ’-এ জন্ম এবং ‘ল’-এ লয়। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে লয় সর্বত্র জীবনের জীবনদায়ী জল। এক্ষেত্রে সরস্বতীর সঙ্গে জলের সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে সরস্বতী নিঃসৃত হয়েছিলেন। পরে ব্রহ্মবৈবর্তঃ বিষ্ণুর অন্য স্ত্রী গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতী নদ বা নদী হলেন। পরবর্তীকালে সরস্বতী নদী তার গতিপথ হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, মূল সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়।

সরস শব্দের আর একটি অর্থ হল জ্যোতি। যদি এভাবে দেখা যায়: সরস = জল = অপ, তাহলে সরস্বতীর সঙ্গে সূর্য বা জ্যোতির সম্পর্ক অগ্রাহ্য করা যায় না। কেননা, বেদে অপ কথাটির অর্থ হল সোম। সোম মানে সূর্য। ঋকবেদের ৯ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৬ ঋকে সোমকে সূর্যের দুহিতা বা কন্যা বলা হয়েছে। ৯ মণ্ডল ১২ সূক্ত ৩ ঋকে সোমকে গৌরী বলা হয়। গৌরী কথার বর্তমান অর্থ গৌরবর্ণা বা দুর্গা। সুতরাং বর্তমানের সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী সরস্বতী আর দুর্গা অভিন্ন। তাই সরস্বতী হলেন সূর্যের স্ত্রী। শতপথ ব্রাহ্মণের ১২/৭/৩/১৩ নং শ্লোকে সোমকে পয়ঃ এবং ৩/৩/৪/২১ নং শ্লোকে সোমকে ‘বিষ্ণু’ বলা হয়েছে। যা বৈ বিষ্ণু সোমঃ সং—অর্থাৎ যে বিষ্ণু সেই সোম, যে সোম সেই সূর্য। সূর্যের জ্যোতি সরস্ তাই সূর্যের আর এক নাম সরস্বান। সরস্বতী নদী ঋষিদের কষ্ট কল্পনার জলদেবী এবং জ্যোতির্ময় সূর্যদেব উভয়ই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেব-দেবীর জন্ম হাস্যকরও বটে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, ইনি পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়েছিলেন। বিষ্ণুর অন্য দুই পত্নী লক্ষ্মী ও গঙ্গার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। গঙ্গা অত্যন্ত রেগে গিয়ে সরস্বতীকে নদী হওয়ার অভিশাপ দেয়। সেই থেকে সরস্বতী নদী হয়ে যায়। ইতিহাস বলে, প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে একটি বৃহৎ নদ বা নদী ছিল। ঋকবেদেও উল্লেখ আছে, সরস্বৎ। ‘সরস্বৎ’ এই শব্দের অর্থ ‘প্রচুর জলবিশিষ্ট’ নদ অথবা নদী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪/২০ নং শ্লোকে বলা আছে, এষ (আদিত্য) বৈ হংসঃ শুচিষদ অর্থাৎ সূর্য হল শুচিশুভ্র হাঁস। সেই হাঁস জলে থাকে এবং হাঁস সরস্বতীর বাহন। অর্থাৎ জলের সঙ্গে সরস্বতীর নিবিড় সম্পর্ক। সারণ এবং যাস্ক দুজনই সরস্বতীকে নদী বলে স্বীকার করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেদ বা বেদ-ব্যাখ্যার যুগে সরস্বতী বিদ্যার দেবী রূপে পূজা পেত না, আর্য-ঋষিরা সরস্বতী নামে একটি নদীকেই পূজা দিত। এখন পণ্ডিত মহলে ঘোর বিতর্ক সরস্বতীর গতিপথ ও অবস্থান নিয়ে। একাধিক সরস্বতী নামে নদী থাকায় এই বিতর্ক আরো জটিল রূপ নিয়েছে। কারো কারো মতে,

হাকরা এবং ঘগ্নর নদীই সরস্বতী নদী। একথা সত্য নয়। কেননা, এখানে যে সকল বস্তু পাওয়া গেছে সবই হরপ্পা যুগের। ঋক্বেদে সরস্বতীকে নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অবশ্যই এটা একটি বৃহৎ নদী। বারোমাসই যার জল থাকে। হাকরা অথবা ঘর-এর সঙ্গে তার চরিত্র মেলে না। বরং প্রাচীনতম সরস্বতী নদীকে আফগানিস্তানের হেলমান্ড নদীর সঙ্গে এক বলে চিহ্নিত করা যায়, যা আবেস্তায় হরখাওয়াতি নামে উল্লিখিত। ভাষাতাত্ত্বিক এবং স্থান-কালের আগে পরে বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে ঋক্বেদের সঙ্গে আবেস্তার তুলনা করলে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, আদি বৈদিক সরস্বতী আর হরখাওয়াতি বা হেলমান্ড একই নদী। আর্য-ঋষি-দেবতারা যত অগ্রসর হয়েছে তাঁরা এই সরস্বতী নামটি পাঞ্জাব-হরিয়ানা-রাজস্থান-গাড়ওয়াল-প্রয়াগ-রাজগির প্রভৃতি অঞ্চলে নিয়ে গেছে। যেমন করে ঋক্বেদের সরযু নদী, যা আবেস্তায় উল্লিখিত হরিরদ, তাই রামায়ণের কালে অযোধ্যার সরযু নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছে, বিদেশ মাধব এবং তাঁর পুরোহিত সরস্বতী অববাহিকা থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে সদানীরা পর্যন্ত আর্য সংস্কৃতি বা সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান। পরবর্তীকালের মনুসংহিতায় দেখা যায়, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ নিরাপদ স্থানে বসবাস শুরু করে। আর তাদের বাসস্থানের আশপাশের কোনও একটি নদীর নাম তাঁরা সরস্বতী দিয়ে পূর্ব স্মৃতিকে স্মরণ করেছে।

পুরাণ ঘাঁটলে দেখা যায় বিষ্ণুর তিন স্ত্রী। লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। একবার গঙ্গা অন্য দুই সতীনের সামনে বিষ্ণুকে আলিঙ্গনের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব শুনে লক্ষ্মী চুপচাপ থাকলেও সরস্বতী ক্ষেপে যায়। দুজনের মধ্যে চুলোচুলি হওয়ার উপক্রম হলে লক্ষ্মী তাঁদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। লক্ষ্মীর এই ব্যবহার সরস্বতীর পছন্দ হয় না। সে লক্ষ্মীকে গাছ হওয়ার অভিশাপ দেয়। লক্ষ্মী গাছ হয়ে যাওয়ায় গঙ্গা সরস্বতীকে নদী হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেয়। সেই থেকে সরস্বতী নদী। যেহেতু সরস্বতী নদী, সেহেতু তাঁর বাহন হাঁস। হাঁস ছাড়াও সরস্বতীর বাহন মেঘ, বরাহ এবং ময়ূর।

প্রত্নতাত্ত্বিক এন.কে. ভট্টসারির লেখায় জানা যায়, একবার ইন্দ্রের শরীরের শক্তি চলে যায়। ফলে, তিনি মেঘ রূপ ধারণ করেন। সে সময় ইন্দ্রের চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল অশ্বিনীদ্বয়ের উপর। আর সেবা শুশ্রূষার ভার ছিল সরস্বতীর হাতে। সুবী নারী সঙ্গীত প্রেমী ইন্দ্র সরস্বতীর সেবায় সুস্থ হওয়ার পর মেঘটি তাকে দান করেন। সেই থেকেই সরস্বতীর বাহন মেঘ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ‘সরস্বতী’ বইটিতে প্রমাণ সহকারে বলা হয়েছে বিষ্ণু তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সরস্বতীকে বরাহ দিয়েছিলেন। বরাহ বাহন সরস্বতী মূর্তিও পাওয়া গেছে। আবার দক্ষিণভারতে অনেক ময়ূরবাহন যুক্ত সরস্বতী দেখা গেছে। কার্তিকের স্ত্রী সরস্বতী। সেখানে কার্তিকের বাহন ময়ূর। ভালোবাসে কার্তিক

তাঁর বাহনটিকে সরস্বতীর বাহন হয়ে কাজ করার অনুমতি দেন। দক্ষিণভারত মুম্বাই প্রদেশে সরস্বতীর সাধারণত ময়ূর বাহন। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামের মতে, নদী যেখান দেবী সেখানে তার বাহনও অনুরূপ হয়। যেমন - গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার কচ্ছপ, সরস্বতীর ময়ূর। বৌদ্ধরা মঞ্জুশ্রীকে সরস্বতী বলে মানে। বৌদ্ধদের দেবী সরস্বতীর বাহন সিংহ। মথুরায় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাওয়া সরস্বতী মূর্তি থেকে জানা যায় জৈনরা সরস্বতীর পূজো-অর্চনার অনুমতি অনুমোদিত ছিল। ‘মাঘস্য শুক্লা পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনেপি চ’ এই প্রবাদ থেকে জানা যায়, শুক্লাপঞ্চমী তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, এই দিনে লক্ষ্মীর সঙ্গে স্বদের বিয়ে হয়, সেই জন্য ওই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলে। কালক্রমে মানুষ লক্ষ্মীকে সরিয়ে সরস্বতী পূজো করে।

তবে একথা সত্য, শুরু থেকে সরস্বতী নিরাকার। বৈদিক যুগে কোন দেব-দিবীর প্রতিমা বা মূর্তি ছিল না খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হীনযানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্বাঙ্গবিদী বৌদ্ধেরাই প্রথমে বুদ্ধের মূর্তি সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে আর্য-ব্রাহ্মণ্যদের দেবীদের নানারকম মূর্তি বুদ্ধদেবের মূর্তির ন্যায় গঠিত হয়। সে সময় বিষ্ণু, ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মূর্তি বানিয়ে বুদ্ধের পদতলে রাখা হত। বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাযান ধর্মমতে ‘বজ্রপানি’ নামে ইন্দ্র, ‘অবলোকিতেশ্বর’ রূপে বিষ্ণু এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জু ঘোষ নামে ব্রহ্মাকে পূজো করা হত। এই মঞ্জুশ্রীর স্ত্রীর নাম সরস্বতী। যার বাহন সিংহ।

অধুনা পূজিতা সরস্বতী আদিতো নদী ও উর্বরতা শক্তিরূপে পূজোর ভাগিদার ছিল। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে সরস্বতীর রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ডের গল্লও বেড়েছে বহু। বিদ্যার দেবী থেকে অসুরনাশিনীও বটে। ঋক্বেদের ৬ মণ্ডল ৬১ সূক্ত ও ৩ ঋক্ অনুসারে সরস্বতী দেবনিন্দো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য সস্য মায়িনঃ। বৃসয় হল ত্বষ্টার একটি নাম। তাঁর পুত্র বৃত্র। বৃত্রকে সংহার করে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আর ইন্দ্রের সঙ্গিনীরূপে সরস্বতীকে বৃসর নিধনকারিনী বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে, ঘণ্টা, শূল, লাঙল, শঙ্খ, মুসল, চক্র ধনুবান ধারিনী অষ্টভুজা সরস্বতীই শুভ-নিশুভ দৈত্যনাশিনী।

কিছু পুরাণে বলা হয়, সরস্বতী হল দুর্গার কুমারী সত্তা। এই কুমারী সরস্বতীকে এথেনার মতো কুমারী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতারাত্রে এই চিরকুমারী সরস্বতীকে স্ত্রী, সেবাদাসী হিসাবে ব্যবহার করেছে। আবার কখনও কখনও তাঁর মোহিনী রূপ-সৌন্দর্য ব্যবহার করে অসুরদের ভুলিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে প্রাগার্য সুমহান অসুর সভ্যতা। সুকুমার সেন তাঁর ‘ভারতকোষ’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বাক্

দেবতা সুন্দরী নারী রূপে অসুরদের মোহিত করিয়া দেবতাদের অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়া দিয়াছেন।’

এ প্রসঙ্গে সোম ও বাক্ বা সরস্বতীকে নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে গন্ধর্বদের ঝগড়ার বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক। সোম, যা দেবতাদের জন্য প্রয়োজন তা ছিল দিব্যধামে। আর দেবতারা সে সময়ে পৃথিবীতে অবস্থান করছে। গায়ত্রী সোম আনবার জন্য আকাশ পথে ছুটে যায়। সোম নিয়ে ফেরার পথে গন্ধর্ব বিশ্ববসু তা কেড়ে নেয়। গন্ধর্বরা নারীর প্রতি দুর্বল এই বিশ্বাসে দেবতারা সরস্বতীকে পাঠায়। গন্ধর্বদের নানান মোহিনী মোহে ভুলিয়ে সরস্বতী সোম এনে দেন দেবতাদের হাতে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন যে, নানান আখ্যানগুলি প্রমাণ করে যে সরস্বতী নদী থেকে ধীরে ধীরে দেবীত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে ব্রাহ্মণও দেব-দেবীর মতোই দার্শনিক ও সাহিত্যিক কল্পনার দ্বারা বলা যায়, সরস্বতী নদী বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরোপুরি বাগদেবী হয়ে যায় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে।

পুরাণের যুগে যাণ্ড্যবক্ষ্যের সামনে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের আভরণভূষিতা হয়ে দেখা দেওয়ার আগে সরস্বতী ছিলেন নদী কিংবা উর্বরতার দেবী। বহুবল্লভা, মোহিনী সরস্বতী কোনও অবস্থাতেই বিদূষী ছিলেন না।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বাবু প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বাবুদের স্ত্রী-রা পূজো করছেন লক্ষ্মীর। উপপত্নী বা গণিকারা লক্ষ্মী পূজো করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গণিকাদের বরাতে জুটেছে সরস্বতী পূজোর অধিকার। প্রাচীন বহু গ্রন্থে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল পুরোহিত যখন রাজি হলেন তবে লক্ষ্মী নয় কেন? কেন সরস্বতী? তবে কি সরস্বতীর জায়গা এই গণিকালয়ে? নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ‘ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীপঞ্চমীর দিন গৃহস্থবাড়িতে বই-দোয়াত-কলম সহযোগে পূজো হত। আর গণিকাগৃহে সরস্বতী পূজোয় আসত মূর্তি। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ভারতে গণিকারাই চৌষটি কলায় পারদর্শিনী ছিল। সেই সূত্রে বাৎসায়নের ‘কামসূত্র’-এও গণিকাগৃহে সরস্বতী পূজোর কথা পাওয়া যায়। ১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ‘সমাজ কুচিত্র’ দর্পনে জানাচ্ছে যে সরস্বতী পূজোর দিন রাতে নিষিদ্ধ পল্লিতে কৌমার্যহরণের বিখ্যাত ‘নখভাঙা’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। কেউ কেউ মনে করেন গণিকাদের আরাধ্য দেবতা কার্তিকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সরস্বতীর পূজো বেড়েছে গণিকালয়ে।

ব্রাহ্মণ্য পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। ব্রহ্মা তার নিজ কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হন। তর্ক-বিতর্ক যাই থাকুক, কলকাতা যাদুঘরের একটি

প্রস্তর মূর্তি থেকে তার প্রমাণ মেলে। এই মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার বাম জানুর উপর সরস্বতী আসীনা। তার একহাত ব্রহ্মার স্কন্ধবেষ্টিত। সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার এই সম্বন্ধের সন্ধান ঋকবেদেও পাওয়া যায়। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ বলছে, সরস্বতী বিষুং মুখজাত। ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে নির্জনে বিভিন্ন স্থানে রতিক্রিয়া করেছেন। আবার দেবীভাগবত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ভাগবত পুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মা সরস্বতীর জনক। আত্মজার রূপমুগ্ধ পিতার তৃষণার্ত দৃষ্টির লেহন থেকে নিজেকে সরাতে সরস্বতী যত এদিক-ওদিক সরেছেন, তত নিজের মুখের সংখ্যা বাড়িয়ে ব্রহ্মা তাঁকে দুচোখ ভরে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি পঞ্চমুখ। হরিণ ও হংসরূপে ব্রহ্মা নিজকন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আর তাতেই মনু স্বায়ম্ভুবের আবির্ভাব। শিবপুরাণও বলছে, ব্রহ্মা কাম পরবশ হয়ে সরস্বতীর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। এখানেই রয়েছে ব্রহ্মার এই কুপ্রস্তাবে সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন। ফলে, তার একটি মাথা খসে পড়ে আর সেই থেকে ব্রহ্মা চতুরানন হন।

বরাহ সরস্বতীর বাহন। এ থেকে প্রমাণিত হয় সরস্বতী বিষুংর স্ত্রী ও বটে। তাছাড়া বহু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূত হয়েই কৃষ্ণকেই পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন— ‘ইয়েষ কৃষ্ণ কামেন কামুকী কামরূপিনী।’ কিন্তু তখন কৃষ্ণ রাধাগত প্রাণ। ফলে কৃষ্ণের অনুরোধে সরস্বতী বিষুংকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য বাঙালিরা মনে করেন শিব-দুর্গার সন্তান লক্ষ্মী-সরস্বতী, গণেশ-কার্তিক। অর্থাৎ শিব কন্যা সরস্বতী। আবার শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, মহেশ্বরের নর্মসঙ্গিনী সরস্বতী। মহারাষ্ট্রের কোন কোন মন্দিরে গণেশ ও সরস্বতী পতি-পত্নীরূপে পূজা পেয়ে থাকেন। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে তিনি নারায়ণের পত্নী। রূপে মোহিনী হলেও তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি নারায়ণের মন পাননি। নারায়ণ তাই সরস্বতীকে ব্রহ্মার নর্মসহচরীরূপে দান করেন। শেষমেঘ প্রচারিত বিদূষী সরস্বতীর পরিণতি হল— ব্রহ্মা-বিষুং-মহেশ্বরের নর্মসহচরী হওয়া। আবার শুক্লযজুর্বেদ তাকে ‘অশ্বিভ্যাং পত্নী’ অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্ত্রী বলেছে। এমনকি ঋষি দধীচিও তাঁর স্বামী। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ অনুসারে দধীচির ওরসে সরস্বতীর গর্ভে সারস্বত জন্মেছিলেন। মনু স্বায়ম্ভুব ও সারস্বতের পাশাপাশি তার আর এক সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায় মাইহার লিপিতে। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত এই লিপি অনুসারে সরস্বতীর পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির অভিশাপে মাইহার অঞ্চলে দামোদর নাম নিয়ে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

কোন কোন শাস্ত্রে সরস্বতী সূর্যের কন্যা এবং পত্নী দুই-ই। বেশিরভাগ শাস্ত্রে সরস্বতীকে নৃত্যশিল্পী রূপে এঁকেছেন। তাছাড়া নৃত্যরতা সরস্বতীর প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেছে। এখন তো নাচের শুরুতে সরস্বতী বন্দনা হয়। নৃত্যপটীয়সী না হলে তার বন্দনা নিশ্চয়ই হত না। এ নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবকাশ থাকলেও কিছু প্রামাণ্য রয়েছে

গেছে। মালদা মিউজিয়ামের ৭৪ x ৩৮ সেন্টিমিটার কালো পাথরের সরস্বতী মূর্তিতে। এই মূর্তিটির বাহন হাঁস ছাড়াও রয়েছে মেঘ এবং বরাহ। যুগে যুগে ইতিহাসবিদ ও পুরাণকাররা জানিয়েছেন নদী অববাহিকা থেকে গণিকালয় সর্বত্র সরস্বতী বিরাজমান। সরস্বতী তাঁর কৌমার্য হারিয়েছেন বহু পুরুষের বাহুডোরে। তথ্যপ্রমাণ রয়েছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থে, স্বল্পবসনা নানা রূপের বিভঙ্গে।



৫-এর দশকে কমরেড আবদুল হালিম একদিন কমরেড মুজফ্ফর আহমেদকে অনুযোগের সুরে বলেন, “দুই কমরেড মুখুজ্জে (শ্রী হীরেন মুখার্জী ও শ্রী সরোজ মুখার্জী) সাড়ম্বরে তাদের ছেলেদের পৈতে দিলেন, আমি আমার ছেলের সুনৎ করালাম না ফলে মুসলমান কমরেডরা গাল পাড়লেন আর হিন্দু কমরেডরা নির্বিকার থাকলেন।”

প্রায় ৬০ বছর আগের এই ঘটনা আমাদের এই জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে যথেষ্ট যে, প্রগতি শিবিরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আগ্রাসন বহুকাল পূর্বেই ঘটেছে। “মুখুজ্জে” কমরেডদের দোষ দেওয়া অর্থহীন কারণ পশ্চিমে শিল্প বিপ্লবের সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ রেনেসাস চার্চের প্রভুত্বের হাত থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে যতটুকু মুক্ত করতে পেরেছিল ভারতে তার ছিটেফোঁটাও ঘটেনি। বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্তদের মতো রক্ষতা দোষে দুষ্ট না হয়েও বলা যায় যে, যতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছিল তা দেশী বিদেশী শ্রেষ্ঠিদের স্বার্থে ক্ষুণ্ণিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

ভারতীয় সমাজকে আধা সামন্তবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদী যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দহ নেই যে ভারতে বুর্জোয়া চেতনার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে নি, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসীগণ যাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বাভাবিক ফসল মনে করেন। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কারবাদীরা এসেছেন এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও ‘মুতাজেজলাবাদী’রা এসেছেন তবুও “সর্বশক্তিমান”-এর Loyal Opposition “সৃষ্টিকর্তা”র মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতি ও সামাজিক পীড়নে আত্ম মানুষের কাছে ভাববাদ নামক সর্বগ্রাসী নেশার বিকল্প বস্তুবাদী শক্তির উদ্ভব না ঘটাতে পারলে যুক্তিহীন তমসাময় মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী। প্রচলিত একটি কথা— তুমি যদি সমস্যার সমাধান না করতে পারো তবে কালক্রমে তুমি সমস্যার অংশ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম নামক বহু সমস্যার জন্মদাতা জাতভেদ, নারী নির্যাতন পোখরানে জাতিয়তাবাদ, কারগিলে দেশপ্রেম, অযোধ্যার আবেগ, ভাগলপুরের দাঙ্গা, গণেশের দুধপান, অস্পৃশ্য নিধন প্রভৃতির সাথে অদৃশ্য সূতোয় বাঁধা।

শিক্ষিত শহরবাসীর ক্ষুদ্রাংশ “সিভিল সোসাইটি” গঠনের কথা

ভাবছেন-বলছেন-লিখছেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ভাবছেন-বলছেন-লিখছেন, আলাপ আলোচনায় আসছেন, দেরিদা, লাকার্ত, ফুকো — ভারতবর্ষ তবুও পড়ে রয়েছে অন্ধকার ভারতে। যে ভারতে ২৩ শতাংশ মানুষ রেলগাড়ি চড়া তো দূরের কথা - চোখেই দেখেনি, ৩৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ভোগ করে না, ২৮ শতাংশ মানুষ উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাতঃকৃত্য করে, ৭ শতাংশ মানুষ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন, সেই ভারতে জীবনযুদ্ধে জর্জরিত মানুষের কাছে ঈশ্বর ধ্বংস ও সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হবেন এটাই স্বাভাবিক। তবুও চার্বাক, প্রমিথিউস আর জিওরদানো ব্রুনো রেখে গেছেন তাঁদের উত্তরসূরী, শত বাধা সত্ত্বেও তারা কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টাকে হত্যা করা যায় নি।

আধুনিক মানুষ, নতুন মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের সংখ্যাধিক্য এই সমাজে পাওয়া স্বাভাবিক নয়। অথচ আমাদের গৌরবময় ইতিহাস বলে বৈদিক যুগেও জিজ্ঞাসুমন কৌতুহলী মন প্রশ্ন তুলেছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে, জাগতিক সমস্ত ঘটনার কার্যকরণ ব্যাখ্যা রেখেছেন, গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরা বহন করতে পারলাম না কেন তা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

যে কোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা বা দাবি করতেই পারেন যে রাষ্ট্রের নীতি ধর্মীয় নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবে না। এজন্য সেই ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ধর্মীয় তমসাবাদ সম্পর্কে মোহমুক্ত হতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট দাবী হবে যে প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় আচার পালনের এবং না-পালনের অধিকার থাকবে। কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলো সংবিধানে এবং তার বাস্তব প্রয়োগে এই নীতি পালিত হবে। কিন্তু অগ্রণী সংগঠনের সদস্যদের ‘ব্যক্তিগত ব্যাপার’ অজুহাতে ভাববাদী ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হতে দেওয়া উচিত নয়।

৩ ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে লেনিন লিখেছিলেন—“যে সব শ্রমিক আজও অতীত কুসংস্কারের কোন না কোন জের বজায় রেখেছে তাদের আমরা পার্টির কাছাকাছি আসা নিষিদ্ধ করিনি - করা উচিত নয়।”

চার্চ-খৃষ্টধর্ম-ঈশ্বর প্রশ্নে ব্লাংকিবাদীদের ছেলেমানুষী নৈরাজ্যবাদী অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে লেনিন সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সময়টা ১৯০৫ সাল। এত বছর পর যখন ঈশ্বরের হাত ধরে ধর্মের পথে ফ্যাসিবাদ জেগে উঠেছে তখন নতুন ভাবে ভাবতে হবে। লেনিনের সময়ে পাশ্চাত্যে রেনেসাসের প্রভাবের ফলে ঈশ্বর বাহিনী আজকের মতো ঘাতক বাহিনীতে পরিণত

হয়নি। নিরীশ্বরবাদীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন আর সেই রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে সেকুলার হয় অথবা কোন রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় ধর্ম নিরীশ্বরবাদ হয়, পৃথিবীতে এ উদাহরণ তো আছে। সেই রাষ্ট্রগুলির রঙ বদলেছে, কক্ষচ্যুতি ঘটেছে অন্য কারণে। সে দেশের কমিউনিস্টরা বিপথগামী হয়েছে তা নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টদের একাংশের মতো পৈতে ধারী বামুন হয়ে থাকেনি যা ক্ষমারও অযোগ্য।



Brahminism is most modern form of fascism
in India - Let us fight it